ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্ব

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য



ম্যাকমিলান

বেঙ্গল কাউন্সিল অব হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশন প্রবর্তিত একাদশ ও
দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।

আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্ব

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এম. এ. (কলিকাতা)
এ. এম. (পেন্সিলভ্যানিয়া), পি-এইচ. ডি. (যাদবপুর)
প্রফেসর অফ্ হিষ্ট্রি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

M

দি ম্যাকমিলান কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
২৯৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২

THE MACMILLAN COMPANY OF INDIA LTD.
MADRAS BOMBAY CALCUTTA DELHI

Associate companies throughout the world

First Edition 1976

"This book has been printed on the paper supplied through the Government of India at a concessional rate."

Made in India

Printed by Bansidhar Singha at Bani Mudran, 12 Naren Sen Square, Calcutta 700009 and Published by U. N. Banerjee, for The Macmillan Co. of India Ltd. 294, B. B. Ganguly Street, Calcutta 700012.

SYLLABUS OF HISTORY

EUROPE AND THE WORLD

APTER I : **Europe 1763-1789**

Europe in 1763.
Enlightened Despotism.

APTER II : **Industrial Revolution.**

Scientific Inventions and Growth of Mechanical Industries. Factory system—
Effects of the Industrial Revolution upon contemporary society and politics.

APTER III : **War of American Independence.**

Background—Causes of War—Treaty of Versailles 1783.

APTER IV : **French Revolution and Napoleon.**

Causes of the Revolution—Calling of the States General—National Assembly—
Legislative Assembly—National Convention—Reign of Terror—Significance
of the Revolution—Advent of Napoleon—From Consulate to Empire—
Reforms and Conquests of Napoleon—his fall. Impact of the Revolution on
Europe.

APTER V : **Reconstruction of Europe**

The Congress of Vienna—Metternich System—Concert of Europe: its
activities, causes of its failure.

APTER VI : **Revolution and Reaction.**

July Revolution—Causes and Consequences—July Monarchy and February
Revolution—Greek War of Independence.
ussia under Alexander I and Nicholas I.

APTER VII : **The Mid-century upheaval.**

National Revolutions of 1848-50—the sequence, character and sequel of the
Revolutions.

APTER VIII : **Relations of Great Powers, 1850-71**

The Eastern Question and Crimean War—France under Napoleon III—Uni-
fications of Italy and Germany—Franco-Prussian War—significance of the
Settlement of 1871.

CHAPTER IX : **Major European States and the System of Alliances.**

Germany under Bismarck and William II (1871-1914)—France under Third Republic—Russia under Alexander II, Alexander III and Nicholas II. System of Alliances.

CHAPTER X : **Socialism and Imperialism.**

Karl Marx and Socialism—The urge for imperialist expansion—Colonial rivalry and Colonial Collisions—Partition of Africa and partial partition of Asia—Reform and Revolution in China—Rise of U. S. A. and Japan as imperialist powers.

CHAPTER XI : **Dismemberment of the Ottoman Empire.**

Development of Balkan nationalism—From Treaty of Berlin to Balkan wars.

CHAPTER XII : **First World War and its aftermath.**

Causes of the War—Major Participants—Peace Settlement of 1919-23—League of Nations—Modernisation of Turkey.

CHAPTER XIII : **Russian Revolution—its impact.**

CHAPTER XIV : **Dictatorship and Failure of Collective Security.**

Locarno Treaty and Pact of Paris—Disarmament—Work of the League—Fascism on the ascendant and breakdown of collective security—Chamberlain—Daladier—Mussolini—Hitler and Stalin—Origin of Second World War.

CHAPTER XV : **Second World War.**

Its phases—U. N. O.

মুখবন্ধ

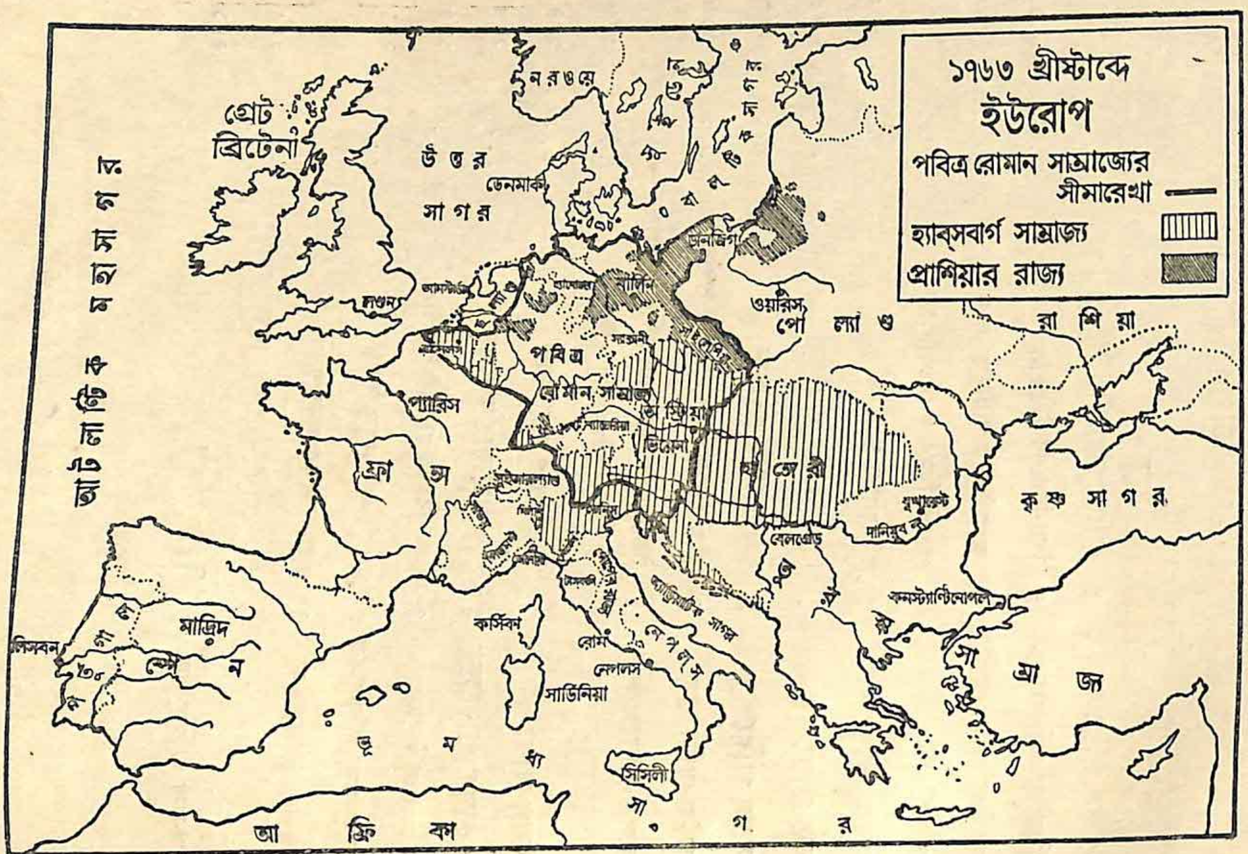
মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই বিভিন্ন স্তরে পড়বার সুযোগ পায়। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাস তাদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যায়। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে এসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ধারণা না নিয়ে আধুনিক যুগের ইতিহাস পড়তে তাদের স্বভাবতই কিছু অসুবিধা হবার কথা। সেজন্য **আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্ব** বইটিতে আমি প্রচুর তথ্যের সমাবেশ না করে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের মূল ধারাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। সাধারণ ছাত্রদের যাতে এ বই পড়ে বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়, তাই এতে আগাগোড়া চলিত ভাষার অনুসরণ করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় নামের (দেশ ও ব্যক্তির) বানান বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজীতে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজী থেকে ধার করা বাংলা শব্দগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দও ঐ ভাবে দেওয়া হয়েছে। বইটি আদ্যোপান্ত সুখপাঠ্য করার জন্য সব রকম চেষ্টা করা হলেও কিন্তু জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণ কোথাও এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। যাতে বইটি পড়ার পর উচ্চতর পাঠক্রম অনুসরণ করা সহজ হয়, তার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ইউরোপের ভূগোল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে ইউরোপের ইতিহাস কখনোই ভালো ভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তাই বই-এর ভিতরে যথেষ্ট সংখ্যক মানচিত্রও দেওয়া হয়েছে। মেধাবী ও উৎসুক ছাত্রদের জন্য বই-এর শেষে উচ্চতর মানের কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত ইউরোপের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হয়েছে। তবে পাদটীকায় দীর্ঘ ইংরেজী উদ্ধৃতি দিয়ে অযথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করিনি।

স্কুল ও কলেজের সুধী শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা যদি এই বই-এর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব। তাঁদের ও বৃহত্তর ছাত্র-সমাজের কাছে বইটি আদৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২৫শে নভেম্বর, ১৯৭৬

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র


১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে
ইউরোপ
পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সীমারেখা
হ্যাব্‌সবার্গ সাম্রাজ্য
প্রাশিয়ার রাজ্য
গ্রেট ব্রিটেন
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
নরওয়ে
পোল্যাণ্ড
ওয়ারিস
রাশিয়া
পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য
অস্ট্রিয়া
ভিয়েনা
প্যারিস
ফ্রান্স
হাঙ্গেরী
কৃষ্ণ সাগর
বেলগ্রেড
কনস্টান্টিনোপল
মাদ্রিদ
স্পেন
লিসবন
কর্সিকা
রোম
নেপলস
সার্ডিনিয়া
সিসিলী
ভূমধ্য সাগর
আফ্রিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র (১৭৬৩-৮৯)
(Enlightened Despotism in Europe, 1763-89)

(ক) **সপ্তবর্ষ যুদ্ধের অবসানে ইউরোপ (১৭৬৩ খ্রীঃ) ঃ** অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে দীর্ঘকাল আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলা সত্ত্বেও ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট স্থিতিশীল ছিল, বলা যায়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ যুগে **জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলিই** (national state) প্রাধান্য লাভ করেছিল। এদের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড ও সুইডেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়াও অনেকটা এই ধরনের রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করছিল। অপরদিকে, বহু জাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলির (multi-national state) মধ্যে মধ্যযুগের পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) এই সময় নামমাত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছিল এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যও দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল। হ্যাপ্‌স্‌বার্গ্‌ (Hapsburg) বংশের অধীনে অষ্ট্রিয়ার বিরাট সাম্রাজ্য অবশ্য এই ধারার ব্যতিক্রম ছিল, বলা চলে। ভেনিস, ল্যুবেক প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক গুরুত্বও এ সময় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা

অধিকাংশ ইউরোপীয় রাজ্যগুলিতে এ যুগে **বংশানুক্রমিক স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফ্রান্সেই এই ধরনের রাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এবং অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের রাজতন্ত্রও ফরাসী রাজতন্ত্রকে অনুসরণ করে চলছিল। হল্যাণ্ডে দীর্ঘকাল প্রজাতান্ত্রিক শাসনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেখানে অরেঞ্জ-বংশীয় (Orange) শাসকদের বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারার একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায় ইংলণ্ডে, যেখানে সপ্তদশ শতাব্দীর (১৬৮৮) গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) পর পার্লামেন্টের ক্ষমতা রাজার অধিকারকে বহুলাংশে খর্ব করেছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে **সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসও** এই যুগে অনেকটা একই রকম ছিল। **কৃষকরাই** ছিল সমাজের ভিত্তি-স্থানীয় এবং বৃহত্তম অংশ। পশ্চিম ইউরোপে এই কৃষকদের অধিকাংশই ছিল স্বাধীন নাগরিক—অনেকে জমিদারের অধীন প্রজা, আর বেশ কিছুসংখ্যক নিজস্ব জমির মালিক। পূর্ব-ইউরোপে প্রাশিয়া, অষ্ট্রি পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় কৃষকদের মধ্যে ভূমিদাসের (Serf) অনুপাত ছিল অনেক বেশি ভূমিদাসেরা ঠিক স্বাধীন নাগরিক ছিল না ; জমি ছেড়ে এদের কোথাও যাবার স্বাধীনতা ছিল না, জমিদারেরাই এদের ভাগ্য-নিয়ন্তা ছিল। ইউরোপের বর্ধিষ্ণু শহরগুলিতে শিল্পী বা **শ্রমজীবীদের সংঘ** (guild) মধ্যযুগের মতো এ যুগেও সক্রিয় ছিল, তবে অনেক শহরে ছোট কল-কারখানায়, বন্দরে এবং পণ্য-বিপণিতে আধুনিক কালের মতো **বেতনভুক্ শ্রমিকদের** আবির্ভাবও লক্ষণীয় ছিল। এই নগরবাসী সর্বহারাদের সংখ্যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন বৃত্তি-আশ্রয়ী **মধ্যবিত্ত শ্রেণীর** প্রভাবও সমাজে কম ছিল না। এদের মধ্যে চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, বণিক, পণ্য-বিপণির মালিক এবং মহাজনের সংখ্যাই ছিল বেশি ; তাছাড়া ছিল ক্ষুদ্র শিল্পপতিরা, যাদের ছোট কল-কারখানায় দশ থেকে এক শতের মধ্যে বা কোথাও কোথাও শতাধিক শ্রমিকও জীবিকা-উপার্জনে নিযুক্ত থাকত।

সমাজ-চিত্র

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সঙ্গতি ছিল এবং সাধারণতঃ এরা সুশিক্ষিতই হত। কিন্তু এদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট থাকলেও সমাজে এরা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিল না। সে যুগের সমাজে সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হত রাজসভার **উচ্চ উপাধিধারী পারিষদ বা সামন্তবর্গ, বৃহৎ ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়,** এবং 'বিশপ' 'আর্চ-বিশপ' প্রমুখ **উচ্চ পর্যায়ের যাজককুল**। সামন্তেরা ছিল এক অতি-সংখ্যালঘু শ্রেণী, যারা কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল না, সৈন্যবিভাগে উচ্চ পদ অলংকৃত করলেও যুদ্ধ-বিগ্রহে বড় একটা অংশ গ্রহণ করত না, এবং রাষ্ট্রের প্রতি যাদের দায়িত্বও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল। তথাপি যত কিছু সামাজিক সম্মান এবং জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল এই বিশেষ অধিকার-ভোগী শ্রেণীর করায়ত্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে এই অবস্থায় খুব অসন্তুষ্ট ছিল তা বলাই বাহুল্য।

ইউরোপের **অর্থনৈতিক জীবনে** বিগত তিন শতাব্দীতে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকা, দূর-প্রাচ্য এবং স্বল্প পরিমাণে আফ্রিকারও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। **আর্থিক লেনদেন** প্রায় সর্বত্রই মুদ্রার মাধ্যমে চলত ; পণ্য বিনিময়ের দ্বারা বাণিজ্যের প্রথা (barter system) এ যুগে

অচল হয়ে পড়ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং আর্থিক ব্যবস্থায় **ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়** এ সময়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বিশেষতঃ ইউরোপের বিভিন্ন শহর এবং সামুদ্রিক বন্দর এলাকায়। ইংলণ্ডে লণ্ডন ও ব্রিস্টল, ফ্রান্সে মার্সাই ও বোর্দো, হল্যাণ্ডে আমস্টার্ডাম ও স্পেনে ক্যাডিজ ছিল এ যুগের নাম-করা বন্দর। বড় কল-কারখানা ও খনির সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়; বেশির ভাগ **কলকারখানাই** ছিল ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থা পর্যায়ের, এবং এগুলি পরিচালিত হত রাষ্ট্র অথবা মধ্যযুগীয় শিল্পী-সংঘগুলির (guild) পূর্ণ তত্ত্বাবধানে। একমাত্র ইংলণ্ডেই শিল্পী-সংঘগুলির প্রভাব ছিল ক্ষীয়মান। কল-কারখানাগুলিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার যথেষ্ট থাকলেও যন্ত্রপাতিগুলির অধিকাংশই ছিল অতি সাধারণ শ্রেণীর, কাঠের তৈয়ারী এবং হস্তচালিত। মধ্যযুগের তুলনায় এই সময়ে **যান-বাহন** ও চলাচল ব্যবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছিল। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশে প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ এবং খাল-খননের দ্বারা জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। সমুদ্রগামী বিশাল জাহাজের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থনৈতিক জীবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে কৃষি-ব্যবস্থাতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে, যাকে ঐতিহাসিকেরা অনেকে **'কৃষি বিপ্লব'** নামে অভিহিত করেছেন। এই শতাব্দীর সূচনায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতোই ইংলণ্ডের অধিকাংশ কৃষি-যোগ্য জমি ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর, এবং ক্ষুদ্র কৃষকেরাই ছিল এই সব জমি কর্ষণের অধিকারী। উন্মুক্ত প্রান্তরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে তাদের ছোট ছোট জমি দেওয়া হয়েছিল, এবং কিছুটা সাধারণ জমি প্রতিটি গ্রামেই রাখা ছিল কৃষকদের গৃহপালিত পশুদের চারণের জন্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পার্লামেণ্টের আইনের সাহায্যে অধিকাংশ কৃষি-যোগ্য জমিই অপেক্ষাকৃত ধনী ভূস্বামীরা ধীরে ধীরে হস্তগত করে নেয়, এবং সেগুলির পুনর্বিন্যাস করে এক এক অঞ্চলে এক একটি বৃহৎ বেষ্টনীযুক্ত সুরক্ষিত খামার গড়ে তোলা হয় (enclosure movement)। সাধারণ পশুচারণ ক্ষেত্রগুলিও এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কৃষকেরা তাদের জমি ধনী ভূস্বামীদের নিকট বিক্রয় করে তাদেরই ভাড়াটিয়া প্রজা অথবা বেতনভুক্ শ্রমিকে পরিণত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই পরিবর্তন চলতে থাকে এবং ষাট লক্ষ একরেরও বেশি জমি এইভাবে বেষ্টনীভুক্ত করা হয়। ইংলণ্ডের কৃষি-বিপ্লবের পশ্চাতে এ যুগে কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতিও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল। একই জমিতে পর্যায়ক্রমে নানা ধরনের বীজ বপন (rotation of crops) করে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা হয়, কৃষি-যোগ্য জমি থেকে জল-নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা করা হয়, এবং

ইংলণ্ডে কৃষি-বিপ্লব

নানা ধরনের ঘাস ও 'টার্নিপ্' বা শালগ্রাম-জাতীয় শস্য বপন করে পশু-খাদ্য উৎপাদ সমস্যারও সমাধান করা হয়। রবার্ট্ বেক্ওয়েল (Bakewell) উন্নততর গবাদি প প্রজননের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং জেথ্রো টাল (Jethro Tull) কৃ কার্যের জন্য অশ্ব-বাহিত নানা ধরনের উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন করেন। সব নতুন আবিষ্কারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্যই ইংলণ্ডে বৃহৎ সুরক্ষিত খামা প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। পুরানো কৃষি-ব্যবস্থায় নতুন আবিষ্কারগুলির সম্পূর্ণ সুফ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

(খ) অষ্টাদশ শতাব্দীর নূতন চিন্তাধারা ; ধর্ম, বিজ্ঞান ও ভাব-জগতে পরিবর্তন : সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপে **বিজ্ঞানের জয়যাত্রা** আরম্ভ হয়। পূর্ববর্তী যুগে কোপার্নিকাস, কেপ্লার, গ্যালিলিও প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কার এই জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন **স্যার আইজ্যাক নিউটন** (Isaac Newton) (১৬৪২—১৭২৭)। পদার্থবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, যা তিনি তাঁর ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) গ্রন্থে প্রথম বিশ্ববাসীর গোচরে আনেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশ্বজনীন প্রয়োগের সম্ভাবনা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ঈশ্বরের বিধানের মতোই অমোঘ এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। নিউটনের আবিষ্কার পরবর্তী যুগের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতো বিশ্বজনীন নিয়মের আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রিস্ট্লি (Priestley), ল্যাভয়সিয়ের (Lavoisier), ক্যাভেণ্ডিশ্ (Cavendish) ও বয়েলের (Boyle) মতো রসায়নবিদ্, লাইব্নিৎজের (Leibnitz) মতো গণিতজ্ঞ, লিনিয়াসের (Linnaeus) মতো উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী, হ্যালির (Halley) মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জেনারের (Jenner) মতো



নিউটন

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

চিকিৎসকের নাম করা যায়। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা এই যুগে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ এবং অভিজাত সম্প্রদায় বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আবির্ভূত হন। লণ্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটি' ও প্যারিসের 'ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি' বিজ্ঞান-চর্চা ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করে।

বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার ফলে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় চিন্তাধারায় ক্রমশঃ **যুক্তিবাদ** (Rationalism) এবং **জড়বাদী দর্শনের** (Materialistic Philosophy) প্রাধান্য সূচিত হয়। নিউটনের আবির্ভাবের পূর্বেই ফরাসী দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ দেকার্ত্ (Descartes)-এর রচনায় জড়বাদী দর্শনের বীজ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে ব্রিটিশ চিন্তানায়ক টমাস হবস্ (Hobbes), হল্যাণ্ড-নিবাসী ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) এবং স্কটল্যাণ্ডের খ্যাতনামা মনীষী ডেভিড হিউমের (Hume) রচনায় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়। এ যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা সকলেই যে পূর্ণমাত্রায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন তা নয় ; তবে ঈশ্বর, পরলোক, আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা এঁরা নিরর্থক মনে করতেন, কারণ যুক্তি-তর্ক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের দ্বারা এগুলির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা এঁদের মতে অসম্ভব ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী ছিলেন। হবস্ এবং স্পিনোজা বাইবেলের ঐতিহাসিক সত্যতা এবং এর পশ্চাতে ঐশী প্রেরণার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেন। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বেও এঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন না। এইভাবে ইউরোপে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু প্রচলিত সকল ধর্মমতে আস্থাহীন একদল চিন্তানায়কের (deists) আবির্ভাব হয়। ধর্মকে এঁরা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বস্তু বলে মনে করতেন, চার্চ-সংগঠনের প্রতি এঁদের আনুগত্য ছিল খুবই ক্ষীণ। ভল্টেয়ারের (Voltaire) মতো খ্যাতনামা ফরাসী দার্শনিক ও লেখক তাঁর শক্তিশালী লেখনীকে রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধ-সমালোচনায় নিয়োগ করেছিলেন। যুক্তিবাদীদের মধ্যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী লোকও (atheist) বেশ কিছু ছিলেন।

দার্শনিক জড়বাদ

অবশ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে জনসাধারণের অধিকাংশই প্রচলিত খ্রীষ্টান মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের মতবাদ গ্রামীণ জনসমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চার্চের, বিশেষতঃ প্রোটেস্টাণ্ট চার্চগুলির, মধ্যে নানা ভিন্নমতাবলম্বী দলের উদ্ভব হয়। আচার-অনুষ্ঠান বা মতবাদ-গত সূক্ষ্ম পার্থক্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক এঁরা পছন্দ করতেন না, বরং ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি এবং ধার্মিক জীবন যাপনের উপর এঁরা বেশি জোর দিতেন। যুক্তিবাদের চেয়েও অতীন্দ্রিয়বাদের (mysticism) প্রতি

চার্চের অবস্থা

এঁরা অধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জার্মানীর পায়েটিস্ট্ (Pietist) আন্দোলন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডের **কোয়েকার** (Quaker) ও **মেথডিস্ট্** (Methodist) আন্দোলন এই পর্যায়ভুক্ত। কোয়েকারেরা সরল জীবনযাত্রার পক্ষপাতী, এবং শপথ গ্রহণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। জন ওয়েস্লির (John Wesley) অনুগামী মেথডিস্ট্‌গণ আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য পছন্দ করতেন না, অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনের বিরোধী ছিলেন এবং পবিত্র জীবন-যাপন ও দান-ধ্যানের অনুরাগী ছিলেন। এই সব ভিন্নমতাবলম্বী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলির অনুগামীরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের।

চিন্তার জগতে অতিপ্রাকৃত হতে যুক্তিবাদে, এবং ধর্মতত্ত্ব (theology) হতে বিজ্ঞানে এই সঞ্চরণ অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতাব্দীকে এই কারণেই **জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির যুগ** (Age of Enlightenment) বলা হয়। মানুষ যুক্তির সাহায্যে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম, এবং যা-কিছু যুক্তিসম্মত তা-ই ভাল, যুক্তির দ্বারা যা বোঝা যায় না তা বর্জনীয়, এইরকম ধারণা এ যুগের চিন্তাশীল লোকেদের অধিকাংশকে প্রভাবিত করেছিল। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সমাজ-ব্যবস্থাকে যুক্তিবাদের আলোকে বিচার করার চেষ্টা এই যুগে স্বভাবতঃই লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণার অনুসরণে প্রজাহিতব্রতী রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের আদর্শও ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে।

যুক্তিবাদের যুগ

ব্রিটিশ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী **জন লক** (John Locke) এবং ফরাসী চিন্তানায়ক **রুশোর** (Jean-Jacques Rousseau) নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। রাজতন্ত্র একটি চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাজা অন্যায় ও অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করলে প্রজাদের বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে অপসারণের অধিকার আছে—এই ছিল লকের মূল বক্তব্য। ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবকে তিনি এই যুক্তির দ্বারাই সমর্থন করেন। রুশো লকের চেয়েও অগ্রগামী হয়ে ঘোষণা করেন যে সমস্ত সরকারই একটি **সামাজিক চুক্তির** (Social Contract) উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, এবং এই অধিকার সবচেয়ে ভালো ভাবে রক্ষা করতে পারে সেই সরকার, যা জনগণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। রুশোর এই মতবাদ ফরাসী বিপ্লবকে প্রভাবিত করে এবং তাঁর মৃত্যুর পনেরো বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে প্রথম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

নতুন রাজনৈতিক চিন্তা ধারা

(গ) অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজন্যবৃন্দ: অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজন্যবৃন্দও এ যুগের যুক্তিবাদ এবং

জ্ঞান-চর্চার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সর্বত্র **দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র** (Divine Right monarchy) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ যুগের আদর্শ নৃপতি ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই নাকি বলেছিলেন যে তিনিই রাষ্ট্র। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের প্রসারের ফলে দৈবস্বত্বে বিশ্বাস অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে, ও লকের প্রচারিত **সামাজিক চুক্তির মতবাদ** তার স্থান গ্রহণ করে। এই শতাব্দীর রাজারাও তাই নিজেদের দৈবস্বত্বের কথা বেশি বলতেন না, তার পরিবর্তে তাঁরা আপন কর্তব্যের কথা আলোচনা করতে, এবং প্রজা-হিতৈষী নৃপতি হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে চাইতেন। প্রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এই নতুন যুগ-চিন্তার প্রভাবে ঘোষণা করেন যে রাজাই তাঁর রাষ্ট্রের প্রধান সেবক (the first servant of the state)। ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টনের মতে অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল 'অনুতপ্ত রাজতন্ত্রের যুগ'। অবশ্য, রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন (Catherine II), প্রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (Frederick II), বা অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের (Joseph II) মতো প্রবল-পরাক্রান্ত নৃপতিদের মধ্যে আমরা প্রকৃত অনুতাপের কোনো চিহ্ন দেখি না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের যুগ-ভাবনা তাঁদেরও কিছুটা প্রভাবিত করেছিল, এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের বাসনা তাঁরাও পোষণ করতেন। তাই তাঁরা নিজেদের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী (Enlightened Despot) বা প্রজাহিতব্রতী স্বৈরাচারী অভিধায় পরিচিত করতে চেয়েছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব

অষ্টাদশ শতকের তথাকথিত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজন্যবৃন্দের মধ্যে কতকগুলি **সাধারণ বৈশিষ্ট্য** লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এঁরা নতুন যুগের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে বাহ্যতঃ স্বাগত জানান এবং নিজেদের ঐ চিন্তাধারার অনুবর্তী ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রচার করেন। এই রাজন্যবৃন্দের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে ডিডেরো, ভলটেয়ার প্রমুখ দার্শনিকদের নিয়মিত পত্রালাপও চলত। দ্বিতীয়তঃ, এঁরা সকলেই নিজ নিজ রাজ্যে কিছু কিছু সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। সামাজিক, প্রশাসনিক, আইন-সংক্রান্ত এবং শিক্ষা-গত সংস্কারের জন্য এঁদের রাজ্যকাল স্মরণীয়। তবে এই সকল সংস্কার খুব সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, সমাজ বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন এঁরা কেউই চাইতেন না। তৃতীয়তঃ, এঁরা অনেকে 'চার্চ' এবং যাজক সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকারের বিরোধিতা করেন। এটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর নতুন দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে ঘটেছিল, বলা যায়। চতুর্থতঃ, রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের ধারণা পূর্ববর্তী যুগের ধারণা থেকে কিছুটা পৃথক ছিল।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

রাজার যে প্রজাদের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে, তিনি স্বৈরাচারী হলেও স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না,—একথা অন্ততঃ মুখে এঁরা স্বীকার করতেন। পঞ্চমতঃ, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দের মধ্যে অনেকে আপন আপন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাও করেছিলেন। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সাধন এঁদের কাম্য ছিল। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের আগমনের পথ এইভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের **মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতির** কথাও এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখা উচিত। প্রথমতঃ, নতুন যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছিল খুবই পরোক্ষ এবং অগভীর। জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁদের কাছে প্রধান, অন্তর থেকে নতুন যুগের ভাবধারাকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের আরব্ধ সকল সংস্কারই সুফলপ্রসূ হয় নি; দ্বিতীয় জোসেফের বহু সংস্কার-প্রচেষ্টার মধ্যে বাস্তববোধের অভাব লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ কোথাও তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্দুমাত্র বিসর্জন দেন নি। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাঁরা কিছু কিছু কাজ করলেও প্রজাদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা তাঁরা চিন্তা করতে পারতেন না। সব শেষে এ কথা বলা যায় যে, ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসককুলের প্রকৃত রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রজানুরঞ্জনে তাঁদের আগ্রহ বিপ্লবের রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। ইউরোপের ইতিহাসে এজন্য তাঁরা কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেন নি।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দের মধ্যে প্রধান তিন জন ছিলেন প্রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন, এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ।

এঁদের মধ্যে প্রাশিয়ার সম্রাট **দ্বিতীয় ফ্রেডারিক** (১৭৪০—৮৬ খ্রীঃ) নানা ব্যাপারে ছিলেন আদর্শস্থানীয়। এ যুগের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সবচেয়ে নিবিড়, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভলটেয়ারের সঙ্গে তাঁর ফরাসী ভাষায় পত্রালাপও চলত। ঐ ভাষাতেই লিখিত রাজনীতি-বিষয়ক একটি পুস্তকে ফ্রেডারিক ঘোষণা করেন যে রাজা তাঁর রাজ্যের একচ্ছত্র প্রভু ন'ন, বরং প্রজাবর্গের প্রধান সেবক। বিশ্বস্ত সেবকের মতোই ফ্রেডারিক প্রতিদিন শাসনকার্যে বহু সময় অতিবাহিত করতেন, এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ সংস্কারকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী হিসাবে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হন। লৌহ, রেশম ও পশম শিল্প এদের মধ্যে প্রধান। কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য তিনি স্থানীয় ভূস্বামীদের ইংলণ্ডের কৃষি-বিপ্লবের অনুসরণে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করতে এবং পতিত জমি উদ্ধার করতে উৎসাহ দিতেন। প্রাশিয়ার কৃষকেরা অধিকাংশ ছিল ভূমিদাস শ্রেণীর। ফ্রেডারিক তাদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি করতে না পারলেও তাদের অর্থনৈতিক ভার লাঘবের চেষ্টা করেছিলেন। যান-বাহন চলাচলে উন্নতি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি নতুন নতুন পথ-ঘাট নির্মাণ এবং খাল খননের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন এবং প্রশাসনিক কার্যে অর্থের অপচয় বন্ধ করেন।

অর্থনীতি

শিক্ষাক্ষেত্রেও ফ্রেডারিক যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বার্লিনের বিজ্ঞান-পরিষৎ (Academy of Sciences) তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। জার্মান সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আকর্ষণ না থাকলেও ফরাসী সাহিত্যের তিনি একজন প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন।

শিক্ষা

প্রাশিয়ার **আইন ব্যবস্থাতে** ফ্রেডারিক কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। রাজ্যের আইনগুলিকে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বাহুল্য-বর্জিতভাবে বিধিবদ্ধ করেন। এতে জনসাধারণের এবং রাজ্যের আদালতগুলিরও খুব সুবিধা হয়। ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর শারীরিক নির্যাতনের প্রথা তিনি রহিত করেন। প্রজারা যাতে সকল অবস্থায় ন্যায় বিচার লাভ করে, ফ্রেডারিক সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন। একবার এক দরিদ্র প্রজার প্রতি অবিচারের অভিযোগে ফ্রেডারিক তার বিচারকদের পদচ্যুত এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আইন-ব্যবস্থার কঠোরতা দূর করাও তাঁর সংস্কার-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

আইন

ধর্মের ব্যাপারে ফ্রেডারিক যথেষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। তাঁর মধ্যে শুধু যে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রতি আগ্রহের অভাব ছিল তা নয়, খ্রীষ্ট ধর্ম, বাইবেল এবং সমগ্র যাজককুলের প্রতিই তাঁর অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার ভাব ছিল সুপরিস্ফুট। প্রোটেস্টান্ট-অধ্যুষিত প্রাশিয়া রাষ্ট্রে তিনি ক্যাথলিকদের স্বাধীন ধর্মাচরণের পূর্ণ অধিকার দেন। তাঁর রাজ্যে মুসলমান প্রজা থাকলে তাদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করতেও তাঁর আপত্তি নেই বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইহুদীদের প্রতি তিনি বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন নি, যদিও তাদের ধর্মমতের প্রতি তাঁর কোন বিরাগ ছিল না। ফ্রেডারিক প্রাশিয়ায় **সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও** স্বীকার করেন।

ধর্ম

আভ্যন্তরীণ সংস্কারের চেয়েও **বৈদেশিক নীতির** সাফল্যের জন্যই ফ্রেডারিক ইউরোপে সমধিক খ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে ফ্রেডারিক বিশেষ উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নি। পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি রণক্ষেত্রে অসাধারণ সমরকুশলতা প্রদর্শন করেন, এবং বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের দ্বারা প্রাশিয়ায় একটি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল সেনা-বাহিনী গড়ে তোলেন। এই সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যেই ফ্রেডারিক সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভ এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেন। সামাজিক অবিচার দূর করা অথবা নিপীড়িত কৃষকদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর সাফল্য তাদৃশ ছিল না।

বৈদেশিক নীতি

রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী **দ্বিতীয় ক্যাথারিন**ও (১৭৬২-৯৬ খ্রীঃ) এ যুগের অন্যতম জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক রূপে ইতিহাসে পরিচিত। ফ্রেডারিকের মতো তিনিও এ যুগের নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করেন। ফরাসী দার্শনিক ডিডেরোর (Diderot) সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্র বিনিময় হত, এবং ডিডেরোকে তিনি তাঁর রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে ক্যাথারিন কিছুটা উদার মনোভাবের পরিচয় দেন। দেশের **আইনগুলি** বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হন, রাশিয়ার **চার্চকে** রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয় এবং **আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের** জন্যও কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহামতি পিটারের মতো ক্যাথারিনও রাশিয়ায় **পশ্চিম ইউরোপীয় ভাবধারা ও আচার-ব্যবহার প্রবর্তনের** চেষ্টা করেন। **শিক্ষার প্রসারের** জন্য বহু বিদ্যালয় এবং সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। ললিতকলায় উৎসাহ দানের জন্য ক্যাথারিন একটি 'অ্যাকাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন। **ব্যবসায়-বাণিজ্যে** উৎসাহ দানও ক্যাথারিন তাঁর কর্তব্য বলে মনে করতেন। কিন্তু রাশিয়ার জন্য একটি লিখিত সংবিধান রচনার আশ্বাস দিয়ে ক্যাথারিন শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করেন নি, এবং দেশের লক্ষ লক্ষ ভূমিদাসকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা তাঁর সময়ে গৃহীত হয় নি। শোষিত কৃষককুলের অবস্থার উন্নতির জন্য ক্যাথারিনের কোন সদিচ্ছা ছিল বলে মনে হয় না। এ ছাড়া ফ্রেডারিকের মতো ক্যাথারিনেরও প্রধান কৃতিত্ব ছিল বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে। রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তি রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী হিসাবে দ্বিতীয় ক্যাথারিন

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট **দ্বিতীয় জোসেফ** (১৭৬৫-৯০ খ্রীঃ) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী

সম্রাটদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে উদারমনা এবং প্রজাহিতৈষী ছিলেন, যদিও তাঁর বহু প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর মাতা **মারিয়া টেরেসার** (Maria Theresa) সঙ্গে যুগ্মভাবে অষ্ট্রিয়ার শাসনকার্য পরিচালনা করেন, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মাতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। মারিয়া টেরেসাও অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু নতুন যুগের ভাবধারা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। তিনি রোমান-ক্যাথলিক চার্চের বিশেষ অনুরাগী, এবং সকল প্রকার মৌলিক পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয় জোসেফ কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও সংস্কারের আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে জোসেফ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন, কিন্তু তাঁর **বাস্তব চেতনা ও দূরদৃষ্টির একান্ত অভাব** ছিল। তাঁর দেশের ঐতিহ্য, দেশবাসীর বহুযুগ-পোষিত সংস্কার এবং প্রচলিত প্রথাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি স্বল্প সময়ে নানা বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন, এবং ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। যাদের মঙ্গলের জন্য তিনি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন তারাও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায় নি।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী হিসাবে দ্বিতীয় জোসেফ

দ্বিতীয় জোসেফের আরব্ধ বিভিন্ন সংস্কার-কার্যের মধ্যে প্রথমেই তাঁর **প্রশাসনিক সংস্কারের** কথা উল্লেখ করা যায়। এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীকরণ। অষ্ট্রিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ আঞ্চলিক শাসন ও আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে সমগ্র সাম্রাজ্যকে তেরোটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি প্রদেশে একজন সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। একমাত্র জার্মান ভাষাকেই সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং রাজধানী ভিয়েনা শহর থেকে সমগ্র দেশের শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাশিয়ার আদর্শে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীরও পুনর্গঠন করা হয় এবং বহু অনিচ্ছুক কৃষককে এতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মতো বহু জাতি-অধ্যুষিত এবং বহু ভাষা-ভাষী সাম্রাজ্যে এই ধরণের কেন্দ্রীকরণ-প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই বাধাপ্রাপ্ত হয়। গ্যালিসিয়া, লম্বার্ডি, হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়ার অধিবাসীরা তাঁদের আঞ্চলিক অধিকার রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন।

প্রশাসন

বিচার-বিভাগেও দ্বিতীয় জোসেফ নানা পরিবর্তন সাধন করেন। সমগ্র অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে একই ধরণের আইনের প্রচলন করা হয় এবং এই আইন বলবৎ করার জন্য

নতুন আদালত স্থাপন করা হয়। সাধারণ আদালতগুলির উপরে ছয়টি 'আপীল-আদালত' এবং তাদেরও উপরে একটি সর্বোচ্চ আদালত বা 'সুপ্রীম কোর্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। জোসেফ তাঁর সাম্রাজ্যে যে নতুন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের প্রচলন করেন তাতে নতুন যুগের চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়। একমাত্র রাজদ্রোহের জন্য নতুন আইনে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর শারীরিক নির্যাতনের প্রথা রহিত করা হয়। কিন্তু জোসেফের বিচার-বিভাগীয় সংস্কারও তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র সমাদৃত হয় নি। বেলজিয়ামের অধিবাসীরা তাঁদের স্থানীয় আইন-কানুন বিসর্জন দিতে প্রবল আপত্তি জানায় ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বিচার

ধর্মীয় ব্যাপারে জোসেফ রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের সমস্ত কুসংস্কার দূর করে চার্চকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। অষ্ট্রিয়ার প্রজাদের পোপের নিকট কোনো বিষয়ে আবেদন জানানো এবং সাম্রাজ্যের ভিতর সম্রাটের অনুমতি বিনা পোপের নির্দেশনামা (Papal Bull) প্রচারও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বিশপদের সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়, দুর্নীতির অভিযোগে বহু মঠ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং চার্চের কিছু কিছু সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ তাঁর বিখ্যাত সহিষ্ণুতার বিধান (Toleration Edict) প্রচার করে প্রোটেস্টাণ্ট, ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার দান করেন। আইনের চোখে রোম্যান ক্যাথলিকদের কোনো বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয় নি। জোসেফের আচরণে ভীত ক্যাথলিক প্রজাদের আশ্বস্ত করার জন্য পোপ ষষ্ঠ পায়াস অষ্ট্রিয়ায় পদার্পণ করেন এবং তাঁর আগমনে ক্যাথলিকদের মধ্যে এক নতুন ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি হয়। জোসেফের ধর্মীয় নীতি যুক্তিবাদীদের মনঃপূত হলেও এর পরিণামে তাঁর সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। অষ্ট্রিয়ার বিশাল, বহু জাতি-অধ্যুষিত সাম্রাজ্যে রোম্যান ক্যাথলিক চার্চই ছিল ঐক্য ও সংহতি-রক্ষার প্রধানতম উপায়, কারণ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাই ছিল রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমতে বিশ্বাসী। এই চার্চকে দুর্বল করার অর্থই ছিল সাম্রাজ্যের সংহতি নাশ।

ধর্ম

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জোসেফ তাঁর সাম্রাজ্যের সামন্ত বা অভিজাত সম্প্রদায়কে কর দানে বাধ্য করেন। এ ব্যাপারে অবশ্য তিনি মারিয়া টেরেসার পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অ্যাড্রিয়াটিক (Adriatic) সাগরের উপকূলবর্তী ফিউম (Fiume) বন্দরের উন্নতি সাধন, রাশিয়া, তুরস্ক, মরোক্কো প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি

অর্থনীতি

সম্পাদন, এবং চীন ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করা হয়। রাজধানী ভিয়েনা শহরে কিছু কিছু কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্য নতুন শুল্কনীতি গ্রহণ করা হয়। আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি ছিল এই নতুন নীতির উদ্দেশ্য।

সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জোসেফের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘোষণা। ভূমিদাসেরা স্বাধীন নাগরিকরূপে গণ্য হবে, নিজেদের জমি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার তাদের থাকবে, এবং ভূস্বামীদের জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে কৃষিকার্য করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিলেই চলবে—এই ছিল তাঁর ঘোষণার সারমর্ম। কিন্তু সম্রাটের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভূস্বামীদের প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে এই সংস্কারও বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। বিশেষতঃ হাঙ্গেরীতে ভূমিদাস প্রথা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।

সমাজ

বিভিন্ন মহল থেকে দ্বিতীয় জোসেফের সংস্কার-প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কৃষকেরা বাধ্যতামূলক ভাবে সামরিক বাহিনীতে কাজ করার বিরোধী ছিল। ভূস্বামী বা অভিজাত সম্প্রদায় তাদের বহু যুগের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার সহজে বিসর্জন দিতে চায় নি। ক্যাথলিক প্রজারা জোসেফের চার্চ-বিরোধী নীতিতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। জোসেফের কেন্দ্রীকরণ নীতিও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির কাছে বাধা পায়। মৃত্যুর পূর্বে জোসেফ তাঁর সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা স্বীকার করেন। তাঁর এই ব্যর্থতা থেকেই বোঝা যায় যে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থাকলেও সমাজ বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা তাঁদের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল।

বাধা-বিঘ্ন

উপরে যে তিন জন শাসকের সংস্কার-প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হল তাঁরা ছাড়াও স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লস (১৭৫৯-৮৮), পোর্তুগালের রাজা প্রথম জোসেফ (১৭৫০-৭৭) ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী পম্বাল, সুইডেনের রাজা তৃতীয় গাস্টাভাস (১৭৭১-৯২), সার্ডিনিয়ার রাজা তৃতীয় চার্লস ইম্যানুয়েল এবং টাস্কানির রাজা প্রথম লিওপোল্ড (১৭৬৫-৯০) এ যুগের 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক'রূপে ইতিহাসে পরিচিত, যদিও তাঁদের কৃতিত্ব তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। তৃতীয় চার্লস স্পেনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে উৎসাহ দেন, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, রাজপথ নির্মাণ ও খাল খনন করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান, সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি করেন, এবং উগ্র-ক্যাথলিকপন্থী জেসুইটদের কার্যকলাপ, বিশেষতঃ অন্ত-

অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক

ধর্মাবলম্বীদের উপর তাদের অত্যাচার বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে স্পেনের লোকসংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশেও স্পেনের ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল হয়। পোর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী পম্ব্যাল (Pombal) একাধারে যুক্তিবাদী দার্শনিক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি সামন্ত ও যাজক সম্প্রদায়ের শক্তি খর্ব করে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, শিক্ষা-প্রসারে উৎসাহ দেন এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হন। ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব কিন্তু এ যুগের ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নৃপতিদের বিশেষ প্রভাবিত করে নি। ইংলণ্ডের হ্যানোভার-বংশীয় রাজগণ এবং ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুই (Louis XV) কখনো জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরূপে ইতিহাসে পরিচিত হন নি; যুক্তিবাদী দার্শনিকদের চিন্তার প্রভাব তাঁদের কার্যকলাপে বিশেষ লক্ষিত হয় না। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ষোড়শ লুই-এর অর্থমন্ত্রী টুর্গো (Tourgot) অতি স্বল্পকালের জন্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেন (১৭৭৪-৭৬), কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলি বিশেষ সফল হয় নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাস
(Industrial Revolution)

শিল্প-বিপ্লবের অর্থ ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তারই পরিণামে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) সূচনা হয়। ইংলণ্ড ছিল এই শিল্প-বিপ্লবের জন্মস্থান, কিন্তু পরবর্তী কালে ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক 'শিল্প-বিপ্লব' কথাটির ব্যবহার যথার্থ হয়েছে বলে মনে করেন না। 'বিপ্লব' বলতে আমরা সচরাচর বুঝি এক দ্রুত, ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তন; কিন্তু উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে নতুন নতুন শিল্প-সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াকে শিল্প-বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়, সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল, এবং এক হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজও চলেছে। কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে 'শিল্প-বিপ্লব' নামটি ইতিহাসের পাতায় এমনই গেঁথে গেছে, যে আজ সহসা এই নামটি বর্জন করা চলে না। তাছাড়া, শিল্প-বিপ্লব দীর্ঘকাল ধরে চললেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই ইংলণ্ডের শিল্প-ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল, এবং ইতিহাসে ঐ যুগটিকেই শিল্প-বিপ্লবের জন্মকাল বলা হয়। 'শিল্প-বিপ্লব' নামটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী নেতা ব্লাঙ্কি (Blanqui), ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। ব্লাঙ্কি মনে করতেন যে ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব, এই দুটি মিলে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এক নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, যে সভ্যতা পূর্ববর্তী যুগের সভ্যতা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই মত পুরোপুরি গ্রহণ করতে না পারলেও 'শিল্প-বিপ্লব' কথাটির ব্যবহার যে ঐতিহাসিক বিচার-সঙ্গত, একথা স্বীকার করতে হয়।

শিল্প-বিপ্লব নামটি কি সঙ্গত?

শিল্প-বিপ্লবের কারণ ঃ ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল মূলতঃ **দুটি কারণে**। প্রথমতঃ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভাস্কো ডা-গামা, কলাম্বাস, ম্যাগেলান, ড্রেক প্রমুখ বিভিন্ন দুঃসাহসী ভূ-পর্যটকদের ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে স্পেন, পোর্তুগাল,

হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এইসব উপনিবেশগুলিতে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপর দিকে সেখানে শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা-মালও সুলভে ও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। উপনিবেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারের ফলে ইউরোপীয়গণের মূলধনের সঞ্চয়ও দ্রুত বেড়ে ওঠে। এইসব পরিবর্তনের ফলে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন ও ব্যাপক শিল্পোৎপাদনের সম্ভাবনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কুটিরশিল্প ক্রমপ্রসরমান সভ্য জগতের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়, তারই ফলে পরবর্তী শতকে নানা নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল এবং এইসব যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ বহু গুণ বর্ধিত হয়, পরিবহণ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থার এই বিরাট পরিবর্তনকেই শিল্প-বিপ্লব বলে।

উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তার—মূলধন বৃদ্ধি

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ইংলণ্ডে বিপ্লবের সূচনা হয় কেন? শিল্প-বিপ্লব যে ইউরোপের মধ্যে **প্রথমে ইংলণ্ডে আরম্ভ হয়,** তারও নানা ঐতিহাসিক কারণ আছে। শিল্প-বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি ইংলণ্ডেই প্রথম হয়েছিল। কিভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়? প্রথমতঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যাঙ্ক থেকে মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংলণ্ডে সর্বাধিক ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর গৌরবময় বিপ্লবের অল্পকাল পরেই 'ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের' (Bank of England) প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাছাড়া, লাভজনক পশমের ব্যবসায়ের মাধ্যমে এ যুগের ইংরাজ বণিকেরা প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করেছিল এবং এই মূলধন তারা বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ করে আরো ধনী হতে চাইছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে অপেক্ষাকৃত অল্প পারিশ্রমিকে কল-কারখানায় কাজ করার উপযুক্ত বহু শ্রমিক এ যুগে পাওয়া যেত। কৃষি-বিপ্লবের ফলে যে সব ক্ষুদ্র কৃষক তাদের জমি হতে উৎখাত হয়েছিল, স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কল-কারখানায় কাজ করতে তারা উদ্‌গ্রীব ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ডের জনসংখ্যাও এ যুগে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা যত ছিল, এই শতাব্দীর শেষে লোকসংখ্যা তার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে লোকসংখ্যা আবার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবিকা-নির্বাহ কৃষি থেকে হওয়া অসম্ভব ছিল। তাই কল-কারখানায় কাজের

মূলধনের প্রাচুর্য

শ্রমিকের প্রাচুর্য

লোকের কোনো অভাব হয়নি। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশও শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল ছিল। কলে সুতা তৈয়ারী ও বস্ত্র বয়নের পক্ষে এখানকার আর্দ্র জলবায়ু অত্যন্ত উপযোগী ছিল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ডে জলশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। তাছাড়া, কল-কারখানা গড়ার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কয়লা এবং লোহা ইংলণ্ডের খনিগুলি হতে প্রচুর পরিমাণে নিষ্কাশিত হত। ইংলণ্ডের কয়লা-খনিগুলি ফ্রান্স ও জার্মানীর খনিগুলি হতে আকারে বৃহত্তর এবং দেশের প্রধান বন্দরগুলির অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত ছিল। চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডে সমুদ্র-পথে যোগাযোগের ব্যবস্থা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেক ভালো ছিল। দেশের চারদিকেই সমুদ্র থাকায় ইংলণ্ডে বহু বন্দর এবং প্রচুর মাল-বহনের উপযোগী জাহাজ ছিল। দেশের কোন স্থানই সমুদ্র হতে ৬০-৭০ মাইলের অধিক দূরে ছিল না, ফলে অন্তর্বর্তী নগরগুলিকেও স্থল জলপথে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করা বিশেষ কষ্টকর ছিল না। পঞ্চমতঃ, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ডের একটি বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। কাঁচামাল আমদানি এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির পক্ষে এই উপনিবেশগুলি ছিল উৎকৃষ্ট বাজার। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত এবং দূর প্রাচ্যেও এ সময় ইংরাজ বণিকদের যাতায়াত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য ইংলণ্ড থেকে আমদানি করত। ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের, বিশেষতঃ সস্তা সুতীবস্ত্রের, চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সব শেষে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে প্রচলিত শিল্প-সংগঠন শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল ছিল। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের উপর রাষ্ট্রের অথবা মধ্যযুগীয় সমবায়-সংঘগুলির (guild) নিয়ন্ত্রণ খুবই ক্ষীণ ছিল। ফলে, তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উদ্ভাবন-প্রচেষ্টা কখনোই বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ সব সময়ে তারা গ্রহণ করত, এবং তাদের এই চাহিদার জন্যই কারিগরি বিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়।

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ

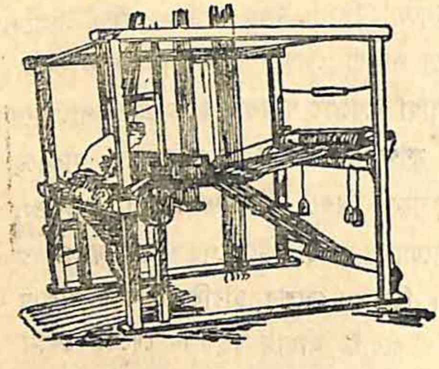
সমুদ্রের নৈকট্য

উপনিবেশ বিস্তার

অনুকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

শিল্প-বিপ্লবের ধারা : ইংলণ্ডে **বস্ত্রশিল্পের** ক্ষেত্রেই প্রথম শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয় এবং বড় কল-কারখানা গড়ে ওঠে। যদিও এদেশে সুতীশিল্পের তুলনায় পশম-শিল্প প্রাচীনতর ছিল, তবুও নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির দ্বারা প্রথমোক্ত শিল্পই বেশি লাভবান হয়। ভারতবর্ষ থেকে এ সময় সুতীবস্ত্রের আমদানি আইনের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দেওয়ায় দেশে সুতীবস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ১৭৩৩ থেকে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে **জন কে** (John Kay), **জেমস**

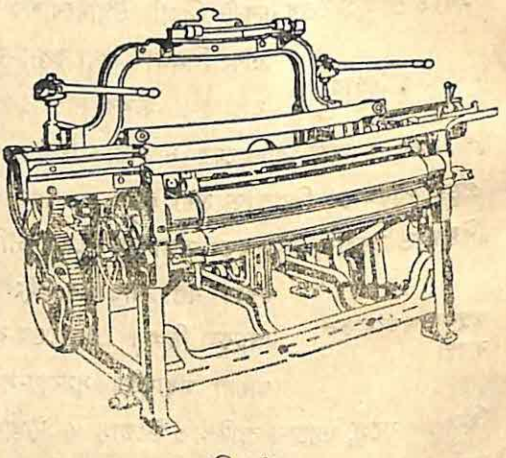
হারগ্রিভ্‌স্ (James Hargreaves), **স্যামুয়েল ক্রম্প্‌টন** (Samuel Crompton) এবং **এডমাণ্ড কার্টরাইটের** (Edmund Cartwright) বিভিন্ন



হস্তচালিত তাঁত

বস্ত্রশিল্পে পরিবর্তন

আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে ও অল্পপরিশ্রমে বেশী সূতা কাটার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। **আর্করাইট**(Arkwright) সূতা বোনার জন্য জল-শক্তির দ্বারা চালিত একটি নতুন তাঁত যন্ত্র (powerloom) আবিষ্কার করেন। এইসব যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র-বয়ন শিল্পে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সূতীবস্ত্রের উৎপাদন ইংলণ্ডে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এক লক্ষেরও অধিক তাঁতযন্ত্র চালু করা হয়, এবং সূতীবস্ত্র ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্যে পরিণত হয়।



যন্ত্রচালিত তাঁত

নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও কল-কারখানা স্থাপনের জন্য **লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি** অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আকরিক লোহা গলাবার জন্য আগে কাঠ-কয়লার ব্যবহারই বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বহু বন-জঙ্গল নষ্ট হওয়ার ফলে কালক্রমে এই উদ্দেশ্যে কয়লার ব্যবহার

লৌহযুগের সূচনা

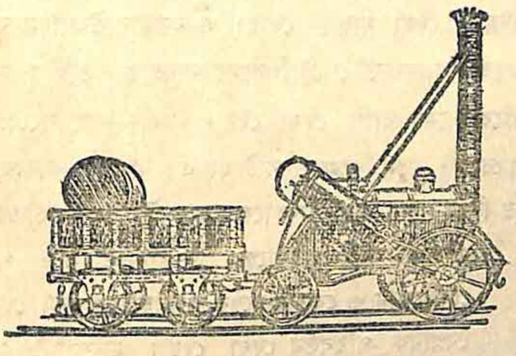
বৃদ্ধি পায়। লোহা গলাবার জন্য এক বিশেষ ধরণের চুল্লী (Blust Furnace) আবিষ্কৃত হলে লোহার উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে 'লৌহ-যুগের' সূচনা হয়। একই সময় **বাষ্পীয় শক্তি** (Steam power) ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশের সর্বত্র কল-কারখানা স্থাপনও সম্ভব হয়। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে **জেমস ওয়াট** (James Watt) প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ করেন, এবং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পে এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম লোহার জাহাজ তৈরী হয়, এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্রিটিশ

স্টীমার 'কমেট্' ক্লাইড (Clyde) নদীতে যাত্রা শুরু করে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে **জর্জ স্টিফেনসন** (George Stephenson) বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত রেলগাড়ী আবিষ্কার করেন। এই রেলগাড়ী ঘণ্টায় মাত্র তিন মাইল পথ অতিক্রম করত এবং খনি হতে শিল্পাঞ্চলে কয়লা পরিবহনের জন্যই এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লোক-চলাচলের জন্য রেলগাড়ীর ব্যবহার আরম্ভ হয়, এবং পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে ইংলণ্ডে প্রায় ছয় হাজার মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক রেলপথে যাতায়াত আরম্ভ করে। এইভাবে দেশের পরিবহণ ব্যবস্থাতেও এক বিরাট পরিবর্তন আসে।

বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার



জেমস ওয়াট



স্টিফেনসনের উদ্ভাবিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন

ক্রমশঃ, ইংলণ্ডের নতুন শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নতুন নতুন **পথ-ঘাট নির্মাণ** ও **খাল-খনন** আরম্ভ হয়। নদী ও খাল-পথে এ যুগে বহু লোক দেশের ভিতরে যাতায়াত করত। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে **জন ম্যাকাডাম** (John Macadam) পাথর-কুচি ও পীচের দ্বারা কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী রাজপথ নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করেন। এই সব পথে লোক ও ডাক-চলাচল দুই-ই বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দুটি বাষ্পচালিত জাহাজ যথাক্রমে ১৮ ও ১৫ দিনে আটলান্টিক মহাসাগর পারাপার করে। এর দু' বৎসর পরে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিয়মিত সমুদ্র-

যানবাহনের উন্নতি

পথে যাতায়াতের জন্য 'কুনার্ড লাইন' (Cunard Line) নামে বিখ্যাত জাহাজী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য লোহার মতো কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিও অত্যাবশ্যক ছিল। খনির মধ্যেও ধীরে ধীরে বাষ্প-চালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম দিকে খনির মধ্যে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটত এবং তার ফলে বহু শ্রমিকের প্রাণ-হানি হত। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে হাম্‌ফ্রি ডেভির (Davy) আবিষ্কৃত **নিরাপত্তা বাতির** (Safety lamp) ব্যবহার প্রচলিত হলে কয়লার খনিতে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম বিপজ্জনক হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে কয়লার গ্যাস হতে বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হয়; রন্ধনের উদ্দেশ্যে গ্যাসের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে; এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে বহু গৃহ ও রাজপথ গ্যাসের আলোকে সজ্জিত হয়। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বৈদ্যুতিক বাতির আবির্ভাব হয়।

খনিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্প-বিপ্লবের গতি দ্রুততর হয়। বস্ত্র-শিল্পে এই সময়ে বিস্ময়কর উন্নতি দেখা যায়। লোহা ও কয়লার উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। জ্বালানি হিসাবে কয়লার পরিবর্তে পেট্রোলিয়মের ব্যবহার শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচলিত হয় এবং শীঘ্রই কেরোসিনের বাতি দেখা দেয়। রবার-শিল্প, ফটোগ্রাফ-শিল্প, ফল ও মৎস্য-সংরক্ষণ শিল্প প্রভৃতি নতুন শিল্পেরও সৃষ্টি হয় এই যুগে। আবার, চর্মশিল্পের মতো অনেক পুরানো ক্ষুদ্র শিল্পে নতুন যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে মারণাস্ত্রের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্রুতগামী 'ট্রেন' ও বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিমান-পোতে আকাশ ভ্রমণের ব্যাপারেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত হয় এই যুগে। সেলাই-এর কল, টাইপ-রাইটার, হিসাব করার যন্ত্র প্রভৃতি নানা ছোটখাটো যন্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সহায়ক হিসাবে আবিষ্কৃত হয়। কৃষিকার্যেও বৈজ্ঞানিক সার এবং যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের মজুরী বাঁচানো কিছুটা সম্ভবপর হয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই শিল্প-বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছে মনে করলে ভুল করা হবে; এক হিসাবে আজও এই বিপ্লব চলেছে। বাষ্পীয় শক্তির সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিক শক্তি, এবং অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহারও প্রচলিত হতে চলেছে। নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের

নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ফলে যন্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে এবং পরিবহণ ব্যবস্থাতেও এসেছে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন।

ইংলণ্ডের বাইরে শিল্প-বিপ্লবের প্রসার ঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক যোগাযোগ এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে শিল্প-বিপ্লব অনিবার্য ভাবে ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে **ফ্রান্সের** লিয়ঁ (Lyons) শহরের কাছে জনৈক ব্রিটিশ শিল্পপতির চেষ্টায় ধাতব পদার্থ ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য একটি বড় কারখানা স্থাপিত হয়, এবং বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত যন্ত্র সেখানে ব্যবহৃত হয়।

ফ্রান্স

কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হওয়ায় অল্পদিন পরেই ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেওয়ায় (১৭৮৯) শিল্পের উন্নতি সেখানে ব্যাহত হয়। নেপোলিয়ন (Napoleon) ক্ষমতায় আসার পর বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। দেশে কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, ফরাসী শিল্পপতিদের জন্য সরকারী ঋণ মঞ্জুর করে, এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের পথ বন্ধ করে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ দেন। নেপোলিয়নের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নি নানা কারণে। এর মধ্যে প্রধান কারণ ছিল ঐ দেশে প্রয়োজনীয় কয়লা ও উন্নত মানের লোহার অভাব। ফরাসী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় আকারে ক্ষুদ্র ছিল, এবং প্রধানতঃ বিলাস-দ্রব্যই সেখানে উৎপাদন করা হত। নেপোলিয়নের পতনের পর অবশ্য শিল্প-বিপ্লব ফ্রান্সে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে, কয়লা ও লোহার উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং কল-কারখানায় বাষ্পচালিত যন্ত্রের ব্যবহারও অনেক বাড়ে। লুই ফিলিপের (Louis Philippe) রাজত্বকালে (১৮৩০-৪৮) সরকারী আনুকূল্যে ফরাসী শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে এবং একটি প্রভাবশালী শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নও (১৮৫২-৭০) শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহ দেন, এবং বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি-শুল্ক বৃদ্ধি করে দেশজ শিল্প সংরক্ষণের নীতি (tariff protection) গ্রহণ করেন। বয়নশিল্পে ব্যাপক ভাবে যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়, এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ হতে রেলপথ-নির্মাণের কাজও ত্বরান্বিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের শহরগুলিতে কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের পরেই ফ্রান্সের স্থান হয়। অবশ্য দেশের উত্তরাঞ্চলেই শিল্প-সমৃদ্ধি বেশি দেখা যায়।

ফ্রান্সের মতো **বেলজিয়ামেও** একজন ইংরাজ শিল্পপতি শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত

ঘটান ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, পশমী বস্ত্র উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করে। বেলজিয়ামে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যেত, এবং সেখানকার অধিবাসীরাও শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সারা দেশে রেলপথ নির্মাণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, এবং ১৮৭০ সালের মধ্যে বেলজিয়ামে শিল্প-বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে।

বেলজিয়াম

কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে **জার্মানীতে** শিল্প-বিপ্লবের তেমন প্রসার ঘটেনি প্রধানতঃ দুটি কারণে ; প্রথম কারণ রাজনৈতিক অনৈক্য, দ্বিতীয় কারণ মধ্যযুগীয় সমবায়-সংঘগুলির (guilds) চাপে শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই অবশ্য ইংলণ্ড থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে জার্মানীতে, বিশেষতঃ প্রাশিয়া রাজ্যে, কিছু কিছু কল-কারখানা গড়ে তোলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য-সংঘ (Zollverein) স্থাপন করলে ঐ দেশে শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাহায্যে জার্মানীর প্রথম রেলপথ (ড্রেসডেন থেকে লিপ্‌জিগ শহর পর্যন্ত) নির্মিত হয়, এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই প্রায় তিন হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। জার্মানীর বহু নদীতে 'স্টীমার' চলাচল আরম্ভ হয়ে যায়, কয়লা ও লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সাইলেশিয়া, স্যাক্সনি, ওয়েস্টফ্যালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহু কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তবে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনের পরই ঐ দেশে শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত প্রসার ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জার্মানীর শিল্প-সমৃদ্ধি অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং ফ্রান্সকে অতিক্রম করে জার্মানী বিশ্ব-বাণিজ্যে ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এই ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ।

জার্মানী

ইংলণ্ডের বাইরে শিল্প-বিপ্লব ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানতঃ জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্ট্রিয়া, ইটালী ও রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে।

শিল্প-বিপ্লবের ফল ঃ শিল্প-বিপ্লবের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, এবং তার পরিণামে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান সুবিধাই ছিল এই যে অল্প পরিশ্রমে, অল্প লোকের সাহায্যে ও অল্প সময়ে বহু পণ্যদ্রব্য যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করা যেত।

এর ফলে কালক্রমে শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলিতে ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য দেখা গেল, এবং **জীবনযাত্রার মানও** ধীরে ধীরে উন্নত হল। পূর্ববর্তী কালের তুলনায় সমাজের অনেক অধিক সংখ্যক লোক উন্নততর জীবনযাপনের সুবিধা লাভ করল। ভালো খাবার ও কাপড়-চোপড়, কলের জল, গ্যাস এবং বিদ্যুতের আলোর সুবিধা ক্রমশঃ সাধারণ লোকেরও আয়ত্তে এল। পরিবহণ ব্যবস্থাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসার ফলে দ্রুতগতিতে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হল। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের পথও প্রশস্ত হল। ইংলণ্ডেই প্রথম এই যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হওয়াতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। নেপোলিয়নকেও যে ইংলণ্ডের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয় তার একটি প্রধান কারণ এই শিল্প-বিপ্লব। ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য ইউরোপে প্রায় শতবর্ষ স্থায়ী হয়েছিল।

জীবনযাত্রার উন্নত মান

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে মধ্যযুগের কুটিরশিল্প, কারিগর শ্রেণী এবং সমবায়-সংঘগুলির (Guilds) ধীরে ধীরে অবসান ঘটে ও তার পরিবর্তে এক নতুন **ধনতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থা** ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর (Capitalist) অভ্যুদয় হয়। মধ্যযুগের কারিগরেরা তাদের গৃহে অথবা বিপণিতে বসে নিজস্ব ছোট ছোট যন্ত্রের সাহায্যে শিল্প-পণ্য উৎপাদন করত। কিন্তু বড় বড় বাষ্প বা বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র কিনে কল-কারখানা চালানোর আর্থিক সঙ্গতি তাদের ছিল না। সে সঙ্গতি ছিল মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির, যাঁরা প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল কিনে ও বহু শ্রমিক নিয়োগ করে যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পণ্য উৎপাদন করতে এবং সেই পণ্য স্বদেশে ও বিদেশে বিক্রয় করতে পারতেন। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম যুগে আর্করাইট বা ওয়াটের মতো স্বল্পবিত্ত লোকও শিল্পপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন। কিন্তু শীঘ্রই বৃহৎ জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং তাঁদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আনলেন। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচুর মূলধনের বিনিয়োগ এইভাবে সম্ভব হয় এবং কালক্রমে যৌথ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে (Joint Stock Company) বহু ধনী ব্যক্তির মূলধন নিয়োজিত হতে থাকে।

ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়

তৃতীয়তঃ, শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে ব্যাপক হারে **জনসংখ্যা বৃদ্ধি** ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় ইউরোপে জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে বারো কোটি; ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই লোকসংখ্যা দাঁড়ায় আঠার কোটি সত্তর লক্ষে, এবং ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫০ খ্রীঃ) এর

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পরিমাপ হয় বাইশ কোটি ষাট লক্ষ। ১৭৬০ হতে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী ষাট বৎসরে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা আনুমানিক ৬৭ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় এক কোটি কুড়ি লক্ষে। সাধারণভাবে বলা চলে যে, এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল সেইসব এলাকায়, যেখানে নতুন শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। শিল্প-বিপ্লবের আনুষঙ্গিক হিসাবে উন্নত মানের খাদ্য সরবরাহ ও উন্নততর স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য মৃত্যুর হার উল্লেখ-যোগ্যভাবে হ্রাস পায়; প্রধানতঃ, সেই কারণেই এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

চতুর্থতঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের অগ্রসর দেশগুলিতে **অনেক নতুন শহর** গড়ে ওঠে, এবং পুরানো শহরগুলিরও বহু ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ হয়। বড় বড় কল-কারখানা-গুলি এইসব শহরেই স্থাপিত হয়, এবং গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক কারখানায় কাজ পাওয়ার আশায় শহরে এসে বসবাস আরম্ভ করে। ইংলণ্ডে লণ্ডন শহরের বিরাট প্রসার ঘটে। ব্রিস্টল, গ্লাসগো প্রভৃতি ছোট শহরগুলি বড় শহরে পরিণত হয়; আর লিভারপুল, লীডস্, শেফিল্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি অনেক শহরও এই সময়ে গড়ে ওঠে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডের জনসংখ্যার অর্ধেকই হয় নগরবাসী। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। ব্রাসেলস্, প্যারিস, লিল্ বা বার্লিনের মত শহর শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিশাল আকার ধারণ করে, এবং আগের যুগের অনেক গ্রামও নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে শহরে রূপান্তরিত হয়।

নাগরিক সভ্যতার প্রসার

পঞ্চমতঃ, নতুন শহরগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসেরও পরিবর্তন হয়। আগের যুগের জমিদার, কৃষক, বণিক প্রভৃতি শ্রেণীগুলির সঙ্গে এ যুগে যুক্ত হয় এক নতুন পুঁজিবাদী শ্রেণী ও কারখানায় কর্মরত শ্রমজীবী সম্প্রদায়। (পুঁজিবাদীদের সহায়ক ও তাদের উপর একান্ত নির্ভরশীল কয়েকটি নতুন বৃত্তিরও সৃষ্টি হয় এ যুগে, যেমন শিল্প-সংস্থার পরিচালক, যন্ত্রবিদ্, ইত্যাদি।) নতুন যে দুটি সামাজিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল এ-যুগে, তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হলেও তাদের ভিতরের ব্যবধান ছিল দুস্তর। কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থার ধরনই এ রকম ছিল যে, কর্মী শ্রমিক ও কর্মদাতা মালিকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের কোনো সূত্র সেখানে ছিল না। কারখানার অংশীদারেরা কেউ কেউ হয়ত সারাজীবনে কারখানায় পদার্পণই করেন নি। ফলে, সূচনা থেকেই **শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক** ছিল অবিশ্বাস ও সন্দেহের, যদিও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় উভয়েরই সাধারণ স্বার্থ ছিল। পুঁজিপতি শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে সমাজে ভূস্বামীদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়, এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্যও এই দুই শ্রেণীর

শ্রেণীবিরোধ: মালিক বনাম শ্রমিক

মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই কারণে একাধিকবার ব্রিটিশ সংবিধানের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল।

এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে নতুন শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় **সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থা** বিশেষ সুখকর ছিল না। তাদের কাজ ছিল নিতান্তই যান্ত্রিক, ব্যক্তিগত কৌশল দেখাবার সুযোগ সেখানে ছিল না। একজন সাধারণ শ্রমিককে দিনে বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা অস্বাস্থ্যকর ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হত। খনিতে কাজ করলে সারাদিনে দিবালোক দেখার সৌভাগ্যই তার ঘটত না। কাজে না এলে বা দেরিতে আসলে জরিমানা হত। পরিবারের অন্যান্য লোকেদের কাছ থেকে অনেক সময়ে তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হত। কারখানায় বা খনিতে স্ত্রীলোক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদেরও কঠোর পরিশ্রম করা বাধ্যতামূলক ছিল। শ্রমিকদের বাসস্থানগুলিও ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও নানা রোগের আকর। কারখানা-সংলগ্ন শহরগুলির পরিবেশও ছিল অনেক সময় দূষিত। সবার উপরে ছিল শ্রমিকদের চাকুরীর অনিশ্চয়তা। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোন কারণে ব্যবসায়-জগতে মন্দা দেখা দিলে, কল-কারখানায় ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের কর্মহানি ঘটত, এবং কর্মচ্যুত শ্রমিকদের অন্ন-সংস্থানের কোন ব্যবস্থা কারখানার মালিক বা দেশের সরকার করত না। উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে এই ধরণের মন্দা ও তার অনিবার্য ফলস্বরূপ বেকার সমস্যার উদ্ভব দেখা যায়।

শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থা

প্রথম দিকে শ্রমিকেরা তাদের এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো পথ খুঁজে পায়নি। ইংলণ্ডের মতো উদারমতাবলম্বী দেশের পার্লামেণ্ট ছিল ধনী ভূ-স্বামীদের প্রভাবাধীন। এডমাণ্ড্ বার্কের (Edmund Burke) মতো বিখ্যাত বাগ্মী ভারত ও আমেরিকাস্থিত ব্রিটিশ প্রজাদের দুঃখে বিচলিত বোধ করলেও স্বদেশের নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। পার্লামেণ্ট শুধু যে শ্রমিকদের দুর্দশায় নির্বিকার ছিল তা নয়, কোন কোন ব্যাপারে তাঁরা শিল্পপতিদের চক্রান্তে সহায়তা করেছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনের দ্বারা তাঁরা শ্রমজীবী-সংঘ (Trade Union) গঠন নিষিদ্ধ করে দেন; তার ফলে শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করার ক্ষমতাও হারায়। শিল্পপতিরা সহসা প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়ে পড়েন, এবং তাঁদের কার্যকলাপে যাতে কোনো দিক থেকে বাধা না আসে, সেজন্য অবাধ শিল্প-বাণিজ্যের নীতি (Laissez Faire) প্রচার করতে থাকেন। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), ম্যালথাস (Malthus) ও রিকার্ডোর

সরকারের ঔদাসীন্য

অবাধ শিল্প-বাণিজ্যের দাবী

(Ricardo) মতো এ যুগের খ্যাতনামা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদগণ এবং জেরেমি বেন্থামের মতো দার্শনিকও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের অবাধ কার্যকলাপের সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অসঙ্গত, এবং পণ্যমূল্য ও শ্রমিকদের মজুরী বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে,—এই ছিল তাঁদের মূল বক্তব্য। আইনের সাহায্যে শিল্পপতিদের মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করা অথবা শ্রমিকদের সুরক্ষিত করার চেষ্টাকে তাঁরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলেই মনে করতেন। চতুর্দিক থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শ্রমিকেরা প্রথমে যন্ত্রগুলিকেই তাদের শত্রু বলে মনে করে সেগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। ইংলণ্ডে এইভাবে লাড্ডাইট্‌দের দাঙ্গা (Luddite Riots) দেখা দেয়। কিন্তু তাদের এই নীতির ভ্রান্তি শীঘ্রই তাদের বোধগম্য হয়, এবং তখন তারা আপন অধিকার আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের চেষ্টা করে। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য ধীরে ধীরে অনুভূত হয়। এর অল্পকাল পরেই সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) মধ্যে শ্রমিকেরা তাদের আন্দোলনের নতুন হাতিয়ার খুঁজে পায়।

শ্রমিক আন্দোলন

সব শেষে বলা যায় যে, শিল্প-বিপ্লবের ফলেই ইউরোপের শিল্পোন্নত জাতিদের মধ্যে **উপনিবেশ বিস্তারের প্রবণতা** বৃদ্ধি পায়। সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের প্রয়োজনেই উপনিবেশ স্থাপন একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি গড়ে ওঠে এবং উপনিবেশ বিস্তার নিয়ে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ক্রমশঃ তীব্র হয় ও নানা যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম
(War of American Independence)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ব-ইতিহাসে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর প্রভাব শুধু আমেরিকা মহাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না; ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশও এই সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কারণঃ আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করা প্রয়োজন। উত্তর আমেরিকায় আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে ইংরেজদের তেরোটি বিচ্ছিন্ন উপনিবেশ ছিল। এই উপনিবেশগুলি আইনতঃ সকল বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীন হলেও কার্যতঃ তারা স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা উপভোগ করত। প্রতিটি উপনিবেশে একটি প্রতিনিধি-সভা ছিল, এবং উপনিবেশের প্রশাসক (Governor) ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত ব্যক্তি হলেও এই প্রতিনিধি-সভার সহায়তায় তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্যই উপনিবেশগুলির দৈনন্দিন শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

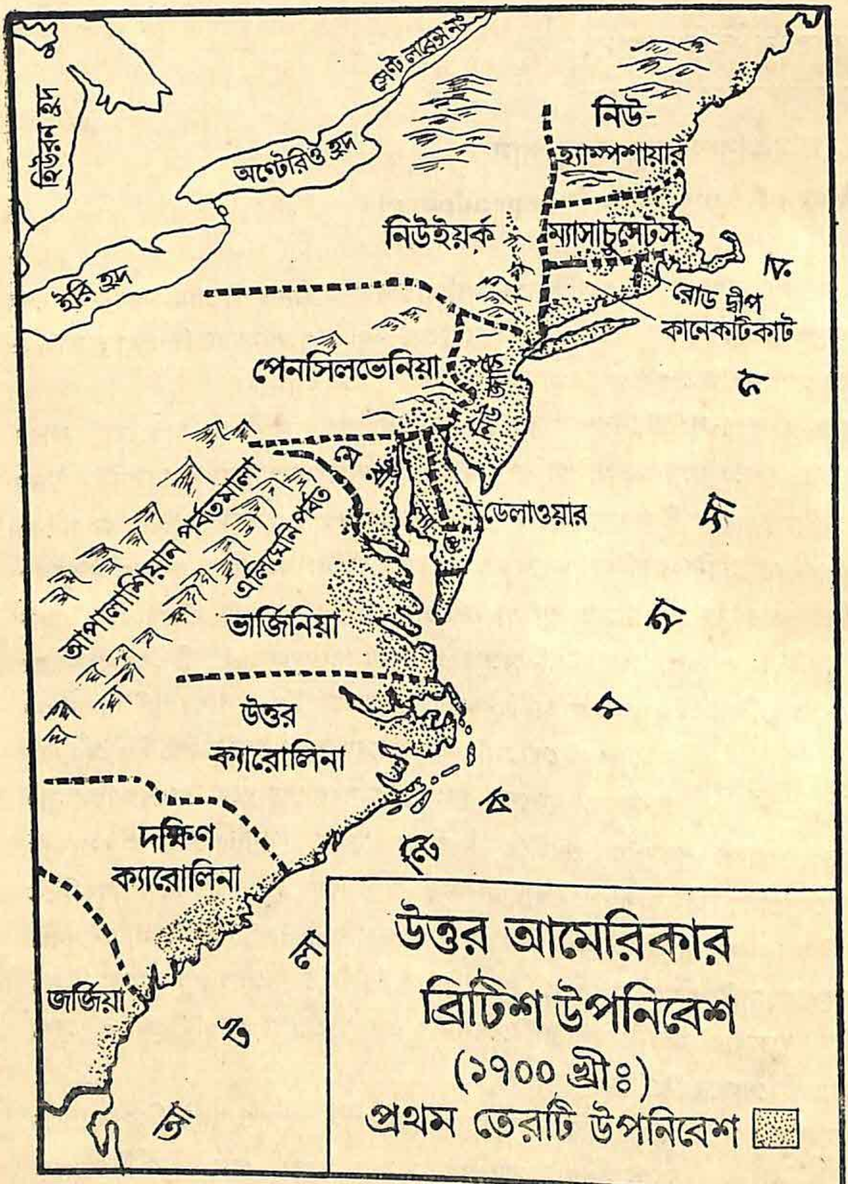
রাজনৈতিক পটভূমিকা

এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের 'হুইগ' (Whig) দলের সরকার উপনিবেশগুলির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ইংলণ্ডের তুলনায় উপনিবেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কম থাকায় ও 'পিউরিটান' (Puritan) ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় সেখানে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উপনিবেশগুলির এই স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতেই সেখানে বিদ্রোহের সূচনা হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ লাভ করলেও অর্থনৈতিক ব্যাপারে উপনিবেশগুলি মাতৃভূমি ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন ছিল এবং মাতৃভূমির স্বার্থে তাদের শিল্প-বাণিজ্যের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। প্রথমতঃ, উপনিবেশগুলিতে উৎপন্ন তামাক, তুলা, চিনি প্রভৃতি

অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ

সমস্ত উল্লেখযোগ্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হতে পারত শুধু ইংলণ্ডের বন্দরগুলির মাধ্যমে। এর জন্য ব্রিটিশ সরকার শুল্ক বাবদ কিছু অর্থ লাভ করত।



দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ হতে উপনিবেশগুলিতে পণ্যদ্রব্য আসতও ইংলণ্ড ঘুরে, যাতে করে ব্রিটিশ সরকার ও বণিকেরা মাঝখান থেকে কিছুটা মুনাফা পেতে পারে। তৃতীয়তঃ,

উপনিবেশগুলির বন্দরে কেবলমাত্র ব্রিটিশ জাহাজ অথবা ঔপনিবেশিকদের জাহাজগুলির প্রবেশাধিকার ছিল। অন্য কোন দেশের জাহাজে উপনিবেশগুলির পণ্য আদান-প্রদান করা চলত না। চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য উপনিবেশগুলিতে কতকগুলি শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। 'মার্কেণ্টাইল' নীতি (Mercantilism) প্রসূত এইসব বিধি-নিষেধগুলি ঔপবেনিবেশিকদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এক বিরাট অন্তরায় ছিল, এবং স্বভাবতঃই তাদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মার্কিন ব্যবসায়ীরা অনেকে কার্যতঃ এইসব বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করত চোরা-কারবারের আশ্রয় নিয়ে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়ালপোল (১৭২১-৪২) (Robert Walpole) গোলমাল এড়াবার জন্য এসব ব্যাপার দেখেও দেখতেন না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন করে মার্কিনীদের অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করার চেষ্টা করলে তারা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। এ ছাড়া ঔপনিবেশিকেরা অনেক সময়ে ছলে, বলে, কৌশলে আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড্ ইণ্ডিয়ান'দের (Red Indian) জমি হস্তগত করার চেষ্টা করত। ব্রিটিশ সরকার তাদের এই চেষ্টায় বাধা দিলে সেটাও তাদের ক্ষোভের কারণ হয়।

নানা কারণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও ঔপনিবেশিককেরা বহুদিন প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাবার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। প্রথমতঃ. তাদের নিজেদের মধ্যেই নানা বিষয়ে অনৈক্য ও পার্থক্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, উত্তরে কানাডা অঞ্চল যতদিন ফ্রান্সের অধীনে ছিল, ততদিন ঔপনিবেশিকরা সর্বদা ফরাসী আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য ছাড়া তাদের নিরাপত্তা রক্ষা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩) (Seven Years' War) ইংলণ্ড, ফ্রান্সকে পরাজিত করে কানাডা অধিকার করলে ঔপনিবেশিকদের ফরাসী আক্রমণের ভীতি সম্পূর্ণ দূর হয় এবং তারা ইংলণ্ডের বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করবার সাহস পায়।

ফরাসী আক্রমণের ভীতি লোপ

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে বিজয়ীর সম্মান লাভ করলেও এই যুদ্ধের পরিণামেই ইংলণ্ডকে তার উত্তর আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হতে হয়। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রচুর অর্থব্যয় হওয়ায় তাকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল। আমেরিকার উপনিবেশ-গুলিকে ফরাসী ও 'রেড ইণ্ডিয়ান'দের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য সে সময় একটি বৃহৎ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে উত্তর আমেরিকায় মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত করল যে, এই সেনাদলের ব্যয়ভারের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ঔপনিবেশিকদেরই বহন করতে

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যক্ষ কর আরোপ

হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল (George Grenville) আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের উপর কর স্থাপনের ব্যবস্থা করলে ইংলণ্ডের সঙ্গে তার উপনিবেশগুলির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ আরম্ভ হয়।

গ্রেনভিলের স্ট্যাম্প আইন

গ্রেনভিলই প্রথম ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী যিনি মার্কিন ব্যবসায়ীদের চোরা কারবার বন্ধ করার চেষ্টা করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'স্ট্যাম্প' আইন (Stamp Act) প্রণয়ন করে উপনিবেশগুলিতে যাবতীয় আইন ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত দলিলপত্র এবং সংবাদপত্রের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে 'স্ট্যাম্প' লাগাবার ব্যবস্থা করে। এই 'স্ট্যাম্প' বিক্রয়ের অর্থ (প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ড) থেকে আমেরিকাস্থিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যয় ভার আংশিকভাবে বহন করা হবে, বলা হয়। উপনিবেশগুলি অবিলম্বে এই প্রত্যক্ষ কর স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তাদের বক্তব্য ছিল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রাধান্য রক্ষার জন্যই পরিচালিত হয়েছিল, আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের স্বার্থে নয়। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার যদি এই যুদ্ধের ফলে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকে, তারা ঔপনিবেশিকদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারে। কিন্তু যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঔপনিবেশিকদের প্রতিনিধি পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই, সেই পার্লামেণ্ট ঔপনিবেশিকদের উপর কর স্থাপন করতে পারে না। ঔপনিবেশিকদের প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত না হলে পার্লামেণ্টের কর স্থাপনের পাল্টা দাবীও স্বীকার করা হবে না (No Taxation Without Representation)। কার্যতঃ আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবী করে। ঔপনিবেশিকদের এই দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসেন ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ উইলিয়ম পিট বা লর্ড চ্যাথাম (William Ptti) এবং বাগ্মিশ্রেষ্ঠ এডমাণ্ড বার্ক। কিন্তু ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ এবং তাঁর মন্ত্রীরা ঔপনিবেশিকদের প্রতিবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি ; তার ফলে প্রতিবাদ শীঘ্রই আন্দোলনের আকার ধারণ করে ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের চেষ্টা হয়।

ঔপনিবেশিকদের বিরোধিতা

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নতুন 'হুইগ' প্রধানমন্ত্রী রকিংহাম (Rockingham) 'স্ট্যাম্প' আইন প্রত্যাহার করে নেন, কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আইনের (Declaratory Act) দ্বারা ঘোষণা করে যে ঔপনিবেশিকদের মতামত গ্রহণ না করেও তাদের উপর কর স্থাপনের অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। এই নীতি অনুযায়ী পরের বৎসরই রাজস্বমন্ত্রী চার্লস টাউনসেণ্ড

পরোক্ষ কর বৃদ্ধির চেষ্টা

আমেরিকায় আমদানি করা কাঁচ, সীসা, চা ও কাগজের উপর নতুন শুল্ক আরোপ করেন। বলা হয়, এইভাবে যে অর্থ আদায় হবে, উপনিবেশগুলির প্রশাসনিক ব্যয়ভার তা থেকেই মেটানো হবে। কিন্তু এর ফলে ঔপনিবেশিকদের অসন্তোষ আরো বেড়ে গেল। বহু মার্কিন বণিক এইসব পণ্যের আমদানি কমিয়ে দেয়, আবার অনেক স্থলে সরকারী কর্মচারীরা শুল্ক আদায় করতে গিয়ে বাধা পায়।

সংঘর্ষের সূত্রপাত

আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ম্যাসাচুসেট্স্ প্রদেশের বোস্টন শহরে সৈন্য মোতায়েন করলে ঐ সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন বোস্টনবাসী নিহত হল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এই বোস্টন হত্যাকাণ্ড (Boston Massacre) আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

এই সঙ্কটকালে ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ লর্ড নর্থকে (Lord North) তাঁর নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করলেন। নর্থ অন্য সব পণ্যের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করলেও চা-এর উপর সামান্য কিছু শুল্ক (প্রতি পাউণ্ডে তিন পেন্স হারে) রেখে দিলেন, সম্ভবতঃ শুল্ক স্থাপনের ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধিকার নীতিগতভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে। এই শুল্ক থাকা সত্ত্বেও চা-এর মূল্যবৃদ্ধি যাতে না হয় তার জন্য ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষ হতে আমেরিকায় সরাসরি চা আমদানি করবার অধিকার দেয়। পথিমধ্যে কোন ব্রিটিশ বন্দরে শুল্ক দিতে না হওয়ায় এই ভারতীয় চা-এর মূল্য আগেকার আমদানি করা চায়ের তুলনায় কিছু কমই হল।

বোস্টন টি পার্টি

কিন্তু বাণিজ্যক্ষেত্রে সুবিধা পেলেও ঔপনিবেশিকরা তাদের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর স্থাপনের অধিকার নীতিগতভাবে মানতে পারল না। নানা ঘটনায় উভয় পক্ষের সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি চা-বোঝাই জাহাজ 'ডার্টমাউথ' (Dartmouth) বোস্টন বন্দরে পৌছালে রাত্রের অন্ধকারে কয়েকজন ঔপনিবেশিক 'রেড ইণ্ডিয়ানের' ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে ৩৪২টি চায়ের পেটি সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। 'বোস্টন টি পার্টি' (Boston Tea Party) নামে পরিচিত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে অগ্রসর হল।

উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চারটি 'অসহনীয় আইন' প্রণয়ন করে বোস্টন বন্দরে বাণিজ্য বন্ধ করে দিল, ম্যাসাচুসেট্স্ প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হরণ করল, স্থানে স্থানে ঔপনিবেশিকদের গৃহে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করল এবং পিউরিটান ধর্মাবলম্বী ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ক্যাথলিকদের স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার দিল।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জর্জিয়া বাদে আমেরিকার বারোটি ব্রিটিশ

উপনিবেশের ছাপ্পান্ন জন প্রতিনিধি ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) শহরে একটি অধিবেশনে (First Continental Congress) মিলিত হয়। উপনিবেশগুলির ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে সংযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করার কথা তারা তখনো চিন্তা করেনি।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন

বহু আলাপ-আলোচনার পর রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ সঙ্গে ঔপনিবেশিকেরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের প্রস্তাবও গ্রহণ করে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পিট (বড়) ও বার্কের মতো নেতারাও ঔপনিবেশিকদের দাবী সমর্থন করেন, কিন্তু তৃতীয় জর্জ ও তাঁর প্রধান মন্ত্রী নর্থ কোনো আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন না। আমেরিকাতেও আপোষ-বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছিল।



জর্জ ওয়াশিংটন

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লেক্সিংটন (Lexington) ও কনকর্ড (Concord) নামে দুটি স্থানে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যদের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। এর পর ফিলাডেলফিয়া শহরে সব ক'টি ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিনিধিদের আবার এক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে (মে, ১৭৭৫) ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ম্যাসাচুসেট্সের নেতা জন অ্যাডামসের (John Adams) প্রস্তাব অনুসারে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার জর্জ ওয়াশিংটনের (George Washington) উপর অর্পণ করা হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশগুলিকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে এবং উভয় পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়।

ওয়াশিংটনের অধিনায়কত্ব

ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের প্রত্যুত্তরে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই উত্তর আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) ও অপর কয়েকজন নেতার রচিত **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে** (Declaration of Independence) বলা হয়: (১) প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে কতকগুলি মৌলিক ও অপরিহার্য অধিকার লাভ করে; এগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা-রক্ষা এবং সুখান্বেষণের অধিকার। (২) এই

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (৪ জুলাই, ১৭৭৬)

অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার জন্যই সরকার গঠন করা হয়। (৩) যে সরকার এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করবে তাকে পরিবর্তিত বা ক্ষমতাচ্যুত করবার অধিকার প্রজা-সাধারণের আছে। (৪) নাগরিকমাত্রের সমান অধিকার। (৫) শাসিতের সম্মতির ভিত্তিতেই প্রশাসন পরিচালিত হওয়া উচিত। ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের চিন্তাধারা হতে গৃহীত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির মূল কথাগুলি এই ভাবে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বিবৃত হয়েছে। পরবর্তী যুগে ফরাসী বিপ্লব এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো নানা বৈপ্লবিক আন্দোলন এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছে,—এটাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ১৭৭৫ থেকে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর কাল আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ চলে। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্কার হিলের (Bunker Hill) যুদ্ধে ঔপনিবেশিকেরা পরাজিত হয়, এবং পর বৎসর ইংরাজ সেনাপতি স্যার উইলিয়ম হো (William Howe) নিউ ইয়র্ক অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরাজ সেনাপতি বার্গোয়েন (Burgoyne) সসৈন্যে ঔপনিবেশিকদের কাছে স্যারাটোগা (Saratoga) নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করলে এই যুদ্ধের গতি ঘুরে যায়। অল্পকাল পরেই ফরাসীরা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যোগ দেয় (১৭৭৮ খ্রীঃ), এবং স্পেন ও হল্যাণ্ড ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য ইংলণ্ড আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের নিরপেক্ষ দেশগুলির বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে। তার ফলে উত্তর ইউরোপে রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি কয়েকটি দেশ নিজেদের বাণিজ্যিক অধিকার রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। 'উত্তরের সশস্ত্র নিরপেক্ষ শক্তিসংঘ' (Armed Neutrality of the North) নামে এই জোটটি পরিচিত হয়। দীর্ঘকাল একাধিক প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ইংলণ্ড ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কর্নওয়ালিস (Lord Cornwallis—পরবর্তী কালে ভারতের গভর্নর-জেনারেল) পরাজিত হয়ে ইয়র্কটাউনে (Yorktown) আত্মসমর্পণ করলে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সফল সমাপ্তি হয়।

স্যারাটোগার যুদ্ধ (১৭৭৭)

কর্নওয়ালিসের আত্মসমর্পণ

প্যারিস ও ভার্সাই-এর সন্ধি (১৭৮৩) ঃ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ড তেরোটি বিদ্রোহী উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে ও স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়। অল্পকাল পরে ভার্সাই-এর (Versailles) সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স ও স্পেনের

সঙ্গে ইংলণ্ডের শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে টোবাগো (Tobago), আফ্রিকায় সেনেগাল (Senegal) ও ভারতে তার হস্তচ্যুত উপনিবেশগুলি লাভ করে ; স্পেন লাভ করে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত মিনর্কা দ্বীপ (Minorca) এবং উত্তর আমেরিকায় ফ্লোরিডা অঞ্চল (Florida)। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত অসম্মানজনক শর্তে ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সফল অবসানের পর কয়েক সহস্র মার্কিন ঔপনিবেশিক, যারা ব্রিটিশ সরকারের অনুগত ছিল, দেশত্যাগ করে ব্রিটিশ উপনিবেশ ক্যানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়, এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হন।

সন্ধির শর্ত

উপনিবেশগুলির জয়লাভের কারণ ঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, এই যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার ও সেনাপতিরা সর্বত্র বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়নি। জলপথে তাদের প্রাধান্য সব সময়ে অক্ষুণ্ণ থাকলেও এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রসজ্জা ঔপনিবেশিকদের তুলনায় উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের শৈথিল্যের কারণে কখনো ওয়াশিংটনের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করতে, অথবা মার্কিন ভূখণ্ডের কোনো বৃহৎ অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। স্যারাটোগায় সেনাপতি বার্গোয়েনের আত্মসমর্পণ তাদের সামরিক অবিবেচনারই ফল। ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যেও যুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়নি। কোনো কোনো ব্রিটিশ উদারনৈতিক নেতা রাজা তৃতীয় জর্জকে অপদস্থ করার জন্য এই যুদ্ধে আমেরিকার সাফল্যই মনে মনে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ঔপনিবেশিকদের সামরিক অভিজ্ঞতা, খাদ্য, পোশাক ও যুদ্ধোপকরণের অভাব থাকলেও স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অদম্য উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। এছাড়া প্রধান সেনাপতি ওয়াশিংটনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সততা, সাহস ও দৃঢ় সংকল্প তাদের সাফল্য লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, এই যুদ্ধে ইংলণ্ডকে একাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে এবং বহু-বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তি এই যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের পক্ষ নিয়ে ইংলণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের মিনর্কা দ্বীপ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত

ব্রিটিশ দুর্বলতা

ঔপনিবেশিকদের দৃঢ়তা ও উপযুক্ত নেতৃত্ব

ইংরাজদের নানা দিক হতে বিপদ

করে। ভারতবর্ষে ফরাসীদের ষড়যন্ত্র ও মহীশূর-রাজ হায়দর আলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংরেজদের দুর্বল করে ফেলে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও ব্রিটিশ অধিকার বিপন্ন হয়। নানা দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় ইংরাজরা ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সর্ব শক্তি নিয়োগ করতে পারেনি। তা ছাড়া ফরাসী অস্ত্র-সরবরাহও ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধে জয়ী হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঃ আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব শুধু প্যারিস ও ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। প্রথমতঃ, এই যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড তার উত্তর আমেরিকাস্থিত তেরোটি উপনিবেশই হারায়, এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি নিয়ে গঠিত একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম পাড়ে গড়ে ওঠে। এই স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের দুই প্রধান শক্তির অন্যতম, আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হিসাবে তার পরিচয় ছিল, সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ হতবল।

নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব

দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের পুরাতন 'মার্কেন্টাইল' অর্থনীতির ব্যর্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। উপনিবেশগুলির সঙ্গে ইংলণ্ড যে পরিমাণ ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাত, স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনোরকম কৃত্রিম বিধি-নিষেধ আরোপ না করেও তার চেয়ে বেশি বাণিজ্য করার সুযোগ সে শীঘ্রই লাভ করে।

পুরাতন অর্থনীতির ব্যর্থতা

তৃতীয়তঃ, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং পার্লামেন্টের উপর রাজা তৃতীয় জর্জের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা কার্যতঃ ব্যাহত হয়। রাজার ব্যক্তিগত শাসনের পরিবর্তে পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার শাসন (Cabinet Government) ইংলণ্ডে আবার দৃঢ়মূল হয়। এইভাবে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ইংলণ্ডে সীমিত রাজতন্ত্র ও জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে সাহায্য করে।

ইংলণ্ডে পার্লামেন্টারি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

চতুর্থতঃ, এই যুদ্ধে যোগদান করে ফ্রান্স তার সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা দূর করে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ফরাসী সরকার ঋণগ্রস্ত হয়। এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করার জন্য রাজা ষোড়শ লুই দীর্ঘকাল পরে প্রতিনিধি-সভা (States-General)

ফ্রান্সে নতুন বিপ্লবের সূচনা

আহ্বান করতে বাধ্য হন, এবং ঐ ঘটনা হতেই ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) স্থচনা হয়। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যে সব ফরাসী সৈনিক যোগ দিয়েছিল তারাও আমেরিকা থেকে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে ফেরে এবং ফরাসী বিপ্লবের ইন্ধন জোগায়।

সবশেষে, আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আদর্শকে জনপ্রিয় করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। জনগণের সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হবে, এই বৈপ্লবিক নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যই ঔপনিবেশিকেরা অস্ত্র ধারণ করেছিল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' স্বাধীনতা, সাম্য ও জনগণের অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা এই বিপ্লবী ঘোষণারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ঔপনিবেশিকদের এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্রিটিশ লেখকদের রচনায় রাজতন্ত্র-বিরোধী যে সব বক্তব্য শোনা গিয়েছিল সেগুলি তৎকালীন বিশ্বের যে কোনো রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য ছিল। মোটের উপর, একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে আমেরিকার স্বাধীনতালাভ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড আঘাতের মতো নেমে এসেছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব যে মার্কিন আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গণতান্ত্রিক আদর্শের জয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন
(French Revolution and Napoleon)

ঐতিহাসিক ফিশারের (H. L. A. Fisher) মতে ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের ইতিহাসে 'উদারনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে'র (age of liberal experiment) সূচনা করেছিল। ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তাজগতের ইতিহাসে এই বিপ্লবের গুরুত্ব অসাধারণ। পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা ফরাসী বিপ্লব থেকে তাদের অনুপ্রেরণা লাভ করে। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের বাণী ফ্রান্স থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসী বিপ্লবের কারণঃ (ক) ফরাসী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাঃ ফরাসী বিপ্লবের কারণ সে যুগের ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ফ্রান্সে এ যুগে **বংশানুক্রমিক স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত ছিল। **বুঁর্বো** (Bourbon) বংশের রাজা **ষোড়শ লুই** (Louis XVI) (১৭৭৪-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) বিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত অপ্রতিহত শক্তিতে রাজত্ব করতেন। এ যুগের ফরাসী **সরকার ছিল অতি-মাত্রায় কেন্দ্রীভূত**।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ভার্সাই-এ (Versailles) রাজার মন্ত্রণাসভাই (King's Council) দেশের সমস্ত নীতি নির্ধারণ করত। সামান্য প্রশাসনিক ব্যাপারেও এই নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করা চলত না। রাজশক্তি যে প্রজাপীড়ক ছিল, তা ঠিক নয়। প্রজার কল্যাণই তার কাম্য ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে সে দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে তা অপারগ ছিল। **রাজশক্তির এই অক্ষমতা** বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।



ষোড়শ লুই

ফ্রান্সের **অর্থনৈতিক অবস্থা** অষ্টাদশ শতকে ক্রমশঃই মন্দের দিকে যাচ্ছিল। ফ্রান্সকে দীর্ঘকাল ইংলণ্ড ও অন্যান্য প্রতিযোগীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হওয়ায় **জাতীয় ঋণের বোঝা** দিন দিন বেড়ে চলেছিল। **রাজসভার এবং সরকারের ব্যয়-বাহুল্য** হ্রাস করার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করা হয়নি। **কর আদায়ের ব্যবস্থাও** ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার একদল মধ্যবর্তী লোকের (tax-farmers) শরণাপন্ন হয়েছিল যারা সরকারের কাছে রাজস্ব বাবদ যা জমা দিত, প্রজাদের কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি আদায় করত। এইভাবে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে জনসাধারণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে শুল্কের মাত্রারও তারতম্য ছিল। ফরাসী দেশের জাতীয় সীমান্তে যেমন বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করা হত, তেমনি আবার প্রাদেশিক সীমান্তগুলিতেও শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। নানাস্থানে শুল্ক দেবার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেত। জনসাধারণের দুর্দশার এও ছিল একটি কারণ।

সরকারের আর্থিক দুরবস্থা

ইংলণ্ডের মতো ফ্রান্সে কোনো **জাতীয় পার্লামেণ্ট ছিল না**। প্যারিস ও অন্য কয়েকটি ফরাসী শহরে পার্লামেণ্ট (Parliament) নামে কতকগুলি বিচারালয় ছিল যেগুলিতে রাজকীয় আদেশগুলি (royal edicts) যথাযথভাবে নথিবদ্ধ (registered) করা হত। আইনের চোখে, পার্লামেণ্টগুলি রাজার যে কোনো নির্দেশ নথিবদ্ধ করতে বাধ্য ছিল না, এবং তা না করলে ঐ আদেশ বলবৎ করা যেত না। কিন্তু, কার্যতঃ, কোন শক্তিশালী রাজাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা এ যুগে ঐ বিচারালয়গুলির ছিল না। **স্টেট্স-জেনারেল** (States-General) নামে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুকল্প যে প্রতিষ্ঠানটি ফ্রান্সে এক সময় বর্তমান ছিল, ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর তার কোনো অধিবেশন আহ্বান করা হয়নি। সুতরাং রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রতিষ্ঠান বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে ছিল না।

জাতীয় পার্লামেণ্টের অভাব

সামাজিক অবস্থা বিচারে দেখা যায়, যে ফ্রান্সে এই যুগে **তিনটি প্রধান শ্রেণী** (Three Estates) ছিল। প্রথম শ্রেণীর (First Estate) লোক ছিলেন **যাজকেরা** (Clergy)। ফ্রান্সের শতকরা ৯০ জন বা ততোধিক লোক রোম্যান ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং ক্যাথলিক 'চার্চ' (Church) নানা অর্থনৈতিক সুবিধাও ভোগ করত। এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল 'টাইথ' (Tithe) নামে কর, যা কৃষকদের 'চার্চ' প্রতিষ্ঠানকে দিতে হত। কিন্তু 'চার্চের' মধ্যেও কার্যতঃ শ্রেণীবিভেদ ছিল। **উচ্চ-পদাধিকারী**

সামাজিক শ্রেণীভেদ যাজকশ্রেণী

যাজকেরা (Higher Clergy) অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণীর (Nobility) মধ্য থেকেই আসত এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরনও ছিল অভিজাতদের মতোই। **নিম্ন-পদাধিকারী** যাজকেরা (Lower Clergy) আসত সাধারণ লোকেদের মধ্য থেকে, এবং তাদের আর্থিক অবস্থাও ছিল অনুন্নত। এই দুই শ্রেণীর যাজকদের অবস্থার মধ্যে প্রচুর বৈষম্য থাকায় তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সদ্ভাবও ছিল না। কৃষক সম্প্রদায়ের উপর চার্চের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও শিক্ষিত সমাজের উপর এই প্রভাব ক্রমশঃই কমে আসছিল, সন্দেহ নেই।

ফরাসী সমাজের **দ্বিতীয় শ্রেণী** (Second Estate) ছিল সামন্ত বা **অভিজাতগণ** (Nobility)। ইংলণ্ডের চেয়েও ফ্রান্সে অধিক সংখ্যায় সামন্ত বাস করত। এরা সকলেই যে বিরাট ভূম্যধিকারী ছিল তা নয়, কিন্তু সকলেই ছিল **বিশেষ সুবিধাভোগী** (Privileged class)। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়া এদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল না, অধিকাংশ কর দেওয়ার দায়িত্ব থেকেও এরা ছিল মুক্ত। কিন্তু এদের নানা বিশেষ অধিকার ছিল। শিকার করা, মাছ ধরা, পথে ও বাজারে তোলা (Toll) আদায় করা, অধীনস্থ কৃষকদের অপরাধের বিচার করা প্রভৃতি ব্যাপারে এদের বিশেষ অধিকার ছিল। এছাড়া অধীনস্থ প্রজাদের এদের কলে শস্য ভাঙ্গাতে ও ক্ষেতের আঙ্গুর থেকে মদ তৈরী করতে, এদের কসাইখানায় আপন পশু বধ করতে, এবং এদের চুল্লীতে রুটি বানাতে আসতে হত, এবং প্রতিটি কাজের জন্য তাদের কিছু দক্ষিণাও দিতে হত। ফরাসী সামন্তেরা সাধারণতঃ উদ্ধত ও কর্তৃত্বপ্রয়াসী ছিল, কিন্তু নিজেদের সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে তারা অনেকেই তদারক করত না, বা প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর রাখত না। 'বেলিফ' (Bailiff) প্রমুখ কর্মচারীদের উপর জমিদারি দেখাশোনার ভার দিয়ে তারা নিজেরা ভার্সাই-এর রাজসভায় আমোদ-প্রমোদে ও বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাত। ফলে অধীনস্থ কৃষকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল মূলতঃ শোষক ও শোষিতের, কৃষকেরা তাদের অন্তর থেকে ঘৃণা করত।

অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার

যাজক ও সামন্ত ভিন্ন ফরাসী সমাজের অন্য সব লোক মিলে গঠিত হয়েছিল **তৃতীয় শ্রেণী** (Third Estate)। এরা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হলেও আইনের দৃষ্টিতে এদের অধিকার ছিল সবচেয়ে কম। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে প্রবল ছিল **মধ্যবিত্তেরা**। বিভিন্ন বৃত্তি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে এরা পর্যাপ্ত বিত্তের অধিকারী হয়েছিল, শিক্ষা-দীক্ষায়ও এরা কারো থেকে পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু নানারকম বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল, এবং

প্রশাসন বিভাগ, সৈন্যবাহিনী বা 'চার্চে'র সমস্ত বড় পদগুলি তাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। একমাত্র সামন্ত শ্রেণীর লোকেরাই এই বড় পদগুলি পাবার অধিকারী ছিল। নাগরিক অধিকার (Civil Rights) বলতে সে যুগে ফ্রান্সে কিছুই ছিল না, আর রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল সামন্ত শ্রেণীর কুক্ষিগত। সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা মধ্যবিত্তদের ঘৃণা করত, এবং 'চার্চের' মধ্যেও এই দুই শ্রেণীর লোকের পার্থক্য সযত্নে বজায় রাখা হত। মধ্যবিত্তেরা স্বভাবতঃই তাদের এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাইছিল, এবং তারাই ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বিপ্লব প্রধানতঃ তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং তাদেরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল বলা চলে।

সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী ছিল **কৃষকেরা**। ফরাসী কৃষকেরা দেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাও ভূমিদাস পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু তাদের অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটত। এর প্রধান কারণ ছিল ফ্রান্সের অনুন্নত কৃষি-ব্যবস্থা এবং কৃষকদের উপর করের গুরুভার। জাতীয় করভারের শতকরা ৯০ ভাগ বা ততোধিক কৃষকদের উপর ন্যস্ত ছিল। সরকার, জমিদার এবং 'চার্চ', তিনজনকেই তাদের কর দিতে হত। সরকারকে দেয় করগুলির মধ্যে 'টেইল' (Taille) ও 'গ্যাবেল' (লবণ-কর) (Gabelle) ছিল প্রধান, জমিদারদের নানারকম প্রাপ্য ছিল, আর 'চার্চকে' দিতে হত 'টাইথ' (Tithe)। এছাড়া কৃষকদের অনেক সময় বেগার খাটতে হত (Corvée)। সরকারী কর আদায়কারীরাও তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য রাজস্বের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত। কৃষকেরা স্বভাবতঃই খুব বিক্ষুব্ধ ছিল, এবং এই বিরাট করভার থেকে মুক্তি ও জমির মালিকানা লাভ করতে চাইছিল। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ফরাসী বিপ্লবে যোগ দেয়।

কৃষক শ্রেণীর দুরবস্থা

ফ্রান্সের শহরাঞ্চলে এই সময় কিছু দরিদ্র **কারিগর, দোকানদার ও শ্রমজীবী** সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর এই অংশ কৃষকদের চেয়েও দরিদ্র ছিল এবং অনেক সময় এদের দু'বেলা ভালো মতো আহারও মিলত না। কিন্তু এরা বস্তি অঞ্চলে একত্র দল বেঁধে থাকত বলে সহজেই এদের সঙ্ঘবদ্ধ করা যেত। ফরাসী বিপ্লবে এরাও যোগ দিয়েছিল নিজেদের দারিদ্র্য মোচনের আশায়, কিন্তু বিপ্লবের ফলে এরা বিশেষ লাভবান হয়নি। প্যারিসের পূর্বাঞ্চলে বিরাট বস্তি এলাকায় বিপ্লবের সময় গোলযোগ লেগে থাকত।

কারিগর ও শ্রমজীবীদের ভূমিকা

মোটের উপর এ কথা বলা চলে যে ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও কারিগর-

শ্রমজীবী সম্প্রদায় ছিল বিপ্লব বা আমূল সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে, আর অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণী, 'চার্চ', বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ যাজক শ্রেণী, এবং ফরাসী সরকার বা দেশের রাজশক্তি ছিল বিপ্লব-বিরোধী বা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক। ফরাসী বিপ্লব ছিল মূলতঃ এই দুই দলের সংঘর্ষ, এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম দলই অধিক শক্তিশালী হওয়ায় বিপ্লব সাফল্য লাভ করে।

(খ) **ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা :** অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে **একদল দার্শনিকের আবির্ভাব** হয়েছিল, যাঁদের চিন্তাধারা বিপ্লব-কামী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই দার্শনিকদের মধ্যে মণ্টেস্কু, ডিডেরো, ভলটেয়ার ও রুশোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **মণ্টেস্কুই** (Montesquieu) ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম। তিনি বেশ কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে কাটিয়ে এসে দেশবাসীর কাছে ব্রিটিশ সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে থাকেন। তাঁর মতে এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ প্রশাসন, আইন-প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ বা ক্ষমতা-বিভাজন নীতি (Separation of Powers)। তাঁর মতে ফ্রান্সেও এই ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্তন করা উচিত ছিল। মণ্টেস্কু তাঁর 'স্পিরিট অব লজ' (Spirit of Laws) নামে বইতে ফ্রান্সে চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রভৃতি নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অনুকূলেও যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এই অধিকারগুলি সবই ইংলণ্ডে ইতিপূর্বে (গৌরবময় বিপ্লবের পর) স্বীকৃত হয়েছিল।

মণ্টেস্কু

ডিডেরো একজন জড়বাদী দার্শনিক, অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন। আরো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' (Encyclopaedia) বা বিশ্বকোষ রচনার কাজে হাত দেন। সে যুগের পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার এই বিশ্বকোষে স্থান পাবে, এই ছিল তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য। এই বিশ্বকোষে রাজনীতি বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছিল সেগুলিতে তৎকালীন ফরাসী সরকার ও শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

ডিডেরো

আর এক ফরাসী দার্শনিক **ভলটেয়ার** (১৬৯৭—১৭৭৮) ছিলেন তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপাত্মক রচনায় (Satire) সিদ্ধহস্ত। কবিতায়, প্রবন্ধে এবং আরো নানা ধরনের রচনায় তিনি তৎকালীন ফ্রান্সের নানা প্রচলিত ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করেন। 'চার্চকে'ই তিনি মানব-সমাজের প্রগতির সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার-গুলিও তাঁর কাছে অযৌক্তিক বা হাস্যকর বলে মনে হত। তিনি সব সময় তাঁর

ভলটেয়ার

অনুগামীদের বলতেন যুক্তি দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা বা বিধানকে যাচাই করে দেখতে, শুধু সেগুলি ঐতিহ্যসম্মত বা চিরাচরিত কি না এইটুকু দেখাই যথেষ্ট নয়। মণ্টেস্কুর মতো ভলটেয়ারও ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তবে জনসাধারণের ক্ষমতায় তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। তাঁর বাঞ্ছিত সংস্কারগুলি বলবৎ করবার জন্য তিনি রাজশক্তির সাহায্যেরই প্রত্যাশী ছিলেন। সুতরাং, প্রকৃত অর্থে তাঁকে গণতন্ত্রের পূজারী বলা যায় না।



ভলটেয়ার

এ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন অবশ্য **রুশো** (১৭১২-১৭৭৮ খ্রীঃ)। রুশো বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত সভ্য মানবসমাজ একটি **সামাজিক চুক্তির** (Social Contract) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুদূর অতীতে মানুষ এক সময় প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) বাস করত, যেখানে রাষ্ট্র বা আইনের শাসন ছিল না। কালক্রমে তারা তাদের জীবন ও সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি সরকারের অধীনে বসবাস করতে সম্মত হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত চুক্তিটি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এতে সমাজের কতকগুলি শ্রেণী বিশেষ অধিকার পেয়েছে। সুতরাং এই চুক্তিকে বাতিল করে, প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে গিয়ে মানুষকে আবার নতুন করে সন্তোষজনক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে, যাতে সামাজিক অবিচার ও শোষণের সমাপ্তি ঘটে। রুশোর এই চিন্তাধারা খুবই বৈপ্লবিক ছিল, কারণ ফরাসী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই ছিল এর লক্ষ্য।

রুশো : সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব

সামাজিক চুক্তির মতবাদ অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ দার্শনিক লকই প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন, কিন্তু একে তাঁর লেখনীর দ্বারা সারা ইউরোপে জনপ্রিয় করে তোলেন রুশো। সমাজ এবং রাষ্ট্রকে তাঁরা দুজনেই মানুষের সুবিধার জন্য সৃষ্ট বস্তু বলে মনে করতেন ; সাধারণের ইচ্ছাই (General Will) এ দুটি ব্যবস্থার ভিত্তি। জনসাধারণের ইচ্ছা হলে তারা যে কোন সময় প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন করতে পারে, এই ছিল তাঁদের বক্তব্য। সাধারণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র অবশ্যই গণতন্ত্র (Democracy) হবে। রুশো নিজে অবশ্য মনে করতেন যে আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র সুইজার্ল্যাণ্ডের মতো ছোট রাষ্ট্রে, কিন্তু রুশোর মৃত্যুর পনেরো বৎসরের মধ্যেই ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

উপরে যেসব দার্শনিকদের নাম করা হল তাঁরা ছাড়াও আরো কয়েকজন দার্শনিক অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিলেন। এদের মধ্যে ডালেম-বার্ট (D'Alembert) ছিলেন ডিডেরোর বন্ধু ও সহযোগী, হেলভেশিয়াস্ (Helvetius) ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও উন্নততর শিক্ষার দ্বারা আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তোলার পক্ষপাতী, এবং ম্যাবলি (Mably) ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) প্রবক্তা। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে এ যুগের দার্শনিকেরা মূলতঃ মধ্যবিত্ত সমাজের লোক ছিলেন এবং ঐ সমাজের অভাব-অভিযোগ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলনই তাঁদের রচনায় দেখা গিয়েছিল। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র, ক্ষমতা-বিভাজন, নাগরিক অধিকার, অভিজাত শ্রেণী ও 'চার্চের' ক্ষমতা নাশ —মধ্যবিত্ত সমাজের এইসব দাবীই তাঁদের লেখনীর মুখে ব্যক্ত হয়েছিল। একমাত্র ম্যাবলি ছাড়া শোষিত জনগণের কথা আর কেউ বিশেষ বলেননি। তবে দার্শনিকদের চিন্তার চেয়েও পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারাই মধ্যবিত্ত সমাজ বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, দার্শনিকদের চিন্তাধারা নয়।

দার্শনিকদের ভূমিকা

(গ) **বৈদেশিক দৃষ্টান্ত : দুটি বৈদেশিক ঘটনাও** ফরাসী বিপ্লবকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। প্রথমটি আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দ্বিতীয়টি আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু ফরাসী নাগরিক স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল। এই সংগ্রামের অবসানে তারা যখন দেশে ফিরে আসে, বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা তারা রীতিমত অনুপ্রাণিত হয়েছিল, এবং নিজেদের দেশেও ঐ আদর্শকে রূপায়িত করতে চেয়েছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের নাগরিকেরা আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের চেয়েও কঠোর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ১৭৭৯ থেকে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। তাদের এই দৃষ্টান্তও ফরাসীদের প্রভাবিত করে।

আমেরিকা ও আয়ার্ল্যাণ্ড

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস :

স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বান : ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফরাসী সরকারের আর্থিক অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। পর পর কয়েক বৎসর অজন্মার ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। করভার বৃদ্ধি করে

আহ্বানের কারণ

বা সরকারের ঋণের বোঝা আরো বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে মনে হয়নি। ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। একমাত্র সমাধান ছিল অভিজাত বা সামন্তদের নিজেদের বিশেষ অধিকার ত্যাগ করে সরকারকে কর দিতে সম্মত করানো। কিন্তু সামন্তেরা এই জাতীয় দুর্যোগের দিনেও তাদের বিশেষ অধিকার ত্যাগ করতে রাজী হয়নি। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে নতুন কর ধার্য করবার উপায় অনুসন্ধানের জন্য ফরাসী-রাজ ষোড়শ লুই প্রায় ১৭৫ বৎসর পরে ফ্রান্সের লুপ্তপ্রায় জাতীয় সভা **স্টেট্স্-জেনারেলের অধিবেশন** আহ্বান করলেন (মে, ১৭৮৯)।

স্টেট্স্-জেনারেলের সভায় ফ্রান্সের তিনটি প্রধান শ্রেণীর (Estates), অর্থাৎ যাজক, সামন্ত ও অন্যান্য লোকেদের, প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্রভাবে তিনটি কক্ষে মিলিত হত, এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর সমান ভোটাধিকার ছিল। সুতরাং যাজক ও সামন্তদের প্রতিনিধিরা কোন বিষয়ে একমত হলে তৃতীয় শ্রেণীর বা সাধারণ লোকেদের প্রতিনিধিদের সেই সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা চলত না। তাই একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে স্টেট্স্-জেনারেলের অধিবেশনের ফলে ফ্রান্সে বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু, কিছুটা দেশের পরিস্থিতির জন্য এবং কিছুটা সরকারের নিবু দ্ধিতার জন্য স্টেট্স্-জেনারেলের অধিবেশনই ফ্রান্সে বিপ্লব ডেকে আনল। সরকারের পক্ষ থেকে যদি এই জাতীয় সভার সামনে বাঞ্ছিত সংস্কারগুলি কার্যকরী করবার জন্য এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হত, তাহলে ঐ সভা সে প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা করত এবং সেগুলি গ্রহণ বা সংশোধন করতে অগ্রসর হত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রস্তুতির একান্ত অভাব ছিল। ফলে, প্রথম দুই মাস স্টেট্স্-জেনারেল শুধু তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিরা একত্র মিলিত হবে, না স্বতন্ত্র মিলিত হবে, এই আলোচনাতেই কালক্ষয় করল। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর দৃঢ়তার কাছে অন্য দুই শ্রেণী নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল, এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষদিকে স্টেট্স্-জেনারেল তিনটি স্বতন্ত্র কক্ষের পরিবর্তে একটি সম্মিলিত সভার রূপ ধারণ করল। এই সভার নতুন নাম হ'ল **জাতীয় পরিষৎ** (National Assembly)। বিপ্লবের পথে এইটিই হল **প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ**।

সরকারের প্রস্তুতির অভাব

জাতীয় পরিষৎ-এর সৃষ্টি

ইতিমধ্যে প্যারিসের জনসাধারণ ক্রমশঃই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অজন্মার ফলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশের উপর পড়েছিল। রাজধানীতে নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে বুভুক্ষু জনতার ভিড় বাড়ছিল। জনসাধারণ আশা করেছিল যে জাতীয় পরিষৎ তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু সভার

সদস্যদের নিষ্ফল বাদ-বিতণ্ডা তাদের সে আশা ধূলিসাৎ করে দিল। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই অকর্মণ্য, উৎপীড়ক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অগ্রসর হল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের **১৪ই জুলাই** প্যারিসের অশান্ত জনতা শহরের মধ্যস্থিত বিশাল কারাদুর্গ **ব্যাস্টিল** (Bastille) **আক্রমণ** করে কারারক্ষীদের পর্যুদস্ত করল, এবং কারাগার জয় করে নিল। যদিও ঐ কারাগারে সে সময় অল্পসংখ্যক বন্দীই আটক ছিল, তবু ব্যাস্টিল অধিকারের ঘটনা ফ্রান্সে পুরানো রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার (Ancient Regime) ধ্বংসের প্রতীক হিসাবেই গৃহীত হয়েছিল, এবং আজ পর্যন্ত ১৪ই জুলাই তারিখটি ফরাসী বিপ্লবের বার্ষিকী হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এর পর প্যারিসের মধ্যবিত্তেরা অশান্ত জনতার রোষ থেকে নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে। **'ন্যাশনাল গার্ড'** (National Guard) নামে পরিচিত এই নাগরিক সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বিখ্যাত ফরাসী নেতা **লাফায়েৎ** (Lafayette)।

ব্যাস্টিল অধিকার (১৪ই জুলাই)

জাতীয় পরিষৎ-এর কাজ : প্যারিসের উপকণ্ঠে ভার্সাই নগরীতে জাতীয় পরিষৎ-এর অধিবেশন চলছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট জাতীয় পরিষৎ এক স্মরণীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা ফ্রান্সে ভূমিদাস প্রথার (Serfdom) শেষ চিহ্ন এবং **সামন্ত শ্রেণীর সমস্ত বিশেষ অধিকার লোপ** করা হয়। এর জন্য কোন সামন্তকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু দেওয়া হয়নি। অবশ্য ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে এক **স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক-আন্দোলন** (Jacquerie) দেখা দিয়েছিল। কৃষকেরা সামন্তদের প্রাসাদ আক্রমণ করে জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে অগ্নি-সংযোগ ও জমিদারদের কর্মচারীদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেছিল। জাতীয় পরিষৎ এই স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক-আন্দোলনের ফলকেই পরোক্ষে স্বীকার করে নেয়। 'চার্চ'-ও এই সময় তার 'টাইথ' আদায়ের অধিকার হারায়।

সামন্ত প্রথার অবসান

এই ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে জাতীয় পরিষৎ **'মানুষের অধিকারের ঘোষণা-পত্র'** নামে (Declaration of the Rights of Man) একটি স্মরণীয় সনন্দ-পত্র গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের 'বিল অব রাইট্‌স্' (Bill of Rights) (১৬৮৯) এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের (১৭৭৬) অনুসরণে এই ঘোষণাপত্রে বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি সার্বজনীন নাগরিক অধিকার ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার মতো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকেও এই ঘোষণাপত্রে পবিত্র অধিকার বলে বর্ণনা করা হয়। ঐ সঙ্গে গণতন্ত্রের মূল নীতি এবং আইনের শাসনের

মানুষের অধিকারের ঘোষণা

প্রতিও আনুগত্য জানানো হয়। কিন্তু জনসাধারণের ক্ষুধা হতে মুক্তি বা জীবিকা উপার্জনের অধিকার সম্বন্ধে একটি কথাও এই সনন্দে ছিল না। ফরাসী বিপ্লব যে মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কীর্তি, এ কথা এই ঘোষণা-পত্রটি অনুধাবন করলে স্পষ্টই বোঝা যায়; কিন্তু পরবর্তীকালে এই ঘোষণা-পত্রের বক্তব্য যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের মৌলিক অধিকারকে এই প্রথম একটি বিশ্বজনীন রূপ দেওয়া হয়।

এদিকে প্যারিসে ক্ষুধার্ত জনতার হাহাকার বেড়ে যেতে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করত যে ভার্সাইয়ে যেখানে রাজা এবং তাঁর পারিষদবর্গ থাকেন, সেখানে কোনো খাদ্যাভাব নেই। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্যারিসের নিম্নশ্রেণীর মহিলারা এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে ভার্সাই-এ উপস্থিত হয়, এবং রাজপ্রাসাদে বলপূর্বক প্রবেশ করে রাজা ও রানীকে সঙ্গে নিয়ে আবার প্যারিসে ফিরে আসে (৬ই অক্টোবর)। জাতীয় পরিষৎ-এর অধিবেশনও এর পর প্যারিসে আহ্বান করা হয়, এবং পরবর্তী দুই বৎসর ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা নিয়ে এই সভা ব্যস্ত থাকে। এই কারণে তাকে এই সময় **সংবিধান সভা** (Constituent Assembly) নামেও অভিহিত করা হত।

মহিলাদের শোভাযাত্রা রাজার প্যারিসে আগমন

১৭৮৯ থেকে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের যে নতুন সংবিধান হয় তা পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে অন্যতম। ফ্রান্সে এই সময় **'জ্যাকোবিন ক্লাব'** (Jacobin Club) নামে একটি বিপ্লবী দলের আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী সংবিধানটি ছিল প্রধানতঃ নরমপন্থী (Moderate) নেতৃবৃন্দের রচনা। এঁদের মধ্যে **মিরাবো** (Mirabeau), **ট্যালে রাঁ** (Talleyrand), **লাফায়েৎ** (Lafayette) ও **সিয়ে**'র (Sieyes) নাম বিশেষ স্মরণীয়। এঁরা কেউই ফ্রান্স থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চাননি, চেয়েছিলেন ব্রিটিশ আদর্শে রচিত সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এবং উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা। কিন্তু ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই এঁদের কাউকেই বিশ্বাস করতেন না, এবং এঁদের সঙ্গে সহযোগিতাও করেননি। বাগ্মী মিরাবোকে নিরস্ত করার জন্য তিনি তাঁকে উৎকোচ দানের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয়নি।

নতুন সংবিধান রচনা (১৭৯১)

নতুন ফরাসী সংবিধানে (১৭৯১) রাজার শক্তিকে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ করা হয়। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে, অথবা আর্থিক বিষয়ে রাজার কোনো অধিকারই স্বীকার করা হয়নি। রাজা শুধু তাঁর মন্ত্রীদের ইচ্ছামত নিয়োগ বা বরখাস্ত করতে পারতেন, এবং আইনসভায় গৃহীত

রাজার শক্তি হ্রাস

কোনো আইন তাঁর পছন্দ না হলে ছয় মাস সেই আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারতেন। আইনসভায় একটি মাত্র কক্ষ (Chamber) রাখা হয়, এবং আইন-প্রণয়ন, কর-নির্ধারণ ও প্রশাসনিক ব্যাপারে আইনসভাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। যে কোনো ফরাসী নাগরিক কিন্তু আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারত না, নির্বাচনপ্রার্থী হতে হলে বৎসরে অন্ততঃ একটি রূপার 'মার্ক' রাজস্ব হিসাবে দিতে হোত। এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক নীতি যে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। দেশের বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন আনা হয়। 'পার্লামেণ্ট' নামে স্থানীয় বিচারালয়গুলি তুলে দিয়ে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত বিচারপতিদের সাহায্যে বিচারকার্য চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সারা দেশে একই ধরনের আইন-কানুন ও বিচার-ব্যবস্থা চালু করা হয়, এবং ফৌজদারি মামলায় জুরীর সাহায্যে বিচার-(Trial by Jury) ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেশের পুরানো প্রাদেশিক বিভাগগুলি তুলে দিয়ে সারা দেশকে প্রায় সম-আয়তনের ৮০টি প্রদেশে (Department) বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি প্রদেশকে আবার কতকগুলি জেলায় (Arrondissement), এবং প্রতিটি জেলাকে 'ক্যাণ্টন' (Canton) ও 'কমিউন' (Commune) নামে ক্ষুদ্রতর বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি বিভাগে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রশাসকদের দ্বারা শাসনকার্য চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। কর আদায়, পথ-ঘাট নির্মাণ, জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি

নতুন বিচার-ব্যবস্থা—বিচারক নির্বাচন

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের নতুন সংবিধানের দ্বারা ফ্রান্সে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্তু এই সংবিধান বলবৎ করবার পূর্বেই দেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যার ফলে এই সংবিধানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হয়ে পড়ে। **রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা নাশের** জন্য জাতীয় পরিষৎ কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'চার্চকে' 'টাইথ' নামে কর দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে **'চার্চের' সমস্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়,** এবং এই সম্পত্তি বিক্রয় করে সরকারের আর্থিক ঘাটতি মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়। এর পর ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে **চার্চের জন্য এক নতুন শাসনতন্ত্র** (Civil Constitution for the Clergy) রচনা করা হয়। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ফরাসী 'চার্চের' উপর রোমের পোপের

চার্চের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র (১৭৯১)

সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করা হয়, 'চার্চের' সমস্ত পাদ্রীদের জনগণের দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, এবং সরকার তাদের বেতন দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফরাসী যাজকেরা এর ফলে সরকারী কর্মচারীতে পরিণত হয়, এবং তাদের নতুন শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বলা হয়। যারা তা করতে রাজী হয়নি, তাদের পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু এই পদচ্যুত যাজকদের গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব থেকে যায়. কৃষকেরা অনেক সময় তাদের কাছেই ধর্মীয় কার্যে যেত। পোপও এই শাসনতন্ত্রকে ধর্মদ্রোহিতার নিদর্শন বলে নাকচ করে দেন।

রাজা ষোড়শ লুই নিতান্ত অনিচ্ছায় এই শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর সম্মতি দেন। কিন্তু এর পর তিনি প্যারিস ত্যাগ করে চলে যাবার চেষ্টা করলে জনসাধারণ তাতে বাধা দেয়। নজরবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি সপরিবারে গোপনে প্যারিস ত্যাগ করে অষ্ট্রিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন (২০শে জুন, ১৭৯১); কিন্তু ফরাসী সীমান্তের অদূরে ভ্যারেনেস (Varennes) নামে একটি স্থানে তাঁরা ধরা পড়ে যান, এবং বন্দী অবস্থায় তাঁদের প্যারিসে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। এর পর রাজাকে কিছুদিন কার্যতঃ ক্ষমতাচ্যুত করে রাখা হয়।

রাজার পলায়নের চেষ্টা ও ব্যর্থতা

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত হলে রাজার কাছে তাঁর সম্মতির জন্য ঐ সংবিধান পেশ করা হয়। তিনি নিরুপায় হয়ে এতে তাঁর সম্মতি জানালে জাতীয় পরিষৎ বা সংবিধান সভার কার্যকাল উত্তীর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। সংবিধান সভার শেষ অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে এই সভার কোনো সদস্য নতুন পরিষৎ-এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

বিধানসভার কার্যকলাপ: ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে যে নতুন **বিধানসভার** (Legislative Assembly) নির্বাচন হয় তাতে নরমপন্থী সদস্য কিছু নির্বাচিত হলেও জ্যাকোবিন সোসাইটির বিপ্লব-বাদী সদস্যেরাই সংখ্যাধিক্য লাভ করেন। এদের মধ্যে আবার **জিরণ্ডিন** (Girondin) নামে একটি গোষ্ঠীর বেশ কিছু লোক নির্বাচিত হয়ে আসে। ফ্রান্সের 'জিরণ্ড' নামে প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিল বলে তাদের নাম হয় 'জিরণ্ডিন'। এই বিপ্লবীরা ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী ছিল। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তারা যুদ্ধের সমর্থক ছিল, কারণ তাদের ধারণা ছিল যে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনার ভিতর দিয়েই ফরাসী জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকতে ও বিপ্লবকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্রাটেরা ফ্রান্সে বলপ্রয়োগের দ্বারা শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। বিপ্লবীরাও

জিরণ্ডিন দলের নীতি —যুদ্ধের সমর্থন

চাইছিল, এই যুদ্ধ আসুক ; এই যুদ্ধের ফলেই ফরাসী রাজতন্ত্রের পতন হবে বলে তারা বিশ্বাস করত।

রাজা ষোড়শ লুই-এর সঙ্গে নব-নির্বাচিত বিধানসভার সংঘর্ষ বাধতে বিশেষ বিলম্ব হল না। বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই ভীত ফরাসী সামন্ত বা অভিজাতেরা দেশত্যাগ করে প্রতিবেশী নানা বিদেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। এই সব দেশত্যাগীদের (Emigres) মধ্যে রাজার দুই ভ্রাতাও ছিলেন। দেশত্যাগী সামন্তেরা যে সব রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেখানকার সরকারদের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদের ফ্রান্স আক্রমণ করতে উৎসাহিত করছিল। বিদেশী সাহায্য ছাড়া ফ্রান্সে বিপ্লবকে দমন করা বা রাজশক্তিকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না বলেই তারা জানত। বিধানসভা এই সব দেশত্যাগী সামন্তদের বিরুদ্ধে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে তারা যদি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে, তাহলে দেশদ্রোহী হিসাবে তাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, এবং তাদের সম্পত্তিও সরকার বাজেয়াপ্ত করবে। ফ্রান্সের যে সব যাজক চার্চের নতুন শাসনতন্ত্রের (১৭৯১) প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয়নি, তারাও দেশের নানা স্থানে বিপ্লবীদের বিরোধিতা করছিল। এদের বিরুদ্ধেও বিধানসভাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ষোড়শ লুই কিন্তু দুটি প্রস্তাবই সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। বিধানসভার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য এইভাবে প্রকট হয়ে উঠল।

রাজার সঙ্গে বিধান-সভার সংঘর্ষ

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের জিরণ্ডিন মন্ত্রিসভা **অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা** করে। এই যুদ্ধের সূচনায় ফরাসী সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়ে সীমান্ত থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের অনেকেরই ধারণা হয় যে রাজা ও তাঁর পারিষদেরা গোপনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। দুটি ঘটনার ফলে এই ধারণা দৃঢ়তর হয়। প্রথমতঃ, রাজা যুদ্ধ বাধার দু' মাসের মধ্যেই **জিরণ্ডিন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত** করেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রাশিয়ার সেনাপতি **ডিউক অব ব্রানসউইক** (Duke of Brunswick) সহসা এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, যদি বিপ্লবীরা রাজার কোনো ক্ষতি বা অসম্মান করে, তাহলে তিনি প্যারিসের অধিবাসীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন। এই ঘোষণার ফলে প্যারিসে চূড়ান্ত উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট এক ক্রুদ্ধ জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে প্রহরীদের পরাস্ত ও নিহত করে, এবং **রাজাকে সপরিবারে বন্দী করে। বিধানসভাও এর**

রাজার পদচ্যুতি—দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (১৭৯২)

পর তাঁকে পদ্যচুত বলে ঘোষণা করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফ্রান্সে নতুন নির্বাচনের আদেশ দেয়। ১০ই আগস্টের এই অভ্যুত্থানটি **দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব** নামে ফ্রান্সের ইতিহাসে খ্যাত।

জাতীয় সম্মেলনের শাসন ঃ নব-নির্বাচিত **জাতীয় সম্মেলনে** (National Convention) জ্যাকোবিনদের ভিতরে অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী দল, **'মাউণ্টেন'** (Mountain) প্রাধান্য লাভ করে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন **রোবস্পিয়ের** (Robespierre), **ড্যাণ্টন** (Danton) ও **ম্যারাট**-এর (Marat) মতো খ্যাতনামা বিপ্লবীরা। কিন্তু জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে **প্যারিসে এক ভয়াবহ গণ-হত্যাকাণ্ড** অনুষ্ঠিত হয়। ম্যারাট-এর মতো বিপ্লবী নেতাদের ধারণা হয়েছিল যে বিদেশী সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করবে ততই দেশে রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা সক্রিয় হয়ে উঠবে। প্যারিসেও এই ধরনের বহু লোক প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, এবং এক আঘাতে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যই ম্যারাট এবং তাঁর সহযোগীরা সেপ্টেম্বর মাসের এই গণ-হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেন। প্রায় চৌদ্দশ প্যারিস-বাসীকে নাম-মাত্র বিচারের পর হত্যার আদেশ দেওয়া হয় এবং বলা বাহুল্য, বহু নির্দোষ ব্যক্তিও এর ফলে প্রাণ হারায়।

মাউন্টেন দলের আবির্ভাব

সেপ্টেম্বরের গণহত্যা

নব-নির্বাচিত জাতীয় সম্মেলন এর পর **ফ্রান্সকে** একটি **প্রজাতন্ত্র** (Republic) **বলে ঘোষণা** করে (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারেও জাতীয় সম্মেলন যথেষ্ট তৎপরতা দেখায়, এবং তার ফলে ঐ বৎসর ১লা অক্টোবর তারিখে **ভাল্মীর যুদ্ধে** (Battle of Valmy) প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হয় এবং তারা সীমান্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। ভাল্মীর যুদ্ধেই ড্যাণ্টন, ডুমুরিয়ে (Dumouriez) প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সংগঠন শক্তির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়।

ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা (১৭৯২)

জাতীয় সম্মেলনে বিপ্লবী নেতাদের প্রাধান্য থাকলেও ঐক্য আদৌ ছিল না। জ্যাকোবিনদের দুই প্রধান উপদল, 'জিরণ্ডিন' ও 'মাউণ্টেন'-এর মধ্যে শীঘ্রই **ক্ষমতার জন্য সংঘর্ষ** বাধে। মাউণ্টেন দল এদের মধ্যে বেশি সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, এবং প্যারিসে এদের সমর্থকেরাই সংখ্যাগুরু ছিল। রাজনৈতিক আদর্শের চেয়েও ব্যক্তিত্বের বিরোধই অবশ্য এদের মধ্যে প্রবল ছিল। জিরণ্ডিনরা অপেক্ষাকৃত শান্ত, স্থির ও উচ্চ-মধ্যবিত্তসুলভ উদার মনোভাবের

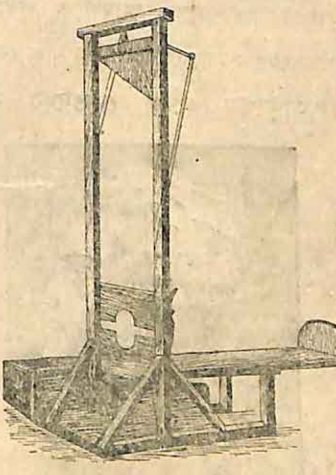
দুই বিপ্লবী দলে ক্ষমতার সংগ্রাম

লোক ছিল, এবং প্রতিটি ব্যাপারে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করতে চাইত। অন্যদিকে মাউন্টেন দল উগ্র, অধীর ও হিংসাশ্রয়ী ছিল; গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি প্রয়োজন বোধে বিসর্জন দিতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। **রাজা ষোড়শ লুই-এর বিচারের** ব্যাপারে এই দুই দলের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য দেখা যায়। দেশদ্রোহিতা ও বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চক্রান্তের অপরাধে লুই শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। জিরণ্ডিনরা প্রথমে রাজার মৃত্যু চায়নি, কিন্তু প্রতিপক্ষ দল যখন তাদের প্রচ্ছন্ন রাজ-সমর্থক বলে প্যারিসের জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন করতে চাইল, তখন আত্মরক্ষার্থে তাদের মত পরিবর্তন করতে হল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি রাজা ষোড়শ লুই-এর 'গিলোটিন' (Guillotine) যন্ত্রে শিরশ্ছেদ হল। প্রধানতঃ তাঁর পূর্বপুরুষদের অনাচার এবং তাঁর নিজের অকর্মণ্যতার জন্যই লুই শাস্তি বরণ করলেন। অবশ্য, বিদেশী শত্রু-রাষ্ট্রদের সঙ্গে যোগাযোগের যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল, সম্ভবতঃ তা-ও অসত্য ছিল না।

ষোড়শ লুই-এর বিচার ও প্রাণদণ্ড (১৭৯৩)

রাজার মৃত্যুর পর **জিরণ্ডিনদের অবস্থার দ্রুত অবনতি** ঘটল। নেদারল্যাণ্ড্‌স্ এবং আরো কয়েকটি স্থানে ফরাসীদের সামরিক পরাজয়ে দেশে আবার উত্তেজনার সৃষ্টি হল। ফ্রান্সের লা ভঁদি (La Vendee) প্রদেশে রাজতন্ত্রের সমর্থক ক্যাথলিকদের বিদ্রোহ এবং বিদেশী শক্তিদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যোগাযোগ রাজনৈতিক অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলল। ঠিক এই সঙ্কটময় মুহূর্তে জিরণ্ডিন দলের রাজনীতির সমর্থক ফরাসী সেনানায়ক ডুমুরিয়ে সহসা ফ্রান্সের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রতিপক্ষের প্রচারে উত্তেজিত হয়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে এক দল ন্যাশনাল গার্ড এবং কিছু সৈনিক জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলা কালে সভাকক্ষ ঘেরাও করল এবং জিরণ্ডিন সদস্যদের সভা থেকে বহিষ্কারের দাবী জানাল। দুই দিন পরেই জাতীয় সম্মেলন পঁচিশ জন জিরণ্ডিন নেতার সদস্যপদ বাতিল করে তাঁদের বিচারের আদেশ দিল।

জিরণ্ডিন দলের পতন



গিলোটিন যন্ত্র

এঁদের কেউ কেউ দেশত্যাগ করে পলায়ন করতে সমর্থ হলেও অধিকাংশই বিচারে দোষী সাব্যস্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror)ঃ জিরণ্ডিন দলের এই বিপর্যয়ের পর ফ্রান্সে উগ্র বিপ্লববাদী মাউণ্টেন দলের রাজনৈতিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল (১৭৯৩-৯৪)। এই দলের নেতারা রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে গণতন্ত্রের (Democracy) সমর্থক হলেও এঁরা মনে করতেন যে জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে, দেশের সঙ্কটকালে বিপ্লবীদের একনায়কত্ব (Dictatorship) স্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মাউণ্টেন দলের একাধিপত্য

এই একনায়কত্ব কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করার জন্য নয়, বিপ্লবের স্বার্থে ও প্রয়োজনেই এই একনায়কত্ব। ফ্রান্স যে এই সময় আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। দেশের ৮০টি প্রদেশের মধ্যে কুড়িটিতেই রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সৃষ্ট গোলযোগ ও অশান্তি দেখা দিয়েছিল, এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সকে ছয়টি বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করেছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে হল্যাণ্ড, স্পেন, সার্ডিনিয়া এবং ইংলণ্ড ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছিল (১৭৯৩)। এই অবস্থায় জাতীয় সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল। গণতান্ত্রিক আদর্শকে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে গেলে পরোক্ষে গণতন্ত্রের শত্রু রাজতন্ত্রের সমর্থকদেরই শক্তি বৃদ্ধি করা হত।

মাউণ্টেন দলের নেতাদের মধ্যে ম্যারাট অল্পদিনের মধ্যেই জনৈক জিরণ্ডিন-সমর্থকের হাতে প্রাণ হারান। ড্যাণ্টন-ও এর পর প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ফলে **রোব্‌স্পিয়েরই ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন,** এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রধানতঃ তাঁরই নির্দেশে গড়ে ওঠে। পেশায় আইনজীবী (Barrister) রোব্‌স্পিয়ের চিন্তার জগতে রুশোর অনুগামী ছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র, বাগ্মিতাশক্তি এবং প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁকে এই সময় জ্যাকোবিন দলের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় নেতা করে তুলেছিল।



রোব্‌স্পিয়ের

ক্ষমতা লাভের পর রোব্‌স্পিয়ের এবং তাঁর অনুগামীরা জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে একটি **আদর্শ গণতান্ত্রিক সংবিধান** রচনা করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই নতুন সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার দান, জাতীয় পরিষৎ-এর বাৎসরিক নির্বাচন, এবং সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ঐ পরিষৎ-এর হস্তে অর্পণের ব্যবস্থা করা হল। নির্বাচিত প্রশাসকমণ্ডলীকে (২৪ জন সদস্যের দ্বারা গঠিত) পরিষৎ-এর কাছেই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকতে হয়। বিশেষ বিতর্কিত সমস্যাগুলির উপর জনসাধারণের মতামত ভোটের দ্বারা নির্ধারণের ব্যবস্থা (Referendum) করা হয়।

১৭৯৩-এর সংবিধান

কিন্তু এই নতুন সংবিধান এক শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্যই রচিত হয়েছিল। বর্তমান দুর্যোগ থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য জ্যাকোবিন দল তিনটি সংস্থার হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেয়। এই তিনটি সংস্থার নাম যথাক্রমে **গ্রেট কমিটি** (Great Committee) বা **কমিটি অব পাব্‌লিক সেফ্‌টি** (Committee of Public Safety), **কমিটি অব পাবলিক সিকিউরিটি** (Committee of Public Security) এবং **রেভল্যুশনারি ট্রাইবুন্যাল** (Revolutionary Tribunal)। রোব্‌স্পিয়ের, কার্নো (Carnot) প্রমুখ দশ-বারো জন সদস্য নিয়ে 'কমিটি অব পাবলিক সেফ্‌টি' গঠিত হয়েছিল। দেশের সামগ্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এই কমিটির উপর অর্পিত হয়েছিল। এঁদের সুপরিচালনায় ও সংগঠনগুণে ফরাসী সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স-বিরোধী প্রথম শক্তিসঙ্ঘকে (First Coalition) বারবার পর্যুদস্ত করে, ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করে বেলজিয়াম ও রাইন্‌ল্যাণ্ড অঞ্চল অধিকার করে নেয় এবং হল্যাণ্ড জয় করতে উদ্যোগী হয়। কমিটি অব পাবলিক সিকিউরিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, এবং রেভল্যুশনারি ট্রাইবুন্যালের কাজ ছিল সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচার ও উপযুক্ত দণ্ড দান। বিভিন্ন প্রদেশগুলিতেও অনুরূপ বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং রাজধানী থেকে এই উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত একদল লোককে (Deputies on Mission) প্রতিটি প্রদেশে পাঠানো হয়। বলা বাহুল্য, বিচারের ভার যাদের উপর অর্পিত হয়েছিল তারা অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার করেনি। দোষী ব্যক্তিদের সঙ্গে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিও ট্রাইবুন্যালের বিচারে প্রাণ হারায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে **রাণী মারি আঁতোয়ানেৎ** (Marie Antoinette) **গিলোটিনে প্রাণ হারান**। এর পর রাজপরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত ফিলিপ অব অর্লিন্স (Philip of Orleans), প্রধান 'জিরণ্ডিন' নেতৃবৃন্দ এবং বহু অভিজাত ও উচ্চপদস্থ যাজককে নামমাত্র

সন্ত্রাসের রাজত্বের পরিচয়

বিচারের পর গিলোটিনে পাঠান হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা শীঘ্রই কয়েক হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র প্যারিস শহরেই এক বৎসরে আড়াই হাজারের বেশি লোককে প্রাণ হারাতে হয়। অভিজাত এবং যাজকদের পর সাধারণ লোকেদের, বিশেষতঃ যারা কিছুটা সম্পন্ন ছিল, তাদের পালা আসে। সব শেষে জ্যাকোবিন দলেরই নেতাদের উপর হাত পড়ে। প্রথমে ড্যান্টন এবং তাঁর অনুগামীরা, এবং সব শেষে সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা **রোব্‌স্পিয়ের স্বয়ং গিলোটিনে প্রাণ হারান।**

সন্ত্রাসের রাজত্ব যে শেষের দিকে ফ্রান্সের জনসাধারণের কাছে বিশেষ ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু রোব্‌স্পিয়েরের সরকার দেশে কিছু কিছু

জনহিতকর কার্যাবলী

গঠনমূলক এবং জনহিতকর কাজও করেছিল। ফ্রান্সকে শত্রু-সৈন্যমুক্ত করার পর এই সরকার দেশে সমস্ত আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকেদের স্বার্থে **খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের** জন্য আইন (Law of the Maximum) প্রণয়ন করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, আইন-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং নতুন আইন-সংহিতা (Law Code) রচনার কাজও কিছুদূর অগ্রসর হয়, ওজন ও বিভিন্ন মাপের জন্য 'মেট্রিক' পদ্ধতি (Metric system) গৃহীত হয় এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়া, কিছুটা আদর্শবাদিতার বশে, বিপ্লবী ফরাসী সরকার দেশে নতুন কাল-গণনার পদ্ধতি বা 'ক্যালেণ্ডার' প্রবর্তন করে। প্রচলিত ক্যালেণ্ডার অনুসারে খ্রীষ্টের জন্ম থেকে বৎসরের হিসাব করা হত, এবং মাসগুলিও বিভিন্ন প্রাক্-খ্রীষ্টান যুগের দেব-দেবীর নামে পরিচিত ছিল। **নতুন ক্যালেণ্ডারে** ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাল থেকে বৎসর গণনার ব্যবস্থা করা হয়, এবং মাসগুলিকে বিভিন্ন ঋতু বা প্রাকৃতিক ঘটনার নামে অভিহিত করা হয়। দশ দিনে এক মাস এই হিসাবও ঐ সঙ্গে প্রচলিত হয়। কিন্তু সরকারী কাগজপত্রের বাইরে নতুন মাস ও বৎসরের হিসাব বিশেষ প্রচলিত হয়নি। জনসাধারণ পুরানো ক্যালেণ্ডারই ব্যবহার করত এবং ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নির্দেশে এই প্রজাতান্ত্রিক ক্যালেণ্ডার অবলুপ্ত হয়।

জ্যাকোবিন বিপ্লবীরা চার্চের ঘোরতর বিরোধী ছিল। ফলে সন্ত্রাসের রাজত্বকালে দেশে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে, বহু চার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং ধর্মীয় উৎসব পালনও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঈশ্বরের উপাসনার পরিবর্তে **যুক্তির পূজা** (Worship of Reason) প্রবর্তিত হয় এবং প্যারিসের বিখ্যাত 'নোতর দাম' (Notre Dame) গির্জায় মহাসমারোহে 'যুক্তির

চার্চ ও ধর্মের অবমাননা

উৎসব' (Festival of Reason) পালিত হয়। প্যারিসের এক অভিনেত্রী গির্জার মধ্যে যুক্তি-দেবীর বেশে আসন গ্রহণ করে এবং জনসাধারণ তার বেদীমূলে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে। রোব্‌স্পিয়ের নিজে অবশ্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং ধর্মের প্রতি এতটা অবজ্ঞা প্রদর্শন তিনি সহ্য করতে পারেননি। পরে তাঁরই উদ্যোগে আবার 'পরমেশ্বরের উৎসব' (Festival of the Supreme Being) পালিত হয়।

যাই হোক্‌, সন্ত্রাসই শেষ পর্যন্ত রোব্‌স্পিয়েরের পতনের কারণ হয়। অত্যধিক সন্ত্রাসের ফলে জাতীয় সম্মেলনের সদস্যেরা ক্রমশঃ ভীত, সন্দিগ্ধ ও বিচলিত হয়ে ওঠে, এবং রোব্‌স্পিয়েরের প্রচ্ছন্ন শত্রুরা এই সুযোগে সহসা তাঁকে বন্দী করে এক বিচারের প্রহসনের পর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে (২১ জুলাই, ১৭৯৪)। তাঁর মৃত্যুর পরই সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয়।

রোব্‌স্পিয়েরের পতন

সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রতিক্রিয়া : রোব্‌স্পিয়েরের পতনের পর ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিপ্লব এর পর থেকে পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করে। দেশে একটানা বহুদিন অশান্তি চলায় জনসাধারণ ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করছিল। শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক, এই ছিল তাদের মনের বাসনা। রোব্‌স্পিয়েরের মৃত্যুর পর নরমপন্থীরা ক্ষমতায় ফিরে আসে। সন্ত্রাসের রাজত্বকালে যে তিনটি বিশেষ সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেই তিনটিকে অবিলম্বে পুনর্গঠিত করা হয়, অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী নেতাদের নিয়ে। প্রাক্তন বিপ্লবীদের কারো কারো বিচারে দণ্ড হলেও 'রেভল্যুশনারি ট্রাইবুন্যালের' মাধ্যমে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এর পর বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বে দণ্ডিত বহু ব্যক্তি এখন মুক্তিলাভ করে, বিশেষভাবে ধনী ও মধ্যবিত্তেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জ্যাকোবিন ক্লাব জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। জাতীয় সম্মেলন আবার দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব ফিরে পায়।

নরমপন্থীদের প্রত্যাবর্তন

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সম্মেলন ফ্রান্সের জন্য এক **নতুন সংবিধান** রচনা করে। ভবিষ্যতে যাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব ফিরে না আসে, এবং অল্প-সংখ্যক লোক সংবিধান অগ্রাহ্য করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে না পারে, সেজন্য এই সংবিধানে কতকগুলি প্রতিষেধ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ, দেশের শাসনকার্য নির্বাহের ভার দেওয়া হয় পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত এক পরিচালক সমিতির (Directory) উপর। এই সমিতির কার্যকালের মেয়াদ হয় পাঁচ বৎসর, কিন্তু ঠিক হয় যে প্রতি বৎসরের শেষে একজন পরিচালককে (Director) অবসর গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভাও একটির পরিবর্তে

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান

দুটি কক্ষ (chamber) নিয়ে গঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদের মধ্যে নিম্নতন কক্ষটি শুধু নতুন আইনের প্রস্তাব আনবে, এবং ঊর্ধ্বতন কক্ষটি তা গ্রহণ বা বর্জন করবে বলে ঠিক হয়। তবে রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা যাতে এই সভাদুটিতে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য এদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যই জাতীয় সম্মেলনের বর্তমান সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকারও সব লোককে দেওয়া হয়নি; সম্পন্ন লোকেদের মধ্যেই এই অধিকার সীমাবদ্ধ রাখা হয়। প্রাদেশিক প্রশাসকদের নির্বাচনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এই সংবিধানটি গণভোটের (Referendum) দ্বারা গৃহীত হয়, কিন্তু খুব অল্প-সংখ্যক লোকই এই ভোটে অংশ গ্রহণ করে। আইন সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য জাতীয় সম্মেলনের বর্তমান সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে বলে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্যারিসের জনসাধারণ তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এবং সম্মেলনের অধিবেশন যে বাড়ীতে চলছিল সেই বাড়ীটি আক্রমণ করে। কিন্তু সম্মেলনের নেতারা এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁদের নির্দেশে সৈন্যরা উত্তেজিত জনতাকে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ছত্রভঙ্গ করে দেয় (অক্টোবর, ১৭৯৫)। অবিলম্বে শহরে শান্তি ফিরে আসে, এবং রাজনীতিতে জনতার হস্তক্ষেপ বেশ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যে নবীন সেনাধ্যক্ষ এই ভাবে জনতার রোষ থেকে জাতীয় সম্মেলনকে রক্ষা করেন, পরবর্তী কালে তিনিই **নেপোলিয়ন বোনাপার্ট** (Napoleon Bonaparte) নামে ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা হন।

বিদ্রোহী জনতাকে দমন

ডিরেক্টরীর শাসন (১৭৯৫-৯৯): এরপর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত পরিচালক সমিতি (Directory) ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করে, ও পরবর্তী চার বৎসর তারাই দেশ শাসন করে। কয়েকটি ব্যাপারে ডিরেক্টরগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। আন্তর্জাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী সৈন্যবাহিনী নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে ইটালী ও মিশরে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। প্রাশিয়া ও স্পেন অবশ্য ইতিপূর্বেই যুদ্ধ ত্যাগ করেছিল। দেশের মধ্যেও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কিছুকালের জন্য সৈন্যবাহিনীতে যোগদান প্রতিটি নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়। এই ধরনের ব্যবস্থা সে যুগে ইউরোপের অন্য কোনো দেশে ছিল না।

ডিরেক্টরীর শাসনের সুফল

কিন্তু নানা ব্যাপারে ডিরেক্টরদের অসাফল্যও প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, ইউরোপে ফ্রান্সের শত্রুরা আবার জোট বাঁধে, এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে **দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের যুদ্ধ** (War of the Second Coalition) আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর কাছে ফরাসীরা বারংবার পরাস্ত হয়। ইটালীতেও রুশ সৈন্যেরা ফরাসীদের পরাজিত করে। দ্বিতীয়তঃ, এই সময় ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়, ও ফরাসী সরকার প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী সরকারের দুর্বলতার সুযোগে আবার মাথা তোলার চেষ্টা করে। ডিরেক্টরগণ এদের কাউকে কাউকে দমন করলেও শেষ পর্যন্ত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক অভ্যুত্থানের ফলে তাদের পতন ঘটে। এর পর ফ্রান্সে তিনজন শাসককে (Consul) নিয়ে এক নতুন প্রশাসকমণ্ডলী (Consulate) গঠিত হয় এবং **নেপোলিয়ন বোনাপার্ট** এদের মধ্যে **প্রথম 'কন্সাল'** রূপে নির্বাচিত হন। **ফরাসী বিপ্লবের এখানেই কার্যতঃ অবসান ঘটে।**

ডিরেক্টরদের ব্যর্থতা

বিপ্লবের অবসান (১৭৯৯)

ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ঃ ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই বিপ্লবের প্রভাব বহুদিন সক্রিয় ছিল। বিপ্লব-প্রসূত চিন্তাধারা ইউরোপের বাইরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণা দিয়েছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লব যে **স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী** (Liberty, Equality and Fraternity) বহন করে এনেছিল ফরাসী জাতির অন্তরে তা দৃঢ়মূল হয়। এ কথা সত্য যে, নেপোলিয়নের পতনের পর বুর্বোঁ বংশের রাজাদের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন ঘটলে ঐ দেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার অনেকাংশে খর্ব হয়েছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বহু দিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের মাত্র ভোট দেবার অধিকার ছিল; জনসাধারণ তখনো ছিল ঐ অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ ছাড়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও ফ্রান্সে তখন ছিল না। কিন্তু ঐ সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ফ্রান্স সব সময়ে একটি লিখিত সংবিধানের দ্বারা শাসিত হয়েছে, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ফ্রান্সে আর কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এ ছাড়া ফরাসী বিপ্লব যে উদারনৈতিক মতবাদের ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিল তাও পরবর্তী কালে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

উদারনীতির জয়যাত্রার সূচনা

দ্বিতীয়তঃ, আজকাল আমরা যাকে **জাতীয়তাবাদের মনোভাব** (Spirit of

Nationalism) বলি তাও ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি। এক ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জাতির কল্পনা, ধর্ম বা শ্রেণী স্বার্থের উপর জাতিগত স্বার্থকে স্থান দেওয়ার প্রবণতা ও জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করা, এ সবই প্রথম ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে দেখা দেয় এবং পরে ঐ দেশ থেকে ইউরোপের অন্যত্র প্রসার লাভ করে। জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় সৈন্যবাহিনী (যাতে প্রয়োজন হলে যোগদান করা দেশের প্রতিটি সুস্থদেহী প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের কর্তব্য) এবং জাতীয় পার্লামেন্টের (যাতে শ্রেণী বা ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে) কল্পনা এই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত।

জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়

তৃতীয়তঃ, এই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে ফ্রান্সে **প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ঐক্য** স্থাপিত হয়। সমস্ত দেশে একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা, একই আইন-কানুন, একই কর ও শুল্ক ব্যবস্থা এবং একই মেট্রিক পদ্ধতিকে ওজন ও অন্যান্য মাপের প্রচলন বিপ্লবের সময়েই প্রথম হয়েছিল। অবশ্য, এই ব্যাপারে নেপোলিয়নের অবদান যথেষ্ট ছিল।

নানা বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লবের সব চেয়ে বড় কীর্তি **সামন্ত-প্রথার** (Feudalism) **অবসান**। বিপ্লবের ফলে যে সবরকম বিশেষ অধিকারের (Privilege) বিলোপ হয়েছিল তা নয়, নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার তখনো অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সামন্তপ্রথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বহু বিশেষ অধিকার ও বিশেষ দায়িত্বের এখানেই অবসান হয়, আইনের চোখে সমস্ত নাগরিকের সমান মর্যাদা স্বীকৃত হয়, এবং চাকরির ব্যাপারেও ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে বংশ-মর্যাদার উপরে স্থান দেওয়া হয়। বড় বড় জমিদারি ভেঙ্গে দিয়ে ছোট চাষীদের নিজ নিজ জমির মালিকানা দেওয়া হয়। মধ্যযুগের সমবায়-সমিতিগুলিও (Guilds) বিপ্লবের সময়ে লুপ্ত হয়ে যায়, ফলে পরবর্তী কালে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রাধান্য লাভ করে।

সামন্তপ্রথার অবসান

বিপ্লবের পর ফ্রান্সে যে **নতুন সমাজ-ব্যবস্থা** স্থাপিত হল তা ছিল **সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক** (individualistic)। ব্যক্তির রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন স্বভাবতই এই সমাজে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। **ধর্মের ব্যাপারেও ব্যক্তির স্বাধীনতা** এই বিপ্লবের ফলে স্বীকৃত হয়। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ অবশ্য এর পরেও বহুদিন রাষ্ট্রের আনুকূল্য উপভোগ করেছিল। কিন্তু অন্য ধর্মমতাবলম্বীদের স্ব স্ব মতে উপাসনা করার অধিকারে

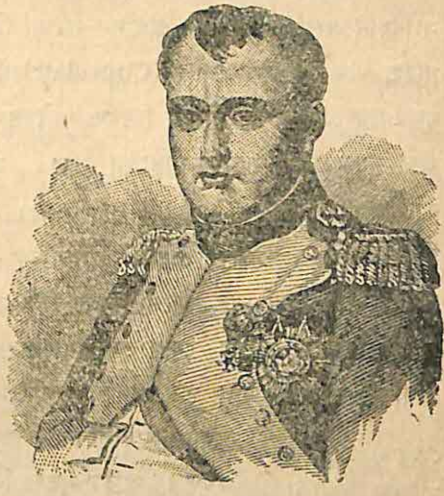
ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্র আর কখনো হস্তক্ষেপ করেনি। এই ব্যাপারেই অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ সব চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের মাধ্যমে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে পরে সে বিষয়ের অবতারণা করা হবে।

নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ঃ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত কর্সিকা (Corsica) দ্বীপের আজাসিও (Ajaccio) শহরে এক সম্পন্ন পরিবারে নেপোলিয়নের জন্ম হয়। ফ্রান্সের ব্রিয়েন (Brienne) ও প্যারিস শহরে সামরিক শিক্ষা লাভ করে তিনি ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে **প্যারিসে এক উত্তেজিত জনতাকে গোলাবর্ষণের দ্বারা ছত্রভঙ্গ করে** তিনি ডিরেক্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং পরে তাঁদেরই নির্দেশ অনুসারে **ইটালীতে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অভিযানের** (১৭৯৬-৯৭) **নেতৃত্ব** গ্রহণ করেন। ইটালীর উত্তরাংশ সে যুগে অস্ট্রিয়ার প্রভাবাধীন ছিল। অস্ট্রিয়াকে বারবার যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি উত্তর ইটালীর কিছু অংশ অধিকার করেন। অস্ট্রিয়া **ক্যাম্পোফোর্মিওর** (Campoformio) **সন্ধি** স্থাপনে বাধ্য হলে (১৭৯৭) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপে যে **প্রথম শক্তিসঙ্ঘ** (First Coalition) ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে উঠেছিল তা **ভেঙ্গে যায়**।

ইটালী অভিযান



নেপোলিয়ন

এর পর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিন্ন করার জন্য নেপোলিয়ন **মিশর অভিযান** করেন। কিন্তু মিশরে প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও **নীল নদের যুদ্ধে** (Battle of the Nile) তিনি ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি **নেলসনের** (Nelson) **কাছে পরাজিত** হন। এর পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের খবর পেয়ে সেখানে ফিরে আসেন। ডিরেক্টারদের শাসন-ব্যবস্থা তখন এক বিপর্যয়ের মুখে।

মিশর অভিযান

নেপোলিয়নের সামরিক কীর্তি ইতিমধ্যেই তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। অকর্মণ্য ডিরেক্টারদের ব্যর্থতার পাশে তাঁর সাফল্য যেন আরো বড় হয়ে দেখা দিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে **দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ** (Second Coalition) গঠিত হয় ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুর্কী সাম্রাজ্যকে নিয়ে। আবার যুদ্ধ বাধলে নেপোলিয়নের অনুপস্থিতির সুযোগে রুশ সেনাপতি সুভোরভ (Suvorov) ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে ইটালী থেকে বিতাড়িত করেন। এতে ডিরেক্টারদের ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে ওঠে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেপোলিয়ন এই সুযোগে তাঁর সৈন্যদের সাহায্যে ডিরেক্টারদের পদচ্যুত করে স্বহস্তে ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করেন (নভেম্বর, ১৭৯৯)।

ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন ও ক্ষমতা অধিকার

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে এক **নতুন সংবিধান** উপহার দেন। এই সংবিধান অনুসারে ফ্রান্সের প্রশাসন-ব্যবস্থা তিন জন **কনসালকে** (Consul) নিয়ে গঠিত এক প্রশাসকমণ্ডলীর (Consulate) উপর ন্যস্ত করা হয়। তিন জন কনসাল যুক্তভাবে প্রশাসনের দায়িত্ব নিলেও এঁদের মধ্যে প্রথম কনসালই সর্বপ্রধান ছিলেন, অন্য দুজন তাঁর সহায়ক ছিলেন মাত্র। কনসালেট মন্ত্রীদের (Ministers) এবং কাউন্সিল অব স্টেট (Council of State) নামে একটি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নিযুক্ত করত। মন্ত্রীরা প্রধান প্রশাসনিক বিভাগগুলির দেখাশোনা করত, কিন্তু তাদের নীতি-নির্ধারণের কোনো ক্ষমতা ছিল না। কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের যোগ্যতম লোকেদের মনোনীত করা হত। তারা সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখত, প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের কাজ করত এবং আইনের খসড়া প্রস্তাব তৈরী করত। আইন-সভার নির্বাচন হত এক বিচিত্র উপায়ে। ভোট-দাতারা বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্র থেকে যাদের নির্বাচন করত প্রথমে শুধু তাদের নামের একটি তালিকা (National list) প্রস্তুত করা হত। এই তালিকা থেকে সিনেট (Senate) নামে আর একটি সংস্থা তাদের পছন্দ মতো সদস্যদের আইন-সভার সদস্য বলে ঘোষণা করত। সিনেটের সদস্যেরা সকলেই কনসালদের দ্বারা মনোনীত হত; সুতরাং কনসালদের মনোনীত লোকেরাই শেষ পর্যন্ত আইন-সভায় যেতে পারত। এই আইন-সভা আবার দুটি কক্ষে বিভক্ত ছিল। কাউন্সিল অব স্টেট আইনের খসড়া করে পাঠালে প্রথমে ঊর্ধ্বতন কক্ষ ট্রিবিউনেট (Tribunate) তা নিয়ে আলোচনা করে ঐ খসড়ার উপর আপন মতামত জানাত, কিন্তু কোন ভোট দেবার অধিকার তার ছিল না। তারপর সেই আইনের খসড়া ট্রিবিউনেটের

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান

প্রস্তাবিত পরিবর্তন সহ নিম্নতন কক্ষ লেজিসলেটিভ বডি'র (Legislative Body) কাছে পাঠানো হত। এই সভার সদস্যেরা প্রস্তাবগুলি ভোটের দ্বারা গ্রহণ বা বর্জন করত, কিন্তু সেগুলি নিয়ে কোনো তর্ক-বিতর্ক করতে পারত না। লেজিসলেটিভ বডির অনুমোদিত যে কোন আইন সিনেট-এর মনোমত না হলে সিনেট তা নাকচ করে দিতে পারত।

স্পষ্টই দেখা যায়, এই সংবিধানে কনসালেটই ছিল সর্বশক্তিমান, এবং কনসালেটের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রথম কনসাল হিসাবে স্বয়ং নেপোলিয়ন। দশ বৎসরের জন্য তিনি ঐ পদে নির্বাচিত হন। নেপোলিয়নের ওপর ফ্রান্সের জনসাধারণের অগাধ আস্থা ছিল ; তাই তারা এই সংবিধানকে বিপুল ভোটাধিক্যে অনুমোদন করে।

নেপোলিয়নের সামরিক সাফল্য

ক্ষমতা লাভের পর প্রথম কনসাল-এর প্রধান কাজ হল **দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের আক্রমণ প্রতিরোধ** করা। কূটনীতির সাহায্যে নেপোলিয়ন রাশিয়াকে তাঁর দলে টেনে নিলেন, এবং ক্যাথলিকদের সহানুভূতি লাভের জন্য পোপের দ্বারস্থ হলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী উত্তর ইটালীতে **ম্যারেঙ্গোর** (Marengo) **যুদ্ধে** এবং সুইজারল্যাণ্ডে **হোহেনলিণ্ডেনের** (Hohenlinden) **যুদ্ধে** ফরাসীদের হাতে পরাজিত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত **লুনেভিলের সন্ধির** (Peace of Lunaville) দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় (১৮০১)। ইটালীতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রাইন নদী ফ্রান্সের পশ্চিম সীমানা হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু নৌযুদ্ধে ইংলণ্ডকে পরাস্ত করা নেপোলিয়নের পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি। মিশরে নেপোলিয়ন যে সব ফরাসী সৈন্যদের রেখে এসেছিলেন ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসন তাদের সেই দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে **আমিয়েন্সের চুক্তির** (Peace of Amiens) দ্বারা ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সাময়িক শান্তি স্থাপিত হয়।

সম্রাট উপাধি গ্রহণ (১৮০৪)

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন কাউন্সিল অব স্টেট-এর প্রস্তাব অনুসারে **চির-জীবনের জন্য প্রথম কনসাল** পদে বৃত হন। তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের অধিকারও দেওয়া হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সিনেটের প্রস্তাব অনুসারে, গণভোটের সমর্থনে, নেপোলিয়ন **ফরাসী জাতির সম্রাট** (Emperor of the French) উপাধি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কনসালকে অন্য পদ দিয়ে কনসালেট ব্যবস্থাই তুলে দেওয়া হয়। ফরাসী প্রজাতন্ত্র এইভাবে কার্যতঃ ফরাসী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্রিবিউনেট সভাটিরও বিলোপ সাধন করা হয়। ফলে কাউন্সিল অব স্টেট-এর প্রস্তাবিত আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফরাসী সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়।

নেপোলিয়নের শাসন-সংস্কার : ১৭৯৯ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পনের বৎসর একাদিক্রমে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েও এই পনের বৎসরে তিনি নানা রকম শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করে ফ্রান্সের উন্নতি ও ফরাসী জাতির কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর সরকার তরবারির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়—প্রধানতঃ এই সব জনহিতকর প্রচেষ্টার জন্যই। তাঁর পতনের পরও তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলি বহুদিন স্থায়ী হয়েছিল। একাধারে দিগ্বিজয়ী সম্রাট এবং আদর্শ শাসক ও সংস্কারক হিসাবে নেপোলিয়ন প্রসিদ্ধ রোম-সম্রাট জুলিয়াস সীজারের (Julius Caesar) সঙ্গে তুলনীয়।

কৃতিত্ব

প্রথমতঃ, নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সর্বত্র **শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন,** ও কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহের চেষ্টা এবং চুরি-ডাকাতি-লুঠতরাজ বন্ধ করেন। একদিকে রাজতন্ত্রের সমর্থকদের এবং অপরদিকে বামপন্থী জ্যাকোবিন বিপ্লবীদের তিনি দমন করতে সমর্থ হন। নেপোলিয়নের রাজত্ব ছিল প্রকৃতপক্ষে মধ্যমপন্থীদের শাসন, এবং এর দ্বারা ফ্রান্সের মধ্যবিত্তেরা এবং কৃষকদের একাংশ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল।

শান্তি স্থাপন

দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন **বিপ্লবের প্রাক্তন শত্রুদের প্রতি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার নীতি** গ্রহণ করেন। যে সব ফরাসী সামন্ত ও যাজক বিপ্লবের সময় দেশত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিল (Emigres) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারের সহায়তা করেছিল, তাদের ফিরে আসার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের উপর কোন দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না বলে আশ্বাস দেন। লক্ষাধিক দেশত্যাগী সামন্ত ও যাজক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে ফিরে আসে ও তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে শাসন-বিভাগে উচ্চ পদও দেওয়া হয়। বহু রাজনৈতিক বন্দী এই সময় মুক্তি পায়।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার নীতি

তৃতীয়তঃ, ধর্মের ব্যাপারে নেপোলিয়ন **রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার নীতি** অনুসরণ করেন এবং ক্যাথলিক জগতের প্রধান ধর্মগুরু পোপ সপ্তম পায়াসের (Pius VII) সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেন (১৮০১ খ্রীঃ)। 'কনকরড্যাট' (Concordat) নামে পরিচিত এই চুক্তির দ্বারা তিনি **রোম্যান**

ক্যাথলিক ধর্মকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকার করে নেন, ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীরা চার্চের জন্য যে নতুন সংবিধান করেছিল তা প্রত্যাহার করেন, এবং বিশপেরা (Bishop) পোপের দ্বারাই স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত হবে বলে ঘোষণা করেন। এর বিনিময়ে চার্চ ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নেয়, বিপ্লবের সময় তার যে সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল তার উপর দাবী ত্যাগ করে এবং পোপের দ্বারা অভিষিক্ত হবার আগে বিশপেরা প্রথম কনসাল-এর দ্বারা মনোনীত হবে বলে ঘোষণা করে। চার্চের সমস্ত কর্মচারীদের বেতন সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। এইভাবে ফ্রান্সের রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ ফরাসী সরকারের আশ্রিত ও অনুগত হয়ে পড়ে।

চার্চের সঙ্গে মীমাংসা

চতুর্থতঃ, নেপোলিয়ন ফ্রান্সে এক **দক্ষ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন** ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। নেপোলিয়ন নিজে শাসন-বিভাগের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও দৃষ্টি দিতেন, এবং তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতাও ছিল অসাধারণ। ফ্রান্সে তিনি আবার এক আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভা গড়ে তোলেন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের মর্যাদা দেবার জন্য 'লিজিয়ন অব অনার' (Legion of Honour) নামে এক সম্মানসূচক উপাধি দানের ব্যবস্থা করেন।

দক্ষ প্রশাসন-ব্যবস্থা

পঞ্চমতঃ, নেপোলিয়ন ফ্রান্সের **অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলেন**। ধনীদের কাছ থেকে জোর করে ধার আদায় করবার (Forced Loan) যে নীতি ডিরেক্টারেরা ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছিলেন তিনি তা ত্যাগ করেন। তার পরিবর্তে তিনি সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করেন এবং রাজস্ব-বৃদ্ধির জন্য আয়করের (Income Tax) প্রচলন করেন। বিভিন্ন শুল্ক এবং কর আদায়ের জন্যও প্রতিটি প্রদেশে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং বকেয়া করের হিসাব তৈরী করা হয়। 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড'-এর আদর্শে 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স'-এর (Bank of France) প্রতিষ্ঠা করে শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথ তিনি প্রশস্ত করেন। দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও চেষ্টা করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ষষ্ঠতঃ, নেপোলিয়ন ফ্রান্সের **সমস্ত আইনের পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণের** ব্যবস্থা করেন। সন্ত্রাসের রাজত্বকালেই এ ব্যাপারে ফরাসী সরকার প্রথম আগ্রহী হয়েছিল। ফ্রান্সের সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে সেগুলির সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন

আইন-ব্যবস্থায় সামাজিক সাম্য, ধর্ম-সহিষ্ণুতা, ভূমিদাসদের মুক্তি, সামন্তপ্রথার অবসান প্রভৃতি স্বীকৃত হয়। সম্পত্তির অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, নেপোলিয়ন তার ব্যবস্থাও করেন। ফৌজদারী মামলায় জুরির (Jury) সাহায্যে বিচারের প্রথা প্রবর্তন করা হয় এবং আদালতে সব রকম মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনেরও ঐ সঙ্গে সংশোধন করা হয়। এই ভাবে কয়েক বৎসর ধরে যে সব বিভিন্ন আইন-সংহিতা (Code) রচিত হয় ঐতিহাসিকেরা সেগুলিকে একত্র **কোড্ নেপোলিয়ন** (Code Napoleon) নামে অভিহিত করেন। নেপোলিয়ন স্বয়ং যে এই সংহিতাগুলি রচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ব্যাপারে তাঁকে প্রাচীন বাইজ্যান্টিয়ামের (Byzantium) সম্রাট জাস্টিনিয়ানের (Justinian) সঙ্গে তুলনা করা চলে। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন আইন-ব্যবস্থা ফ্রান্সের বাইরে ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশেও প্রচলিত হয়।

নতুন আইন-সংহিতা রচনা

এ ছাড়া নেপোলিয়ন ফরাসী **শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার** করেছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি কোনো চেষ্টা করেননি, কিন্তু ধনী ও মধ্যবিত্তদের সন্তানদের জন্য ভাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে দেশে বহু নতুন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হয়। আইন, চিকিৎসা-শাস্ত্র, যন্ত্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার জন্যও একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্যারিসে 'ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটি' (Imperial University) নামে এক বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। শিল্প-রসিক নেপোলিয়ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করে সেগুলিকে প্যারিসের সংগ্রহশালায় স্থান দেন।

শিক্ষা-সংস্কার

সব শেষে আমরা নেপোলিয়নের **প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের** উল্লেখ করতে পারি। নেপোলিয়ন প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসকদের নির্বাচনের ব্যবস্থা লোপ করে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থাকে এই ভাবে কেন্দ্রের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, এবং সর্বত্র দক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশাসন

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতার (Liberty) আদর্শকে অবশ্যই খর্ব করেছিলেন। তাঁর শাসন সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা তিনি অনেকাংশে খর্ব করেছিলেন,

ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্ক

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও তাঁর সময় স্বীকৃত হয়নি। এদিক থেকে বিচার করলে তিনি বিপ্লবের শত্রু ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের সেবায় এবং বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লব-প্রসূত সামাজিক সাম্যের (Equality) আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। জন্মগত অধিকারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত যোগ্যতাই সর্বক্ষেত্রে উন্নতির সোপান হিসাবে স্বীকৃত হয়। এদিক থেকে চিন্তা করলে আবার নেপোলিয়নকে 'বিপ্লবের সন্তান' বলা চলে।

নেপোলিয়নের দিগ্বিজয় (১৮০৪-০৭ খ্রীঃ): ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে দশ বৎসর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই দশ বৎসরই তাঁকে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম চার-পাঁচ বৎসর তিনি প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিলেন, এবং ফ্রান্সের জনগণকে এই সময় তিনি যে সামরিক গৌরবের আস্বাদ দিয়েছিলেন বহুদিন তার স্মৃতি তাদের মনে জাগরূক ছিল।

ট্রাফালগারের যুদ্ধ (১৮০৫)

নেপোলিয়নের 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণের আগেই ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁর আবার যুদ্ধ বাধে (১৮০৩)। কিন্তু নেপোলিয়ন স্থলে অপ্রতিরোধ্য হলেও সমুদ্রে ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনী ছিল অপরাজেয়। একবার কোন ভাবে 'ইংলিশ প্রণালী' (English Channel) অতিক্রম করতে পারলেই ইংলণ্ড জয় করা তাঁর পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হত না। কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নেপোলিয়ন কখনোই ইংলণ্ডে পদার্পণ করতে পারেননি। এই প্রচেষ্টায় তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় হয় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে **ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে** (Battle of Trafalgar)। ব্রিটিশ সেনাপতি নেলসন এই যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করলেও, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘের যুদ্ধ—অষ্ট্রিয়ার চূড়ান্ত পরাজয়

ইংলণ্ডের উদ্যোগে এই বৎসরই ইউরোপে ফ্রান্স-বিরোধী **তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ** (Third Coalition) গঠিত হয় (১৮০৫)। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও সুইডেন এই সঙ্ঘের সদস্য ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের 'বিশাল সৈন্যবাহিনী' (Grand Army) বারবার অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে যুদ্ধে পরাস্ত করে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী **ভিয়েনা** (Vienna) **অধিকার** করে। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীও তাদের হাতে **অস্টারলিট্‌জের যুদ্ধে** (Battle of Austerlitz) বিধ্বস্ত হয়। **প্রেসবুর্গের** (Pressburg) **সন্ধির** দ্বারা অষ্ট্রিয়া তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করে, এবং ভেনিস (Venice) ও আরো কয়েকটি স্থান ফ্রান্সকে সমর্পণ করে (ডিসেম্বর, ১৮০৫)। হতমান অষ্ট্রিয়ার সম্রাট এর পর 'পবিত্র রোম্যান সম্রাট' উপাধি ত্যাগ করেন, এবং প্রায় সহস্র বৎসরের পুরানো **পবিত্র**

রোম্যান সাম্রাজ্যের অবসান হয়। অষ্ট্রিয়া তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করার পর প্রাশিয়া এতে যোগদান করে (১৮০৬)। কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে **বার্লিন অধিকার** করেন। রুশ সৈন্যবাহিনীও তাঁর কাছে বারবার পরাজিত হয়ে পোল্যাণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয় (১৮০৭)। **টিলসিট** (Tilsit) নামে একটি স্থানে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (Tsar Alexander I) নেপোলিয়নের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং নেপোলিয়নকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। ইউরোপে তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘের যুদ্ধের এই ভাবে অবসান হয় (১৮০৭)।

টিলসিটের চুক্তি সম্পাদনার সময় (জুন, ১৮০৭) নেপোলিয়ন তাঁর ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন বলা চলে। তিনি এই সময় শুধু যে ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন তা নয়, উত্তর ইটালী তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল, রোমের পোপ ছিলেন তাঁর মিত্র এবং তাঁর বড় ভাই যোসেফ (Joseph) হয়েছিলেন দক্ষিণ ইটালীর নেপলস (Naples) রাজ্যের শাসক। তাঁর আর এক ভাই লুইকে (Louis) তিনি হল্যাণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। স্পেন ও ডেনমার্কের রাজারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতেন। জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই দুটি প্রধান রাজ্যই বারবার তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে হতবল হয়ে পড়েছিল। এই দুটি রাজ্যকে বাদ দিয়ে জার্মানীর অন্যান্য রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে নেপোলিয়ন **রাইন নদীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ** (Confederation of the Rhine) নামে একটি অনুগত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন (১৮০৬)। তিনি নিজেই ছিলেন এই রাষ্ট্রের রক্ষাকর্তা এবং কার্যতঃ প্রভু। পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে নেপোলিয়ন তাঁর অনুগত স্যাক্সনীর (Saxony) রাজাকে স্থাপন করেন। রাশিয়ার সম্রাটও ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সহযোগী বন্ধু হন। কিন্তু এর পর থেকেই নেপোলিয়নের সৌভাগ্য-রবি ধীরে ধীরে অস্তগামী হতে থাকে। অসামান্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নানা ভুল-ভ্রান্তির দ্বারা তিনি নিজের পতনকে ডেকে আনেন।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের প্রভাব

নেপোলিয়নের পতনের কাহিনী (১৮০৮-১৫):

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের একটি শত্রুই অপরাজিত ছিল, তার নাম ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির জন্য নেপোলিয়নের পক্ষে চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত এই দ্বীপটি আক্রমণ ও অধিকার করা অসম্ভব ছিল। তাই নেপোলিয়ন স্থির করলেন যে ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য ধ্বংস করে তিনি

ইংলণ্ডের শত্রুতা

তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে ফেলবেন। ইংরেজদের তিনি তাচ্ছিল্য করে 'দোকানদারের জাত' (A Nation of shop-keepers) বলতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে বাণিজ্য নষ্ট হবার উপক্রম দেখলেই ইংরেজরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে।

১৮০৬ থেকে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি নির্দেশ প্রচার করে নেপোলিয়ন তাঁর অধিকৃত এবং প্রভাবাধীন দেশগুলির সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ করবার চেষ্টা করেন। এই দেশগুলির কোন বন্দরে ইংলণ্ডে তৈরী কোন পণ্যদ্রব্য বা ব্রিটিশ জাহাজকে কখনো প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়। ঐতিহাসিকেরা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক অবরোধের নাম দিয়েছেন **মহাদেশীয় ব্যবস্থা** (Continental System)। ইংলণ্ড এই অবরোধের প্রত্যুত্তরে জানায় যে, সেও ফ্রান্স এবং তার অনুগত দেশগুলির সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থা অবশ্যই ব্রিটিশ বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি করে, কিন্তু এতে তাঁর নিজেরও প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমতঃ, ইউরোপের সুদীর্ঘ উপকূল পাহারা দেওয়ার উপযুক্ত নৌ-বল নেপোলিয়নের ছিল না। ডেনমার্কের নৌ-বাহিনীকে ব্রিটিশ নৌ-বহরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টাও তাঁর ব্যর্থ হয় **কোপেনহ্যাগেনের যুদ্ধে** (১৮০৭)। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে বহু কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল, এবং ইউরোপে ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের প্রচুর চাহিদা ছিল। শিল্পে অনুন্নত ফ্রান্স সে চাহিদা পূরণ করতে না পারায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং ঐ সব দেশের জনগণের, বিশেষতঃ ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশের বণিকেরা চোরাকারবারের (smuggling) পথে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি করার চেষ্টা করে, এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নই কোন কোন ক্ষেত্রে এই আমদানির জন্য অনুমতি-পত্র (license) দিতে বাধ্য হন।

মহাদেশীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা

মহাদেশীয় ব্যবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে নেপোলিয়নকে ইউরোপের **বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিরোধে** লিপ্ত হতে হয়। এই উপলক্ষে **রোমের পোপের** সঙ্গে তাঁর কলহ হয় এবং পোপের রাজ্য অধিকার করে তিনি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন (১৮১০)। নেপোলিয়নের নিজের ভাই লুই **হল্যাণ্ডে** তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করতে অস্বীকার করায় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নেপোলিয়ন হল্যাণ্ডকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইংলণ্ডের বহুদিনের বন্ধু **পোর্তুগালও** মহাদেশীয় ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করে। নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগাল আক্রমণ ও অধিকার

করেন· এবং তারপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পেনকেও কুক্ষিগত করার জন্য বড় ভাই **জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন** (১৮০৮)। স্পেনের জনসাধারণ এই ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করে এবং শীঘ্রই জোসেফের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক জাতীয় অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ইংলণ্ড মনে করে, মহাদেশীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ করার এই এক স্বর্ণ-সুযোগ। তাই ব্রিটিশ সরকার প্রচুর সৈন্য ও অর্থ দিয়ে স্পেন ও পোর্তুগালে ফরাসী-বিরোধী সংগ্রামে ইন্ধন যোগায়। দীর্ঘস্থায়ী আইবেরীয় **উপদ্বীপের যুদ্ধ** (Peninsular War) এই ভাবে আরম্ভ হয় (১৮০৮)। এতদিন নেপোলিয়নের যে সৈন্যবাহিনী স্থলযুদ্ধে অপরাজেয় ছিল, স্পেন ও পোর্তুগালে জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে তা অবশেষে পরাজয় বরণ করে। বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প জাতীয় প্রতিরোধের এই সাফল্য ইউরোপে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। জাতীয় প্রতিরোধের ভাব ক্রমশঃ স্পেন থেকে জার্মানী ও রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁর নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবার নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নেপোলিয়ন এবারও তাঁকে **ওয়াগ্রামের** (Wagram) **যুদ্ধে** চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করে অপমানজনক **ভিয়েনার সন্ধি** স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া তার রাজ্যের এক বিরাট অংশ ফ্রান্সকে ছেড়ে দেয়, এবং অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী মারী লুইসের (Marie Louise) সঙ্গে নেপোলিয়নের বিবাহ হয় (১৮১০)। প্রাচীন হ্যাপস্‌বার্গ বংশের সঙ্গে এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে নেপোলিয়নের গৌরব আরো বৃদ্ধি পায়, এবং পরবর্তী চার বৎসর অষ্ট্রিয়া আর ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের পর কিন্তু নেপোলিয়নের রাজনৈতিক বা সামরিক সাফল্য আর তেমন দেখা যায়নি।

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ (১৮০৯)

টিলসিটের সন্ধি স্বাক্ষর করলেও রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থা মানতে রাজী ছিলেন না। স্পেনের সঙ্গে নেপোলিয়নের দুর্ব্যবহারও জার ভাল মনে গ্রহণ করেননি। আরো কয়েকটি ব্যাপারে মতভেদের ফলে জার নেপোলিয়নের বিষদৃষ্টিতে পড়েন এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট তাঁর 'বিশাল সৈন্যবাহিনী' নিয়ে **রাশিয়া আক্রমণ** করেন। অতর্কিত আক্রমণের ফলে প্রথম দিকে রুশ সৈন্যবাহিনী ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করতে থাকে এবং নেপালিয়ন মস্কো নগরী পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু এরপর প্রচণ্ড শীত, খাদ্যাভাব এবং রুশ জনগণের গেরিলা যুদ্ধের (Guerilla

নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ

War) ফলে নেপোলিয়ন সসৈন্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। এই অভিযানের ফলে তাঁর বহু সৈন্যক্ষয় হয় এবং দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবে খ্যাতিও ম্লান হয়ে যায়। নেপোলিয়নের 'বিশাল সৈন্যবাহিনী' আর কখনো তার আগেকার বল ফিরে পায়নি।



রুশ অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়নের পতনকে এগিয়ে নিয়ে আসে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রাশিয়ার রাজাও রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এর পর ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং সুইডেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে **চতুর্থ শক্তিসঙ্ঘ** (Fourth Coalition) গঠন করে ও ইউরোপের মুক্তি-সংগ্রাম (War of Liberation) শুরু হয়ে যায়। **লিপজিগের যুদ্ধে** (Battle of Leipzig) নেপোলিয়ন জার্মান সৈন্যদের কাছে প্রথম পরাজিত হন। এর ফলে শুধু যে জার্মানী তাঁর কবলমুক্ত হয়, তা নয়, মধ্য ইউরোপে ফরাসী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করে ; ইংলণ্ডও তাদের সাহায্য করতে থাকে। রণক্লান্ত ফরাসী সৈনিকেরা এই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। অল্পদিনের মধ্যে রাজধানী প্যারিসও বিপন্ন হয়। **নেপোলিয়ন** তখন ফরাসী সিংহাসনে তাঁর সমস্ত দাবী ত্যাগ করে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত **এল্‌বা** (Elba) **দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন** (এপ্রিল, ১৮১৪)। তিনি তাঁর পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করলেও বিজয়ী শক্তিবর্গ তাঁর এই শেষ ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সের শেষ বুর্বোঁ রাজা ষোড়শ লুই-এর ভাই **অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসান**। **প্যারিসের প্রথম সন্ধির** দ্বারা ফ্রান্সের সীমারেখা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবের সময় যেখানে ছিল সেখানেই সরিয়ে দেওয়া হয় (১৮১৪)।

চতুর্থ শক্তিসঙ্ঘ গঠন

নেপোলিয়নের পতন

নেপোলিয়ন কিন্তু বেশি দিন এল্‌বার অধিপতি হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি সহসা এল্‌বা ত্যাগ করে ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হন এবং ফরাসী জাতি তাঁকে আবার সাদর অভ্যর্থনা জানায় ও সম্রাট হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু বিজয়ী শক্তিবর্গ তাঁর এই প্রত্যাবর্তন মেনে না নেওয়ায় অবিলম্বে যুদ্ধ বাধে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে **ওয়াটার্লু্র যুদ্ধে** (Battle of Waterloo) ব্রিটিশ সেনাপতি **ওয়েলিংটন** (Wellington) ও প্রাশিয়ার সেনাপতি **ব্লুকারের** (Blucher) হাতে তিনি চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হন। এর পর ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত **সেণ্ট্‌ হেলেনা** (St. Helena) দ্বীপে বন্দীদশায় জীবনের শেষ কয় বৎসর কাটান। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট্‌ হেলেনাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ (১৮১৫)

নেপোলিয়নের পতনের কারণঃ নেপোলিয়নের পতন তাঁর সামরিক দক্ষতার অভাবে ঘটেনি। তাঁর চেয়ে বড় সমরনায়ক তাঁর বিরোধী পক্ষে একজনও ছিল না। কিন্তু তরবারি দ্বারা অর্জিত সাম্রাজ্য নেপোলিয়ন তরবারির দ্বারা রক্ষা করতে

পারেননি। তাঁর পতনের প্রথম কারণ ছিল **ফরাসী জাতির রণক্লান্ত অবস্থা**। দীর্ঘ বাইশ-তেইশ বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করে তারা শান্তির জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ায় তাঁর 'বিশাল সৈন্যবাহিনী' ক্ষয় পাওয়ার পর নেপোলিয়ন আর অত বড় ও সুশিক্ষিত সেনাদল গড়ে তুলতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থার ফলে তাঁর **সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ** দেখা দেয়। জার্মানী ও ইটালীতে তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্য শোষণের রূপ ধারণ করে। জার্মান রাজারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করে বিপক্ষ দলে যোগ দেয়, যার জন্য লিপ্‌জিগের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তৃতীয়তঃ, **স্পেন, জার্মানী ও রাশিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে যে জাতীয় প্রতিরোধ** দেখা দেয় তাও তাঁর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। নেপোলিয়নের শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গেরিলা যুদ্ধে স্পেনের অশিক্ষিত কৃষক ও গ্রামবাসীদের কাছে পরাজিত হয়। স্পেনের প্রতিরোধকে নেপোলিয়ন তাঁর 'দুষ্টক্ষত' (Spanish Ulcer) বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরে জার্মানী ও রাশিয়াতে আমরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি। এই ধরনের জাতীয় প্রতিরোধ ইউরোপের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি। চতুর্থতঃ, **নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের চারটি বৃহৎ শক্তির মিলন** তাঁর পতনকে এগিয়ে আনে। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মিলিত সামরিক শক্তির কাছে নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। পঞ্চমতঃ, **ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি** নেপোলিয়নের পতনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ। সমুদ্রবক্ষে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে কোনদিন পরাস্ত করতে পারেননি। এই নৌ-শক্তির বলেই ইংলণ্ড নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দেয়। ইংলণ্ডের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যে পুষ্ট হয়ে স্পেনীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে সফল বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বারবার ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ গঠনের পশ্চাতেও ইংলণ্ডের উৎসাহ ও প্ররোচনা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সব শেষে বলা যায় যে, **নেপোলিয়নের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাস্তববুদ্ধির অভাব** তাঁর পরাজয়ের জন্য দায়ী। দীর্ঘকাল সারা ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি তাঁর অদূরদর্শিতার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। ১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে শত্রুপক্ষ একাধিকবার তাঁকে শান্তি স্থাপনের সুযোগ দিলেও তিনি যে সুযোগ গ্রহণ করেননি। ফ্রান্স আক্রান্ত হওয়ার পরেও তাঁর যুদ্ধের স্পৃহা মেটেনি। এর ফলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ফরাসী জাতির রণক্লান্ত অবস্থা

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ

জাতীয় প্রতিরোধ

বৃহৎ শক্তিদের শত্রুতা

ব্রিটিশ নৌ-শক্তি

নেপোলিয়নের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব-বুদ্ধির অভাব

ইউরোপের উপর ফরাসী বিপ্লবের ও নেপোলিয়নের প্রভাব ঃ ফরাসী বিপ্লবের যে প্রভাব পরবর্তী কালে ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, তা এসেছিল প্রধানতঃ নেপোলিয়নের শাসনের মাধ্যমে বা ঐ শাসনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে। **উদারনীতি** এবং **জাতীয়তাবাদ,** ফরাসী বিপ্লবের এই দুটি ঐতিহ্যই ইউরোপের অধিবাসীদের বহুদিন ধরে অনুপ্রাণিত করে। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি যে সব রাজ্যে নেপোলিয়নের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সব রাজ্যেই **শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ** এবং **আধুনিক আইন-ব্যবস্থা** প্রবর্তিত হয়েছিল। এমন কি ইউরোপের যে সব অঞ্চলে নেপোলিয়নের প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপিত হয়নি, সেখানেও নেপোলিয়নের অনুগত রাজারা **সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ** সাধন করে অপেক্ষাকৃত উদার শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ফরাসী বিপ্লব যে **গণতান্ত্রিক শাসন, সামাজিক সাম্য ও ধর্ম-সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য** সৃষ্টি করেছিল, ইউরোপের জনসাধারণ তার দ্বারা অবিলম্বে উপকৃত না হলেও তাকে সহজে ভুলতে পারেনি, এবং পরবর্তী কালে এই উদারনৈতিক আদর্শ **ইউরোপে একাধিক বিপ্লবের প্রেরণা দেয়।** প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার রাজারা বারবার নেপোলিয়নের দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হলেও তাঁর শাসন-ব্যবস্থার ভালো দিকটি গ্রহণ করে নিজেদের রাজ্যকে শক্তিশালী করতে সঙ্কোচ বোধ করেনি।

উদারনীতি

কিন্তু **জাতীয়তাবাদের** যে শিক্ষা ফ্রান্স ইউরোপের অন্যান্য দেশকে দিয়েছিল তার প্রভাব ছিল আরো ব্যাপক ও গভীর। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি জাতি কতদূর সাফল্য অর্জন করতে পারে ফরাসীরা তার দৃষ্টান্তস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া ইউরোপের যে সব রাজ্যকে তারা পদানত করার চেষ্টা করেছিল সে সব রাজ্যেও ফরাসী-বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়। **স্পেন ও জার্মানীতে এই জাতীয় জাগরণ** সব চেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল। রাশিয়া ও ব্রিটেনের জনগণ এই জাতীয় ভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালায়। এমন কি ইটালী ও পোল্যাণ্ডে নেপোলিয়ন তাঁর অনুগত যে রাজ্যগুলি স্থাপন করেছিলেন সেগুলির মাধ্যমেও জাতীয়তাবোধের প্রসার হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে নেপোলিয়ন যা কখনো চাননি তারই প্রতিষ্ঠা তাঁর কাজের ফলে হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইউরোপের পুনর্গঠন (১৮১৫-৩০)
(Reconstruction of Europe)

ভিয়েনা চুক্তি (১৮১৫): নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রনায়কেরা যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হন। ইতিহাসে এই সম্মেলন **ভিয়েনা কংগ্রেস** (Vienna Congress) নামে পরিচিত। যদিও তুরস্ক ছাড়া ইউরোপের আর সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন, তবু নেপোলিয়ন-বিজেতা চারটি প্রধান রাষ্ট্র ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরাই এতে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রাশিয়ার জার **প্রথম আলেকজাণ্ডার**, অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী (Chancellor) **মেটারনিক** (Metternich) এবং ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী **ক্যাসল্‌রি** (Castlereagh) ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ্চর্যের বিষয়, বিজিত রাজ্য ফ্রান্সের প্রতিনিধি, নেপোলিয়নের প্রাক্তন বৈদেশিক মন্ত্রী **ট্যালের**াঁও (Talleyrand) এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ

ভিয়েনা কংগ্রেসের **প্রধান লক্ষ্য** ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করা। দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনার পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি এক আন্তর্জাতিক সন্ধির সর্ত হিসাবে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি **তিনটি মূল নীতির** উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল: প্রথমটি ন্যায্য অধিকারের নীতি (principle of legitimacy), দ্বিতীয়টি শক্তি-সাম্যের (balance of power) নীতি এবং তৃতীয়টি বিজিত শক্তিদের শাস্তিদান ও বিজেতাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি (principle of punishment and compensation)।

সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ও নীতি

ন্যায্য অধিকার নীতির মূল কথা ছিল এই যে ফরাসী বিপ্লবের আগে ইউরোপের যে দেশে যে রাজবংশ রাজত্ব করত, সেই দেশে সেই রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিপ্লব যদি কোন পরিবর্তন এনে থাকে, তা স্বীকার করা হবে না।

ফরাসী প্রতিনিধি ট্যালেরাঁই ছিলেন এই নীতির প্রধান প্রবক্তা। এই নীতির অনুসরণে ফ্রান্স, স্পেন ও নেপ্‌লসে বুর্বোঁ (Bourbon) রাজবংশকে সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টে স্যাভয় (Savoy) রাজবংশকে এবং হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ (Orange) রাজবংশকে পুনঃস্থাপিত করা হয়। পোপ এবং জার্মানীর রাজারাও নিজ নিজ রাজ্য ফিরে পান। সুইজারল্যাণ্ডকে চির-নিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

ন্যায্য অধিকার নীতি

শক্তিসাম্যের নীতি অনুসারে ইউরোপের কোন একটি রাষ্ট্র যাতে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ভবিষ্যতে অন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ইউরোপে ফরাসী-আধিপত্য পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা দূর করাই এই নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের যে সীমানা ছিল সেই সীমানাই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়; যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ তার কাছ থেকে আদায় করা হয়; এবং নেপোলিয়ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পকলার যে সব নিদর্শন প্যারিসে এনে সাজিয়েছিলেন সেগুলি যে যে দেশের সম্পদ ছিল, সেই দেশগুলিকে প্রত্যর্পণ করা হয়। এ ছাড়া ফ্রান্সের চারদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়, যাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স সহজে তার প্রতিবেশী রাজ্যদের আক্রমণ করতে সাহস না পায়। এই কারণেই উত্তর দিকে বেলজিয়ামকে অষ্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং পূর্ব দিকে প্রাশিয়াকে রাইন নদী বরাবর কিছু অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে শক্তিশালী প্রাশিয়া ফ্রান্সের আগ্রাসী নীতিতে বাধা দিতে পারে। সে সময় অবশ্য কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, ভবিষ্যতে প্রাশিয়াই এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গড়ে তুলে ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত করবে। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে একই উদ্দেশ্যে সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের সঙ্গে জেনোয়াকে (Genoa) যুক্ত করা হয়।

শক্তিসাম্যের নীতি

বিজিত রাষ্ট্রদের শাস্তিদান ও বিজেতাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করাই বোধ হয় ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রধান নীতি ছিল। এই নীতি অনুসারে **রাশিয়া** পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ, ফিনল্যাণ্ড (Finland) ও বেসারাবিয়া (Bessarabia) লাভ করল। **প্রাশিয়া** পেল জার্মানীর কয়েকটি রাজ্যখণ্ড, যেমন পমেরানিয়া (Pomerania), স্যাক্সনী (Saxony) ও রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং পোল্যাণ্ডের অংশ-বিশেষ। **অস্ট্রিয়ার** ভাগ্যে মিলল উত্তর ইটালীর লম্বার্ডি (Lombardy) ও ভেনিসিয়া (Venetia) এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়দের দেওয়া হল মধ্য ইটালীতে টাস্কানি (Tuscany), পার্মা

বিজয়ী রাষ্ট্রদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা

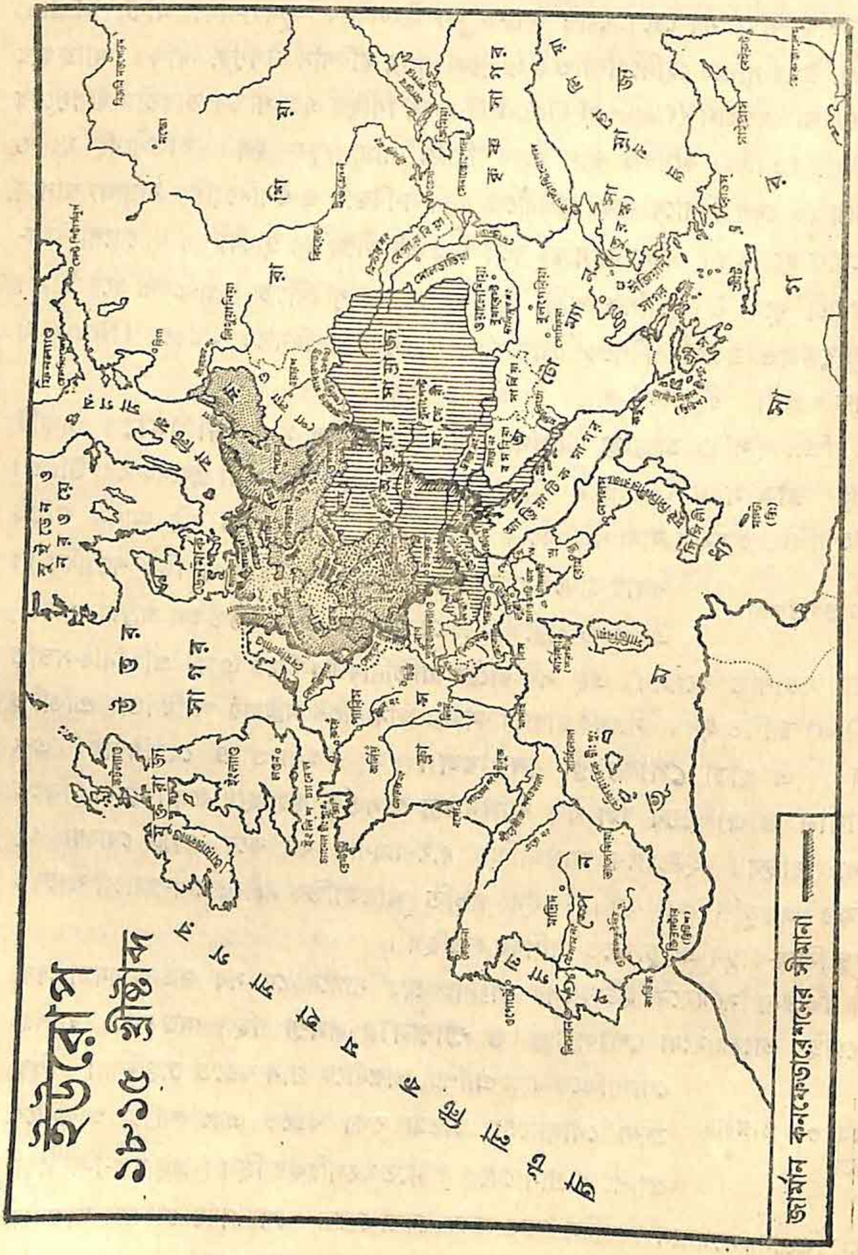
(Parma), মডেনা (Modena) প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার দ্বারা সব চেয়ে বেশি উপকৃত হল **ইংলণ্ড**। ভূমধ্যসাগরে মাল্টা (Malta) দ্বীপ, উত্তর সাগরে হেলিগোল্যাণ্ড (Heligoland), মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope), সিংহল এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (West Indies) কয়েকটি দ্বীপ এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হল। ইতিপূর্বেই ইংলণ্ড শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য-বিস্তার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। ভিয়েনা সন্ধির ফলে তার এই কাজে খুব স্থবিধা হল। নেপোলিয়ন-পরবর্তী যুগে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংলণ্ড পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। **সুইডেন**ও ফ্রান্সের বিপক্ষে যোগ দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে নরওয়ে (Norway) লাভ করল। এই দেশটি আগে ডেনমার্কের অংশ ছিল।

অন্যান্য সর্তাবলী

ভিয়েনা সন্ধির **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সর্তগুলির** মধ্যে **জার্মানীতে একটি নতুন রাজ্যসঙ্ঘ** (German Confederation) স্থাপনের কথা প্রথমেই বলা উচিত। নেপোলিয়নের সময়ে নানা পরিবর্তনের ফলে জার্মানীতে মোট ৩৮টি রাষ্ট্র আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল (তার আগে এই সংখ্যা ছিল শতাধিক)। এই ৩৮টি রাষ্ট্রকে নিয়ে যে রাজ্যসঙ্ঘ এখন গঠিত হল অষ্ট্রিয়ার সম্রাটই তার সভাপতি হলেন। এই সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি-সভাও (Diet) স্থাপিত হল। সঙ্ঘের মাধ্যমে কার্যতঃ জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া **পোল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্** (হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম) এবং **জার্মান রাজ্যসঙ্ঘে লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তন** করা হবে বলে ভিয়েনা চুক্তিতে বলা হয়েছিল। ইউরোপে আন্তর্জাতিক দাস-ব্যবসায় বন্ধ করে একটি ঘোষণা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাইন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক নদীতে নৌ-চলাচল সম্বন্ধেও কিছু নিয়ম-কানুন এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

পোল্যাণ্ড ও স্তাক্সনীর সমস্যা

ভিয়েনা সম্মেলনে ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কদের সামনে যে সব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে **পোল্যাণ্ড ও স্তাক্সনীর সমস্যা** ছিল অন্যতম। রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে এবং প্রাশিয়া স্তাক্সনীকে গ্রাস করতে চাইছিল। কিন্তু ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে এবং অষ্ট্রিয়া স্তাক্সনীকে প্রাশিয়ার গ্রাস থেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর ছিল। এই মত-বিরোধের ফলে ভিয়েনা সম্মেলনে কিছুদিন অচল অবস্থা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রাশিয়া স্তাক্সনীর দুই-তৃতীয়াংশ এবং রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল লাভ করে, আর পোল্যাণ্ড রাশিয়ার জারের অধীনে, কিন্তু রাশিয়া থেকে স্বতন্ত্র একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।


ইউরোপ
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ
জার্মান কনফেডারেশনের সীমানা

ভিয়েনা সন্ধির সমালোচনা ঃ ভিয়েনা সন্ধিকে কখনো **একটি লজ্জাকর প্রতারণা বা বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা** বলে বর্ণনা করা হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের জনসাধারণের মনে যে সব রাজনৈতিক উচ্চাশা জেগেছিল সেগুলি সফল না হওয়ার জন্যই এই অভিযোগ ওঠে। বিশেষতঃ, জার্মানী ও ইটালীর উদারপন্থী (Liberal) নেতারা এই সন্ধিতে মর্মাহত হন। ঐ দুই দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা অথবা সেখানে উদার, নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের জন্য ভিয়েনা সন্ধিতে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। বস্তুতঃ, ভিয়েনা চুক্তির কোন সর্তই জনগণের ইচ্ছাপূরণের জন্য গৃহীত হয়নি, যদিও নেপোলিয়নের পতনের জন্য স্পেন, জার্মানী ও রাশিয়ায় জনগণের প্রতিরোধ বিশেষভাবে দায়ী ছিল।

প্রতারণার অভিযোগ

কিন্তু ভিয়েনা সন্ধিকে আমরা উদার বা প্রগতিশীল ব্যবস্থা বলে মনে না করলেও **তাকে প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করতে পারি না।** প্রথমতঃ, এই সন্ধির দ্বারা বিজয়ী শক্তিবর্গ তাদের পূর্ব-প্রদত্ত কোন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেয়নি। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ চলার সময় বিজয়ী শক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যে কতকগুলি গোপন চুক্তি হয়েছিল। এই সব চুক্তির ভিত্তিতেই নেপোলিয়ন-বিরোধী বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। ভিয়েনা সন্ধির অনেকগুলি সর্ত এই সব চুক্তি থেকে গৃহীত হয়েছিল। জার্মানীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জার্মান রাজ্যসঙ্ঘ গঠন, স্পেনে বুর্বোঁ রাজবংশের প্রত্যাবর্তন, সুইডেনকে নরওয়ে দান, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সংযুক্তি, সুইজারল্যাণ্ডকে চির-নিরপেক্ষ রাখার প্রস্তাব—এ সবই আগে হতে ঠিক করা ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয়তঃ, ভিয়েনা সম্মেলনে যে চারটি প্রধান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের কোনটাই বিশেষ প্রগতিশীল ছিল না। মেটারনিক ও ক্যাসল্‌রির মতো রাষ্ট্রনায়কেরা, যাঁরা আপন দেশে উদারনীতির (Liberalism) ঘোর শত্রু ছিলেন, কখনোই ইউরোপের পুনর্গঠন-ব্যবস্থা উদারনীতির ভিত্তিতে করতে পারতেন না। ভিয়েনা সন্ধিতে ইউরোপের শান্তিরক্ষার ভার যে সব প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর দেওয়া হয়েছিল তাদের পতনের ফলেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক চরিত্রের 'ভার্সাই সন্ধি' সম্ভব হয়। সব শেষে, আমাদের মনে রাখা উচিত যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে উদারনীতি ছিল ইউরোপে 'সংখ্যালঘুর ধর্ম' (Religion of the Minority)। অতি অল্প-সংখ্যক রাজনীতিবিদই এতে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং এই নীতির সপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা তখন সম্ভব ছিল না। সুতরাং

ঐ অভিযোগের অসারতা

ভিয়েনা চুক্তিকে আমরা সেই যুগের প্রচলিত ধারণার অনুগামী ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে পারি। নতুন যুগের আদর্শ এতে প্রতিফলিত হয়নি।

এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে ভিয়েনা চুক্তির কয়েকটি সর্ত **ভবিষ্যতে ইউরোপে বিরাট পরিবর্তন আনার সহায়ক** হয়েছিল। ভিয়েনা চুক্তিতে ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে সার্ডিনিয়া রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা হয়। পরবর্তী কালে **সার্ডিনিয়াই ইটালীর ঐক্যবিধানে অগ্রণী** হয়, এবং স্যাভয় রাজবংশের নেতৃত্বেই স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ইটালী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ ভাবে, ভিয়েনা চুক্তিতে ফ্রান্সের পূর্বদিকে যে প্রাশিয়া রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা হয়েছিল, সেই **প্রাশিয়াই পরে জার্মানীর ঐক্যবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়,** এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে নতুন ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে।

ভিয়েনা সন্ধির মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার অনুকূলে জার্মানীর রাইন অঞ্চল ত্যাগ করে ও তার পরিবর্তে ইটালীর কয়েকটি রাজ্য লাভ করে। এর ফলে পরবর্তী কালে **জার্মান সাম্রাজ্য থেকে অস্ট্রিয়াকে বহিষ্কার** করা সহজ হয়। এ ছাড়া বৃহৎ শক্তি হিসাবে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা, পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যের অবসান ইত্যাদি কয়েকটি বাস্তব সত্যকে ভিয়েনা চুক্তি কাগজেকলমে স্বীকার করে নেয়। সবার উপরে একথা আমরা নিশ্চয় বলতে পারি যে, এই চুক্তি সম্পাদিত হবার পর অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর ইউরোপে কোন বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। ভিয়েনা চুক্তি **আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার সহায়ক** হয়েছিল।

ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, এই চুক্তিকে কখনোই একটি **স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না**। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে যে জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতির আদর্শ স্থাপন করেছিল তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শক্তিসাম্য ও ন্যায্য অধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মেটারনিক ও ক্যাসল্‌রির মতো রাষ্ট্রনায়কেরা এক বিরাট ভুল করেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন এই শক্তিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই ভিয়েনা চুক্তির সংশোধন ও পরিবর্তন করতে হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস অনেকটাই ভিয়েনা চুক্তিকে নস্যাৎ করার কাহিনী। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পৃথকীকরণ, ফ্রান্স হতে বুর্বোঁ বংশের বিতাড়ন, ইটালীতে ও জার্মানীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সুইডেনের সঙ্গে নরওয়ের বিচ্ছেদ, এ সব পরিবর্তনই ভিয়েনা চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে সাধিত হয়েছিল।

সন্ধি স্থায়ী হয়নি কেন?

ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ (Concert of Europe)

শক্তিসঙ্ঘের পরিকল্পনা ঃ ভিয়েনা চুক্তি, যতদূর সম্ভব, ইউরোপে বিপ্লব-পূর্ব যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিপ্লবের ভয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ শক্তিগুলি এতই ভীত ছিল যে, স্থায়ী ভাবে বিপ্লব প্রতিরোধ ও ভিয়েনা চুক্তিকে ইউরোপের নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তারা একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি শক্তিসঙ্ঘ গঠনের আয়োজন হয়। অবশ্য এ ধরনের পরিকল্পনা ইউরোপের ইতিহাসে একেবারে নতুন ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী রাজ চতুর্থ হেনরীর 'গ্র্যাণ্ড ডিজাইন' (Grand Design) নামে পরিকল্পনার মূল কথা ছিল এই ধরনের শক্তিসঙ্ঘ গঠন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant) ও ফরাসী বিপ্লবের যুগের অন্যতম বিপ্লবী কনডোরসে (Condorcet) এই ধরনের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ভিয়েনা চুক্তিতে কোন ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ স্থাপনের কথা বলা হয়নি। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সে চেষ্টা করা হয়।

শক্তিসঙ্ঘ স্থাপনের পূর্ব প্রচেষ্টা

ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ স্থাপনের দুটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে উপস্থাপিত করেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ও ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী ক্যাসল্‌রি। আলেকজাণ্ডারের **পবিত্র মৈত্রীর** (Holy Alliance) পরিকল্পনায় বলা হয় (সেপ্টেম্বর, ১৮১৫) যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং প্রজাদের সঙ্গে পিতার ন্যায় ব্যবহার করবে। প্রজা-শাসন এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, দুই ব্যাপারেই তারা খ্রীষ্টধর্মের মূল অনুশাসনগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে। আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাবিত এই মৈত্রীচুক্তিতে পোপ এবং তুরস্কের সুলতান ছাড়া ইউরোপের আর সব রাজারাই স্বাক্ষর করে, কিন্তু আলেকজাণ্ডার নিজে ছাড়া আর কেউই একে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। ক্যাসল্‌রি এই পরিকল্পনাকে 'অত্যুচ্চ অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অর্থহীন প্রলাপের মিশ্রণ' ('a piece of sublime mysticism and nonsense') বলে বর্ণনা করেন, আর মেটারনিক একে বিদ্রূপ করে বলেন 'জোর-আওয়াজের বাজে কথা' ('a loud-sounding nothing')। আলেকজাণ্ডারের ব্যক্তিগত আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এই চুক্তি কোনদিনই বাস্তবে পালিত হয়নি।

পবিত্র মৈত্রীর পরিকল্পনা

ক্যাসল্‌রির প্রস্তাবিত **চতুঃশক্তি মৈত্রীর** (Quadruple Alliance) পরিকল্পনা কিন্তু বাস্তব-ভিত্তিক ছিল। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে (নভেম্বর, ১৮১৫),

ইউরোপের চারটি প্রধান রাষ্ট্র, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া, মিলে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করবে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধ ও ইউরোপের আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা। এই উদ্দেশ্যে চারটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মধ্যে মধ্যে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। বিশেষতঃ, যখনই ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তখনই তারা এই ভাবে মিলিত হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই চতুঃশক্তি মৈত্রীই **ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের** (Concert of Europe) ভিত্তি হয়।

চতুঃশক্তি মৈত্রীর তাৎপর্য

শক্তিসঙ্ঘের ইতিহাস : চতুঃশক্তি মৈত্রী স্বাক্ষরিত হবার পরবর্তী দশ বৎসর কাল ইউরোপের ইতিহাসে 'বৃহৎ শক্তি সম্মেলনের যুগ' (Age of Congresses) নামে পরিচিত। এই **সম্মেলনগুলির মধ্যে প্রথমটি** আহূত হয় **১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে** জার্মানীর **আয়-লা-শ্যাপেল** (Aix-la-Chapelle) শহরে। এই সম্মেলনে ফ্রান্সকে ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের পঞ্চম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে ফ্রান্স তার বিজেতা শক্তিদের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য টাকার সবটাই দিয়ে দিয়েছিল। জার আলেকজাণ্ডার এই সম্মেলনে প্রস্তাব করেন যে ইউরোপের সব কটি রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি সার্বজনীন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Universal Union) গঠন করা হোক, এবং ইউরোপের সর্বত্র শান্তি রক্ষার দায়িত্ব এই সঙ্ঘ গ্রহণ করুক। কিন্তু ক্যাসল্‌রির বিরোধিতায় এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায়নি। ক্যাসল্‌রি কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানতেন যে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ প্রধানতঃ ইউরোপের বাইরে, এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও ইউরোপের কোন দেশে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন হলে তা দমন করার জন্য সাহায্য দেবে না।

আয়-লা-শ্যাপেলের সম্মেলন (১৮১৮)

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাসল্‌রির মতামত প্রাধান্য পেলেও এর পর থেকে ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ ধীরে ধীরে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী **মেটারনিকের** নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মেটারনিক সব রকম উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইউরোপের কোন দেশে যাতে বিপ্লব না ঘটতে পারে এবং প্রাচীন রাজবংশগুলির অধীনে স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে **ট্রপো** (Troppau) শহরে **শক্তিসঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন** বসে। ইতিমধ্যে ইটালীর **নেপ্‌লস্‌ রাজ্যে** প্রজা-বিদ্রোহের ফলে

ট্রপো সম্মেলন (১৮২০)

সেখানকার রাজার অধীনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮২০)। নেপল্‌সের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার আগে থেকেই একটি চুক্তি ছিল, যার বলে নেপল্‌সে কোন বিদ্রোহ ঘটলে, বা বলপূর্বক সেখানকার শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা হলে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট সেই বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন। কিন্তু মেটারনিক এ ব্যাপারে এককভাবে অগ্রসর না হয়ে সমগ্র ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘকেই বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন এবং একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে একটি সাধারণ নীতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেন। জার আলেকজাণ্ডারও এ বিষয়ে তাঁর সহায় হলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘে গৃহীত **ট্রপোর প্রস্তাবে** (Troppau Protocol) বলা হল যে ইউরোপের যে কোন দেশে বিদ্রোহ বা বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা হলে তাকে বে-আইনী বলে গণ্য করা হবে, এবং ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে। ট্রপো সম্মেলনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কিন্তু অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা ভোটাধিক্যে তাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

ট্রপো প্রস্তাব

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে **লাইবাক** (Laibach) শহরে **ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের তৃতীয় সম্মেলন** বসে। নেপল্‌সের রাজা প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ড (Ferdinand I) এই সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং তাঁকে তাঁর আগেকার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার জন্য ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গকে অনুরোধ করেন। ইংলণ্ডের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই সম্মেলন অষ্ট্রিয়াকে নেপল্‌সের বিদ্রোহ দমনের অনুমতি দেয়, এবং অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ফার্ডিন্যাণ্ড শীঘ্রই আবার তাঁর পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পান। উত্তর ইটালীর **পীডমণ্ট** (Piedmont) রাজ্যেও নেপল্‌সের অনুরূপ একটি **অভ্যুত্থান** ঘটে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। এ ক্ষেত্রেও লাইবাক সম্মেলনের অনুমতিক্রমে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করে পীডমণ্টের স্বৈরাচারী রাজাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

লাইবাক সম্মেলন (১৮২১)

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে **ভেরোনা** (Verona) শহরে **ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের চতুর্থ অধিবেশন** বসে। ফ্রান্সে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র রাজতান্ত্রিক দল (Ultra-royalists) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দলের প্রভাবে ফরাসী সরকার এখন চাইল প্রতিবেশী রাষ্ট্র **স্পেনে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের** ফলে যে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে অপসারণ করে, সেখানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন করতে।

ভেরোনা সম্মেলন (১৮২২)

ট্রপোর প্রস্তাবের অনুসরণে ফরাসী সরকারকে এই অনুমতি দেওয়া হল। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি ডিউক অব ওয়েলিংটন (Duke of Wellington) এতে তীব্র আপত্তি জানালেন কিন্তু তাঁর আপত্তি সরাসরি অগ্রাহ্য করা হল। ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী ক্যানিং-এর (Canning) নির্দেশক্রমে ওয়েলিংটন ভেরোনা সম্মেলন ত্যাগ করে এলেন, এবং ইংলণ্ডও এই ঘটনার পর ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করল। ফরাসী সৈন্যবাহিনী অবশ্য স্পেনে প্রবেশ করে স্বৈরাচারী বুর্বোঁ রাজা সপ্তম ফার্ডিন্যাণ্ডকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল।

ইংলণ্ডের শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ (১৮২২)

স্পেনের বিদ্রোহ দমন করার পর ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ চাইল দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে দমন করে বশে আনতে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেই এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব হল, কিন্তু এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড উভয়ে সমবেত ভাবে ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এল। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President) **জেমস মনরো** (James Monroe) যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা বা 'কংগ্রেসে' (Congress) প্রেরিত এক বাণীতে জানালেন যে আমেরিকা ভূখণ্ডে ইউরোপীয় শক্তিদের হস্তক্ষেপ বা উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈরিসুলভ কাজ বলে মনে করবে ও তাকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেবে। এই **মনরো নীতি** (Monroe Doctrine) বহুকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল। ইংলণ্ডও অবিলম্বে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের এইবার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও সে প্রতিবাদ নিষ্ফল হল, কারণ অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলি অধিকার করার মতো নৌ-বল তাদের কারো ছিল না।

মনরো নীতি ঘোষণা (১৮২৩)

শক্তিসঙ্ঘের পতন

শক্তিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ: বিপ্লব দমনে ব্যর্থতার জন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পরই **ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের কার্যতঃ অবসান** ঘটল। শক্তিসঙ্ঘের পতনের কারণগুলি আলোচনা করলে প্রথমেই যে কারণটিকে এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়, তা হচ্ছে **বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থের সংঘাত**। ইংলণ্ড প্রথম থেকেই মেটারনিকের হস্তক্ষেপ নীতির (policy of intervention) বিরোধী ছিল—শুধু তার উদারনৈতিক ঐতিহ্যের জন্য নয়, এই নীতি তার বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে। ইংলণ্ড জানত যে তার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিস্তারের ক্ষেত্র প্রধানতঃ ইউরোপের বাইরে। এই

বৃহৎ শক্তিদের স্বার্থের সংঘাত

অবস্থায় সে যদি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যায়, তাহলে ইউরোপীয় রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়ে তার বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা ব্যাহত হবে। এই কারণেই সে ইউরোপে মেটারনিক-নীতির বিরোধিতা করে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া, এই তিনটি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, তাদের নিজেদের স্বার্থেই ইউরোপের সর্বত্র বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করে। এক দেশে বিপ্লব ও গণতন্ত্রের জয় হলে অন্য দেশেও তার প্রভাব দেখা যাবে, এই ভয় তারা স্বভাবতই পেত। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই স্বার্থের সংঘাত আয়-লা-শ্যাপেলের সম্মেলনেই প্রথম দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী কালে এই সংঘাত আরো বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ইংলণ্ড শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করে চলে আসে এবং নিজস্ব বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে থাকে।

অন্যান্য কারণ

দ্বিতীয়তঃ, **অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে পূর্ব ইউরোপে স্বার্থের সংঘাত** দেখা দেওয়ায় তারা ক্রমশঃ পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আর, ফ্রান্স ও প্রাশিয়া শীঘ্রই তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে অন্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সময় ও সুযোগ তাদের চলে যায়। এই সব কারণেই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর আর শক্তিসঙ্ঘের অস্তিত্বের কথা শোনা যায় না।

মেটারনিকের ব্যবস্থা (Metternich System)

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ত্রিশ বৎসর কাল ইউরোপের ইতিহাসে **মেটারনিকের যুগ** (Age of Metternich) নামে পরিচিত। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক (১৮০৯-৪৮) এই যুগে ইউরোপীয় রাজনীতির মুখ্য নিয়ন্তা ছিলেন, এবং ইউরোপের সর্বত্র তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব অনুভূত হত।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে একটি অভিজাত পরিবারে মেটারনিকের জন্ম হয়। প্রথম জীবনেই তিনি ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতেন; বয়স বাড়ার সঙ্গে এই বিদ্বেষ আরো গভীর হয়। বিবাহসূত্রে তিনি অস্ট্রিয়ায় প্রচুর ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন এবং অস্ট্রিয়া সরকারের কূটনৈতিক দপ্তরে চাকরি পান। অস্ট্রিয়া সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ দেখার সুযোগ হয়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস (Francis I) মেটারনিকের উপরেই রাজ্যশাসনের দায়িত্ব কার্যতঃ সমর্পণ করেছিলেন। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার পর মেটারনিকই

সংক্ষিপ্ত জীবনী

অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে প্ররোচিত করেন ইংলণ্ড, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। এই চতুঃশক্তি মিলনের ফলেই নেপোলিয়নের পতন ত্বরান্বিত হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, ভিয়েনায় ইউরোপীয় শক্তিবর্গের যে সম্মেলন আহূত হয় মেটারনিকই তাতে সভাপতিত্ব করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মেটারনিকের দুজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ও ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী ক্যাসল্‌রি। কিন্তু কালক্রমে মেটারনিকের প্রভাব এঁদের দুজনের প্রভাবকে ছাড়িয়ে যায়, এবং ট্রপো সম্মেলনের (১৮২০) পর ইউরোপে তিনিই সব চেয়ে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রনায়ক রূপে আবির্ভূত হন।

মেটারনিক **অত্যন্ত কর্মক্ষম ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি** ছিলেন। তাঁর **আত্ম-প্রত্যয়ও ছিল অগাধ।** নেপোলিয়নের পতনের জন্য সব কৃতিত্বটুকুই তিনি দাবী করতেন এবং নিজেকে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর ত্রাণকর্তা বলে মনে করতেন। নিজের নীতির অভ্রান্ততায় তাঁর বিশ্বাস কোনদিন টলেনি। এমন কি, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে ক্ষমতাচ্যুত ও স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হবার পরেও তিনি বলতেন যে তাঁর মন কোনদিন ভুল ধারণা পোষণ করেনি ('My mind has never entertained error.')। তাঁর এই উক্তি একদিকে যেমন তাঁর দৃঢ়চিত্ততার পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি তাঁর অদূরদর্শিতার সাক্ষ্যও বহন করে। তবে কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি সত্যই ছিলেন অসাধারণ। শুধু কূটনীতির দ্বারা ইউরোপকে যতদিন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর ছিল, ততদিন তিনি তা করেছিলেন।

মেটারনিকের চরিত্র

মেটারনিকের রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রতিক্রিয়াশীল হলেও অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল। তাঁর **কূটনীতির দুটি প্রধান উদ্দেশ্য** ছিল—**ইউরোপে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা** এবং **ভিয়েনা চুক্তির (১৮১৫) ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা** করা। তিনি জানতেন যে অষ্ট্রিয়ার বহুজাতি-অধ্যুষিত ও বহুভাষা-ভাষী (জার্মান, ম্যাগিয়ার, চেক, শ্লাভ, শ্লোভাক প্রভৃতি) সাম্রাজ্যে যদি জাতীয়তাবাদের বীজ একবার প্রবেশ করে তাহলে সে সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। তাঁর এ ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য ছিল পরবর্তীকালের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তিতে ইউরোপে শান্তি রক্ষা করতে হলে যে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের আদর্শকে প্রথম থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে, এ কথাও তাঁর জানা ছিল, কারণ ভিয়েনা চুক্তির প্রধান সর্তগুলি এ দুটি আদর্শকে অগ্রাহ্য করেই রচিত হয়েছিল। তাই তাঁর দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মেটারনিক **জাতীয়তাবাদ, উদারনীতি ও গণতন্ত্রের ঘোর শত্রু** ছিলেন। এইসব কটি

মেটারনিকের উদ্দেশ্য ও মতবাদ

নতুন রাজনৈতিক আদর্শ বা চিন্তাধারার উৎস যে ফরাসী বিপ্লব, এ কথাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই **ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে ছিল তাঁর অন্তহীন ঘৃণা ও বিদ্বেষ।** বিপ্লবপ্রসূত চিন্তাধারাকে তিনি ইউরোপের দুষ্টক্ষত (gangrene) বলে মনে করতেন, এবং প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগের দ্বারাও তাকে ইউরোপ থেকে উৎপাটিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ইউরোপের কোথাও যাতে জাতীয়তাবাদী বা নিয়মতান্ত্রিক সরকারের জন্য আন্দোলন দেখা না দেয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা তাঁর কর্তব্য, অতএব এই ধরনের আন্দোলন দেখা দিলে তাকে তৎক্ষণাৎ সমূলে নাশ করতে হবে, এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে **বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ** করাও অন্যায় হবে না।

বিপ্লব-বিরোধিতা



মেটারনিক

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘকে তিনি ট্রপো প্রস্তাবের মাধ্যমে এই নীতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার মেটারনিকের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হন, এবং প্রাশিয়ার রাজাও তাঁর বৈদেশিক নীতি মেটারনিকের নির্দেশেই পরিচালনা করতেন। এইভাবে মেটারনিক সমস্ত মধ্য ইউরোপে তাঁর একাধিপত্য স্থাপন করেন, এবং তাঁর উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের কার্যক্রম ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে গৃহীত হয়। অবশ্য এখানে বলা উচিত যে ইংলণ্ড ও আংশিকভাবে ফ্রান্স তাঁর প্রভাবের বাইরে ছিল।

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের ভিতরে মেটারনিক সমস্ত উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রচুরসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়, এবং বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করা হয়। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ এই কাজে তাঁর একান্ত সহায়ক হয়েছিল। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির উপর সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। যাতে সেখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রেরা নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত না হয়, সেজন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রমও নির্দিষ্ট করে দেয়। যে কোন ব্যক্তির মধ্যে উদারনৈতিক চিন্তাধারার বিন্দুমাত্র প্রভাব দেখা গেলে, অবিলম্বে তাকে বন্দী করা হত। মেটারনিক পশ্চিম ইউরোপের পার্লামেণ্ট-পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। পশ্চিম ইউরোপের

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নীতি

প্রভাব যাতে অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ না করে, সেজন্য অষ্ট্রিয়ার প্রজাদের দেশের বাইরে যাওয়া এবং বিদেশীদের অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করা, দুয়েরই পথে তিনি নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন।

অষ্ট্রিয়ার বাইরে **জার্মানীতে** মেটারনিক একই নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। জার্মানীর উদারনীতিতে বিশ্বাসী লোকেরা ভিয়েনা চুক্তিতে আদৌ সন্তুষ্ট হয়নি। তারা দেশের নানা স্থানে অসন্তোষ ও আন্দোলন সৃষ্টির জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে চেষ্টা করছিল। প্রধানতঃ সংবাদপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমেই উদারনৈতিক আন্দোলন জার্মানীতে দানা বাঁধছিল। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের ভাবকে জাগ্রত রাখার জন্য জার্মানীর অধ্যাপক ও ছাত্রেরা **বুরশেনশাফ্ট** (Burschenschaft) নামে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। মার্টিন লুথারের প্রোটেস্টান্ট (Protestant) আন্দোলন ও লিপজিগের যুদ্ধে জার্মান সৈন্যদের জয়কে স্মরণ করবার জন্য এই অধ্যাপক ও ছাত্রেরা ওয়ার্টবুর্গ (Wartburg) শহরে এক উৎসবের আয়োজন করে (অক্টোবর, ১৮১৭)। সেখানে দেশপ্রেমের ভাব উদ্বুদ্ধ করার জন্য বহু বক্তৃতার আয়োজন করা হয় এবং বক্তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জার্মানীর ঐক্য দাবী করে বক্তৃতা দেয়। এর কিছুদিন পরেই কোট্‌জ্‌বু (Kotzebue) নামে এক সাংবাদিক গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে এক জার্মান ছাত্রের হাতে নিহত হন। মেটারনিক এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য কার্লসবাড (Carlsbad) শহরে কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন (আগস্ট, ১৮১৯), এবং সেখানে সমস্ত উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য কয়েকটি নির্দেশ গৃহীত হয়। **কার্লস্‌বাডের নির্দেশগুলি** (১৮১৯) (Carlsbad Decrees) অবিলম্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি সভায় (Diet) অনুমোদিত এবং সমস্ত জার্মান রাষ্ট্রে বলবৎ করা হয়। এই নির্দেশগুলিতে বলা হয় যে কোন জার্মান রাষ্ট্রে প্রজাদের দাবী স্বীকার করে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাবে না, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে সেখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদের রাজনীতি-চর্চা বন্ধ করতে হবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হবে, বুরশেনশাফ্ট প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে, এবং গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি ও ষড়যন্ত্র দমন করার জন্য জার্মানীতে একটি বিশেষ সংস্থা (Commission) গড়ে তোলা হবে। প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম (Frederick William III) ইতিপূর্বে তাঁর প্রজাদের লিখিত সংবিধান দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন। মেটারনিকের প্ররোচনায় তিনি তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেন। কার্লস্‌বাডের

জার্মানীতে মেটারনিক-পদ্ধতির প্রয়োগ

কার্লস্‌বাডের নির্দেশ (১৮১৯)

নির্দেশগুলি জার্মানীতে কঠোর ভাবে পালনের ব্যবস্থা করা হয়, এবং তার ফলে পরবর্তী ত্রিশ বৎসর দেশের সর্বত্র প্রগতিমূলক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে **জুলাই বিপ্লবের** (July Revolution) ফলে স্বৈরাচারী বুর্বোঁ রাজবংশের পতন ও লুই ফিলিপের অধীনে সীমিত রাজতন্ত্রের (limited monarchy) প্রতিষ্ঠা হয়। এর পর বেলজিয়ামে ঐ বিপ্লবের প্রভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দেয় ও বেলজিয়াম হল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। এই বিপ্লবের ঢেউ জার্মানীতে এসে লাগলে স্যাক্সনী, হ্যানোভার প্রভৃতি কয়েকটি ছোট জার্মান রাজ্যে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা (Constitutional Government), সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জুরির সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জার্মানীর ঐক্যবিধানের জন্য আন্দোলনও কোন কোন অঞ্চলে দেখা দেয়। মেটারনিক তখন আবার জার্মান প্রতিনিধি সভাকে (Diet) কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন। রাজনৈতিক সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকেও কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীতে মেটারনিকের এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয়েছিল। মেটারনিক জানতেন যে জার্মানীতে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। তাই জার্মানীকে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত একটি দেশ হিসাবেই রাখতে চেষ্টা করেন।

জুলাই বিপ্লবের বিরোধিতা (১৮৩০)

ইটালীতেও মেটারনিক একই দমন নীতির অনুসরণ করেন। ইটালীতে জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারা প্রবেশ করলে উত্তর ইটালীর লম্বার্ডি ও ভেনিশিয়া অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার প্রভুত্ব লোপ পাবে, এ কথা তিনি জানতেন। এই কারণেই তিনি **নেপলস্ ও পীডমণ্টে বিদ্রোহ** দেখা দিলে ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের অনুমতি নিয়ে কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইটালীতে এসে লাগলে মধ্য ইটালীর পার্মা (Parma), মডেনা (Modena) প্রভৃতি কয়েকটি ছোট রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু মেটারনিক ক্ষিপ্রগতিতে সে সব বিদ্রোহ দমন করেন। ইটালীতে বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিচালনা, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও ধর্মীয় মতামতের স্বাধানতা হরণের জন্য মেটারনিক রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের নিয়োগ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা এইভাবে যুক্ত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীতেও মেটারনিক-প্রবর্তিত ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল।

ইটালীতে মেটারনিকের সাফল্য

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেটারনিক যে সাফল্য লাভ করেছিলেন তার প্রধান কারণ এই যে, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ইউরোপ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ায় শান্তির দাবীই সে যুগে প্রাধান্য লাভ করে, এবং মেটারনিকও এই শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতির আদর্শে ইউরোপকে এ সময় পুনর্গঠিত করতে হলে শান্তি বিঘ্নিত হওয়া অনিবার্য ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্ভব ছিল না, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান কোথাও ঘটানো যেত না। ইউরোপে ত্রিশ বৎসর শান্তিরক্ষার চেষ্টা করে মেটারনিক যুগের দাবীই কিছুটা পূরণ করেন। তাছাড়া অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে তখনো হ্যাপসবার্গ রাজবংশের ও তার পৃষ্ঠপোষক রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য ছিল। বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রজাগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা বা নিপীড়িত কৃষককুলের অসন্তোষ তখনো ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি। এইসব কারণেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেটারনিকের পদ্ধতি মধ্য ইউরোপে জয়ী হয়েছিল।

মেটারনিকের সামরিক সাফল্যের কারণ

কিন্তু চিরকাল এই প্রগতিবিরোধী নীতি বলবৎ রাখা মেটারনিকের মতো ধুরন্ধর কূটনীতিকের পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (**February Revolution**) ফলে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে মেটারনিকের ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এরপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অষ্ট্রিয়াকে অপসারিত করে জার্মানীতে ও ইটালীতে ঐক্য স্থাপিত হয় এবং অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যেও হাঙ্গেরী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে (১৮৬৭)। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়া বাদে ইউরোপের অন্যত্র জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতির আদর্শ বহুলাংশে জয়যুক্ত হয়। মেটারনিকের অদূরদর্শিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?

মেটারনিকের অন্তিম ব্যর্থতা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপ্লব ও তার প্রতিক্রিয়া
(Revolution and Reaction)

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব (১৮৩০) (July Revolution)

বুর্বোঁ রাজতন্ত্রের সমস্যা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফ্রান্সের ইতিহাস বহুলাংশে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসেরই অনুবর্তন মাত্র। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে স্বৈরাচারী বুর্বোঁ রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছিল, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা চুক্তি তাকে আবার ফিরিয়ে আনে। কিন্তু পুনঃস্থাপিত এই বুর্বোঁ রাজবংশের পক্ষে বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সকে শাসন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। প্রথমতঃ,

জাতীয় অপমান

ভিয়েনা চুক্তিতে ফ্রান্সের যে জাতীয় অবমাননা হয়েছিল, বুর্বোঁ রাজারা যেন তারই প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। বিপ্লবের যুগে ফ্রান্স প্রতিবেশী দেশগুলির যে সব অঞ্চল জয় করেছিল, সেগুলি সবই তাকে প্রত্যর্পণ করতে হয়। ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘেও তাকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে স্থান দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের ভিতরে এই সময় এক **তীব্র দলগত সংঘর্ষ** দেখা দেয়। এই দলগত সংঘর্ষে একদিকে ছিল **Liberal** বা উদারনীতিতে বিশ্বাসী দল, যাদের মধ্যে আবার **Republican** বা প্রজাতন্ত্রী, **Democrat** বা গণতন্ত্রী এবং **Bonapartist** বা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অনুগামী, এই তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অপর দিকে ছিল **Ultra-Royalist** বা রাজতন্ত্রের চরম সমর্থক দল, যা প্রধানতঃ অভিজাত এবং যাজক শ্রেণীর লোকেদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল,

দলীয় সংঘর্ষ

এবং যাদের পরিহাস করে বলা হত 'রাজার চেয়েও বেশি রাজভক্ত'। এই দুই পরস্পরবিরোধী দলের সংঘর্ষ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, এদের দুটি ভিন্ন এবং শত্রু জাতির লোক বলেই মনে হত। এরা ছাড়া একটি মধ্যপন্থী (Centrist) দলও ছিল, যাদের দলগত চরিত্র খুব সুস্পষ্ট ছিল না, কিন্তু তারা সব ব্যাপারেই অন্য দুটি দলের মাঝামাঝি মত পোষণ করত। নতুন বুর্বোঁ রাজা অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) উদারপন্থী বা চরম রাজতন্ত্রী কোন দলকেই সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারতেন না। উদারপন্থীদের সম্পূর্ণ সমর্থন করলে তাঁকে অনেকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা

ছাড়তে হত ; আবার চরম রাজতন্ত্রীদের দলে গেলে তাঁকে ফরাসী বিপ্লবের ফলে দেশে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হত, এবং সেটা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল'না। সুতরাং এই দুই বিবদমান দলের মধ্যে অষ্টাদশ লুইকে ভারসাম্য-বজায় রাখার কঠিন দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

এ ছাড়া পুনঃস্থাপিত বুর্বে৷ রাজতন্ত্রের সামনে একটি কঠিন **শাসনতান্ত্রিক সমস্যাও** উপস্থিত হয়েছিল। নেপোলিয়নের এলবা যাত্রার পর অষ্টাদশ লুই যখন প্রথম ফ্রান্সে ফিরে আসেন (১৮১৪) তখন তিনি তাঁর প্রজাদের আশ্বস্ত করার জন্য সাংবিধানিক অধিকারের একটি সনদ (Constitutional Charter) মঞ্জুর করেছিলেন। এই সনদে তিনি ফ্রান্সে সাংবিধানিক শাসন, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, এবং প্রজাদের নাগরিক অধিকারকে নীতিগত ভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া বিপ্লবের ফলে দেশে ভূ-সম্পত্তির যে পুনর্বণ্টন হয়েছিল তারও কোন পরিবর্তন করা হবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হওয়ার পর এই নীতিগুলি রাজা কার্যতঃ মানতে বাধ্য ছিলেন কি না তা কোথাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি, এবং এই ব্যাপারে উদারপন্থী এবং চরম রাজতন্ত্রীদের মধ্যে এক তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। লুই নিজে অবশ্য এই দলীয় সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন। চরমপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হবার কোন ইচ্ছা তাঁর স্বভাবতই ছিল না।

শাসনতান্ত্রিক সমস্যা

অষ্টাদশ লুইয়ের রাজত্ব (১৮১৫-২৪) : অষ্টাদশ লুইয়ের রাজত্বের **প্রথম দুই বৎসর** (১৮১৫-১৭) অবশ্য **চরম রাজতন্ত্রী দল ক্ষমতা অধিকার** করে ছিল। এরা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের সাংবিধানিক সনদ মানতে অস্বীকার করে, এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রতি যারা কোন রকম সহানুভূতি দেখিয়েছিল তাদের ওপর নানা রকম অত্যাচার শুরু করে। গ্রামাঞ্চলে এই দলের লোকেরা লুঠতরাজ এবং হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত চালায়, আর ফরাসী সরকার এ ব্যাপারে নির্বিকার হয়ে থাকে, কারণ প্রতিনিধিসভায় (Chamber of Deputies) এই দলের সদস্যেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। অষ্টাদশ লুই শেষে এদের স্বেচ্ছাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিনিধি সভা ভেঙ্গে দেন এবং নতুন নির্বাচনের আদেশ দেন। নতুন প্রতিনিধি সভায় **মধ্যপন্থী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে,** এবং **পরবর্তী তিন বৎসর** (১৮১৭-২০) এদের নেতৃত্বে **ফ্রান্সের পুনর্গঠনের কাজ** অনেক দূর অগ্রসর হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও প্রজাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনগুলি

চরম রাজতন্ত্রীদের অত্যাচার

পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

আরো উদার করা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া এবং সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন করা এই সময়কার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ভিয়েনা চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ফ্রান্স বিজেতা দেশগুলিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়, এবং তার প্রতিদানে ফ্রান্স থেকে বিজেতা রাষ্ট্রগুলি তাদের সৈন্যবাহিনী (army of occupation) সরিয়ে নেয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারও পায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী **ডিউক অব বেরি** (Duke of Berry) **এক আততায়ীর হাতে নিহত** হন, এবং তার ফলে আবার চরম রাজতন্ত্রীরা সুবিধা পেয়ে যায়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেই একটি আইন করে প্রতিনিধিসভায় অপেক্ষাকৃত **ধনী নাগরিকদের দুটি করে ভোট** দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের সুযোগে **চরম রাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে জয়লাভ করে** ক্ষমতায় ফিরে আসে, এবং অষ্টাদশ **লুইয়ের রাজত্বের শেষ চার বৎসর** (**১৮২০-২৪**) তারাই দেশ শাসন করে। এই চার বৎসর **ফ্রান্সের ইতিহাসে এক প্রতিক্রিয়ার যুগ**। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই সময় ক্যাথলিক চার্চের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, প্রতি বৎসর প্রতিনিধিসভার নির্বাচনের বদলে সাত বৎসর অন্তর নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্স মেটারনিকের নেতৃত্ব অনুসরণ করে।

প্রতিক্রিয়ার জয়লাভ

দশম চার্লসের রাজত্ব (১৮২৪-৩০)ঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই **দশম চার্লস** (Charles X) ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেন। চার্লস বিশ্বাস করতেন যে উদারপন্থীদের সন্তুষ্ট করতে গিয়েই তাঁর বড় ভাই বিপদে পড়েছিলেন। সুতরাং তিনি আর সে দিকে যাবার চেষ্টা করলেন না। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের (James-II) মতো দশম চার্লস বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকারের বলেই তিনি সিংহাসন পেয়েছেন, এবং তাঁর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সামন্ত এবং যাজক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখাই একমাত্র প্রয়োজন। জনগণের রাজনৈতিক অধিকারে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। যে সব ফরাসী সামন্ত বিপ্লবের সময় ফ্রান্স ত্যাগ করে গিয়েছিল (Emigrés) তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার এবং তাদের নষ্ট সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব ফরাসী সরকার এই সময় গ্রহণ করে। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো অর্থ ফ্রান্সের রাজকোষে ছিল না। তাই ঠিক করা হয় যে সরকারী ঋণের (National Debt) ওপর সুদের হার কমিয়ে দিয়ে যে পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে তাই দিয়েই ঐ সামন্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে সব

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র

ফরাসী নাগরিক উঁচু হারে সুদের প্রত্যাশায় সরকারকে ঋণ দিয়েছিল তারা এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতঃই ক্ষুণ্ণ হয়। চার্লসের সরকার ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে এবং চার্চের সম্পত্তি অপহরণের শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক রক্ষীবাহিনী (National Guard) ভেঙ্গে দেওয়া হয়, যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ কমে আসে। সম্পূর্ণ ভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতার সম্পত্তির অধিকাংশ দেওয়ার জন্যও চার্লসের সরকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এর বিরুদ্ধে ফ্রান্সে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হওয়ায় সে চেষ্টা সফল হয়নি।

সামন্ত ও যাজকদের তোষণ

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস **পলিগনাক** (Polignac) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রাক্তন দেশত্যাগী সামন্তকে তাঁর মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করলে ফ্রান্সে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফরাসী পার্লামেণ্ট পর্যন্ত পলিগনাককে পদচ্যুত করার জন্য রাজার কাছে আবেদন জানায়। চার্লস এই আবেদনে কর্ণপাত না করে পার্লামেণ্টকেই ভেঙ্গে দেন, এবং নতুন নির্বাচনের আদেশ দেন ; কিন্তু নতুন পার্লামেণ্টে রাজার বিরোধী দলের সদস্যেরা আরো বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হয়। ১৮৩০ সালের **২৫শে জুলাই** রাজা তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে **চারটি আপৎকালীন নির্দেশ** (Ordinance) জারি করেন। সরকারের অনুমতি ভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়, পার্লামেণ্টের সাম্প্রতিক নির্বাচন নাকচ করা হয়, নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন করে ভোটদাতাদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়, এবং এই আইনের ভিত্তিতে নতুন নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা হয়।

পলিগনাক মন্ত্রিসভার নিয়োগ

চারটি আপৎকালীন নির্দেশ

এই চারটি নির্দেশ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারিসের কয়েকজন সাংবাদিক এবং পার্লামেণ্টের সদস্য দুটি স্বতন্ত্র ইস্তাহার প্রকাশ করে রাজার কাজকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে। দু-এক দিনের মধ্যেই **প্যারিসে বিপ্লব দেখা দেয়।** শ্রমিকেরাও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। রাজধানীর পথে পথে বেড়া (barricade) দেওয়া হয়। সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েক শত লোক প্রাণ হারায়। কয়েক দিনের মধ্যেই প্যারিস জনতার হাতে চলে যায়। চার্লস প্রমাদ গণে তাঁর পৌত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর প্রজারা তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি কোন সম্মান দেখায়নি। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তখন ছিল না। তাই বুর্বোঁ বংশেরই অন্য একটি শাখার প্রতিনিধি

জুলাই বিপ্লব (১৮৩০)

লুই ফিলিপকে (Louis Philippe) 'ফরাসী জাতির রাজা' বলে ঘোষণা করা হয় (৩১শে জুলাই, ১৮৩০)। জুলাই বিপ্লবের এই ভাবে অবসান ঘটে।

বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঃ জুলাই বিপ্লবের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল হল ফ্রান্সে **চরম রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতার অবসান**। চরম রাজতন্ত্রীরা চাইছিল ফ্রান্সে বিপ্লব-পূর্ব যুগের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং দশম চার্লসও সেই পথে যেতে চাইছিলেন। ২৫শে জুলাই প্রকাশিত চারটি রাজকীয় নির্দেশ ঐ উদ্দেশ্যেই ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ফরাসী দেশের জনসাধারণ ঐ নির্দেশগুলি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল।

চরম রাজতন্ত্রীদের পরাজয়

দ্বিতীয়তঃ, এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হলেও **এক রাজবংশকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে অন্য রাজবংশকে ঐ স্থানে স্থাপন** করা হল, এবং এই **পরিবর্তন আনল দেশের জনসাধারণ**। নতুন রাজা উদারপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, এবং তিনি নিজেকে ফরাসী দেশের রাজা না বলে 'ফরাসী জাতির রাজা' নামে উল্লেখ করেন। এই পরিবর্তনের অর্থই হল ফ্রান্সে **দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী রাজতন্ত্রের** (Divine Right Monarchy) **অবসান**। এই দিক থেকে বিচার করলে জুলাই বিপ্লবকে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) সঙ্গে তুলনা করা চলে। মেটারনিক এবং ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সে যে এত বড় পরিবর্তন ঘটল, তা থেকেই বোঝা যায় যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ইউরোপ থেকে বিপ্লবের আদর্শকে সম্পূর্ণ উন্মূল করতে পারেনি।

দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী রাজতন্ত্রের অবসান

তৃতীয়তঃ, এই বিপ্লবের ফলে ফরাসী দেশের **শাসনব্যবস্থাতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটল**। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের 'সাংবিধানিক অধিকারের সনদ' থেকে রাজার **ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার কথা বাদ** দেওয়া হল। বুর্বোঁ রাজবংশের শ্বেত পতাকাকে বাদ দিয়ে ফরাসী **বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ** করা হল। ক্যাথলিক ধর্মমতকে ফ্রান্সের সরকারী ধর্মমত হিসাবে অভিহিত না করে অধিকাংশ ফরাসী প্রজার ধর্মমত বলে ঘোষণা করা হল। এর ফলে **ক্যাথলিক চার্চের প্রভাবও কিছুটা কমল**। আইন করে ফ্রান্সে **ভোটাধিকারেরও সামান্য সম্প্রসারণ** করা হয়, যাতে কিছু মধ্যবিত্ত লোক ঐ অধিকার লাভ করে। ফরাসী **প্রজাদের নাগরিক অধিকার** এবং **সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতাও** ঐ সঙ্গে সুরক্ষিত হল। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে

প্রশাসনিক পরিবর্তন

জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে **কোন বিরাট পরিবর্তন আসেনি**। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের সমর্থকেরা এতে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেনি ; তাই প্রায় দুই দশক পরে তারা আবার ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটায় (১৮৪৮)।

ইউরোপে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের সাফল্য অন্যান্য দেশেও পরিবর্তনকামীদের মধ্যে এক আলোড়ন আনে। বিশেষ করে ফ্রান্সের প্রতিবেশী বা কাছের দেশগুলিতে, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইটালী ও পোল্যাণ্ডে,—স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন দেখা যায়। এই সব ব্যাপক আন্দোলনের ফলে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে যে রাজনৈতিক কাঠামো স্থাপন করা হয়েছিল, তাতে ভাঙ্গন দেখা দেয়।

দেশে দেশে বিপ্লব

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলন (১৮৩০)

আন্দোলনের কারণ ঃ ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভিয়েনা চুক্তিতে বেলজিয়ামকে ফরাসী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্যুত করে হল্যাণ্ডের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করা হয়। বেলজিয়ামের অধিবাসীদের আশ্বস্ত করার জন্য নতুন যুক্তরাজ্যটিতে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল। কিন্তু বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের এই মিলন ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। তাই বেশি দিন এই দুটি দেশকে একত্র ধরে রাখা সম্ভব হল না। এর আগের বিশ বৎসর (১৭৯৪-১৮১৫) বেলজিয়াম ছিল ফরাসী শাসনের আওতায়। ফরাসী চিন্তাধারা, ফরাসী আইন-কানুন ও নেপোলিয়নের প্রবর্তিত নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সেখানকার লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ডের রাজার শাসন এবং সেখানকার আইন-কানুন তাদের কাছে পুরানো জগতের প্রতীক বলেই মনে হল। তাছাড়া বেলজিয়ামের লোকেদের ভাষা ছিল কিছুটা ফ্লেমিশ (Flemish), কিছুটা ফরাসী; হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ভাষা ছিল 'ডাচ' (Dutch)। বেলজিয়ামের লোকেরা ছিল ক্যাথলিক ধর্মমতে বিশ্বাসী, হল্যাণ্ডের লোকেরা ছিল প্রোটেস্টাণ্ট ; বেলজিয়াম ছিল শিল্প-প্রধান দেশ, হল্যাণ্ড ছিল কৃষি-প্রধান ও গবাদি পশুপালনে অগ্রসর। দুই দেশের শক্তি-সামর্থ্য সমান হওয়ায় কেউ কারো প্রভুত্ব মানতে প্রস্তুত ছিল না। নতুন যুক্তরাজ্যের পার্লামেণ্টে (States General) দুই দেশের লোকেদের সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেলজিয়ামের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় তারা চাইল জনসংখ্যার অনুপাতে

কৃত্রিম মিলন

দুই দেশের পার্থক্য

প্রতিনিধিত্ব। হল্যাণ্ডের লোকেরা এ দাবি মানতে রাজী ছিল না, কারণ তা মানলে তারা পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু হয়ে যেত। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ-বংশীয় রাজা প্রথম উইলিয়াম (William I) সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুললেন বেলজিয়ামের সঙ্গে পরাধীন দেশের মতো ব্যবহার করে। তিনি সরকারী চাকরিতে সমস্ত উঁচু পদে তাঁর দেশের লোকেদের নিয়োগ করতে লাগলেন। 'ডাচ' ভাষাকে যুক্তরাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা এবং সহসা করভার বৃদ্ধির ফলেও বেলজিয়ামের লোকেদের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। বেলজিয়ামের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি একজোট হয়ে তাদের দেশের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে।

সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সমস্যা

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঃ ঠিক এই পরিস্থিতিতে জুলাই বিপ্লবের খবর এসে পৌছালে সেখানে উত্তেজনা চরমে ওঠে। ব্রাসেলস (Brussels) শহরে এই সময় একটি শিল্প-প্রদর্শনী উপলক্ষে বহু লোকের সমাবেশ হয়েছিল। সেখানেই প্রথম দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয় ও পরে তা দ্রুতগতিতে সারা বেলজিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনী এনেও এই অভ্যুত্থান দমন করা সম্ভব হয়নি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে **বেলজিয়াম তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে,** এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অবিলম্বে তাকে স্বাধীন দেশের মর্যাদা দেয়। ব্রিটিশ সরকারকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বেলজিয়ামের লোকেরা তাদের দেশে ব্রিটেনের মতো **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র** স্থাপন করে, এবং জার্মানীর এক ছোট দেশের রাজা **ডিউক লিওপোল্ড** (Duke Leopold of Saxe-Coburg) বেলজিয়ামের নতুন রাজা হন। ওলন্দাজ সরকার প্রথমে বেলজিয়ামের এই স্বাধীনতা মানতে চায়নি, কিন্তু আট বৎসর যুদ্ধের পর তারাও এই নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় (১৮৩৯)। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষ থেকে বেলজিয়ামকে একটি চির-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কখনো তার এই নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হয়নি।

ব্রাসেলসে দাঙ্গা

স্বাধীনতার স্বীকৃতি

ইটালীতে ব্যর্থ বিপ্লব ঃ ইটালীতে স্বাধীনতাকামীরা ইতিমধ্যে **কার্বোনারি** (Carbonari) নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছিল। জুলাই বিপ্লবের খবর ইটালীতে পৌছানো মাত্র তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং **পার্মা** (Parma), **মডেনা** (Modena) ও **পোপের রাজ্যে** (Papal States) বিপ্লব দেখা দেয়। কিন্তু বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যেই সমন্বয়ের অভাব ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্যও খুব সুস্পষ্ট ছিল না।

সুতরাং অস্ট্রিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তাদের এই অভ্যুত্থান দমন করা বিশেষ কঠিন হল না। বিপ্লবীরা আশা করেছিল, ফ্রান্সের রাজা উদারপন্থী লুই ফিলিপ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, কিন্তু তাদের সে আশা অচিরেই মিথ্যা প্রমাণিত হল। লুই ফিলিপ ইটালীর বিপ্লবীদের জন্য তাঁর সৈন্য ও অর্থ ক্ষয় করতে চাইলেন না।

অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপ

জার্মানীতে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ঃ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে হ্যানোভার (Hanover), স্যাক্সনী (Saxony) প্রভৃতি কয়েকটি ছোট রাজ্যেও বিপ্লব দেখা দিয়েছিল কিন্তু মেটারনিকের হস্তক্ষেপের ফলে বিপ্লবীরা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাঁরই প্রভাবে কার্লসবাডের নির্দেশাবলীর একটি নতুন সংস্করণ আবার প্রচারিত হয়। কোন জার্মান রাজা তাঁর দেশে স্বৈরতন্ত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। উদারপন্থীদের ওপর দমননীতির প্রয়োগ আগের মতোই চলতে থাকে।

মেটারনিকের জয়

পোল্যাণ্ডে অভ্যুত্থান ঃ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের অধীনে পোল্যাণ্ডে একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু দুই বৎসর পরেই আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডের নেতাদের বিরূপ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দেওয়া সংবিধান সাময়িক ভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম নিকোলাস (Nicholas I) পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার কঠোর নিয়ন্ত্রণে এনে সেখানকার উদারপন্থীদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের সংবাদে উল্লসিত হয়ে পোল্যাণ্ডের উদারপন্থীরা সেখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংগঠন, শৃঙ্খলা ও গণ-সমর্থনের অভাবে বিদ্রোহীরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। রুশ সৈন্যবাহিনী সহজেই পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে বিদ্রোহ দমন করে। ফরাসী সরকার এ ক্ষেত্রেও বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি।

রাশিয়ার কাছে পোল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণ

ইংলণ্ডে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ঃ জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং কোন বিপ্লব দেখা না দিলেও জনবিক্ষোভের ফলে পার্লামেণ্টে এক **সংস্কার আইন** (First Reform Act) গৃহীত হয়। এই আইনের দ্বারা মধ্যবিত্তেরা ভোটাধিকার লাভ করে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়। অবশ্য শ্রমিক ও কৃষকদের ভোটাধিকার লাভের সম্ভাবনা তখনো সুদূরপরাহত ছিল।

জুলাই রাজতন্ত্রের স্বরূপ ঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে নতুন রাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হল, ইতিহাসে তা **জুলাই রাজতন্ত্র** (July Monarchy) নামে পরিচিত। এই রাজতন্ত্রের সামনে **দুটি পথ** খোলা ছিল,—প্রথমটি দেশে আরো গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন ও বিদেশে সমস্ত উদারনৈতিক আন্দোলনের সমর্থন ; আর দ্বিতীয়টি দেশে পরিবর্তন-বিরোধিতা এবং বৈদেশিক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন। দুটি পথের সমর্থকই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু প্রথম পথের সমর্থকেরা ক্রমশঃ রাজনীতির লড়াই-এ হঠে যেতে লাগল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে সরকার রক্ষণশীলদের (Conservatives) নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। **বৈদেশিক ব্যাপারে** এই সরকার **সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা** বা দূরে সরে থাকার নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু, গণতন্ত্র-বিরোধী হলেও **আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রেলপথ নির্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা** করে ফ্রান্সের প্রগতিতে এরা সাহায্যই করেছিল, বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের এই নতুন রাজতন্ত্র বড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, তাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলেই কাজ করত।

রক্ষণশীল 'বুর্জোয়া' রাজতন্ত্র

বিরোধী দলগুলির আক্রমণ ঃ কিন্তু ধনীদের সমর্থনপুষ্ট লুই ফিলিপের সরকার খুব বেশি দিন শান্তিতে দেশ শাসন করতে পারে নি। বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী তিন দলের লোকেই এই সরকারের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। ১৮৩২ থেকে ১৮৪৮ সাল ছিল ফ্রান্সের ইতিহাসে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ ; কিন্তু লুই ফিলিপের সরকারের এই সময় অশান্তির শেষ ছিল না। **দক্ষিণপন্থীদের** মধ্যে দুটি প্রধান গোষ্ঠী ছিল ; একটি **পুরানো রাজবংশের সমর্থকদল** (Legitimists), যারা দশম চার্লসের পৌত্র ডিউক অব বোর্দোকে **(Duke of Bordeaux)** ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিয়ে আবার নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চাইছিল, আর অপরটি **ক্যাথলিক চার্চের সমর্থক দল** (Clericals), যারা রাজার ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতার কথা বলত না, কিন্তু চার্চের পুরানো অধিকারগুলি সযত্নে রক্ষা করতে চাইত। বিশেষতঃ, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর তারা চার্চের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছিল। এই দুটি গোষ্ঠীর কোনটিরই অবশ্য বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল না। ফরাসী সরকার তাদের খুব একটা ভয় করত না।

দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ

বামপন্থীদের মধ্যেও দুটি প্রধান দল ছিল, একটি গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্রের সমর্থক দল, অপরটি সমাজতন্ত্রী দল। **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী** বা **নয়া-জ্যাকোবিন** (Democratic Republicans or Neo-Jacobins) দলের মুখপত্র ছিল 'ন্যাশনাল' (National) নামে একটি পত্রিকা, যার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অসন্তোষ ব্যক্ত হত।

প্যারিসের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ওপর এই দলের বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল, এবং এদের নেতৃত্বে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে, এবং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লিয় (Lyons) শহরে দুটি বিদ্রোহের চেষ্টাও হয়, যদিও সরকারকে ঐ বিদ্রোহ দমনে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এদের দমনের জন্য বিশেষ কয়েকটি আইন (September Laws) বলবৎ করা হয়, এবং দলের বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাদের পত্র-পত্রিকাগুলির মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চলে।

প্রজাতন্ত্রী দলের বিরোধিতা

ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সুযোগ নিয়ে **সমাজতন্ত্রী দল** (Socialists) মাথা তুলে দাঁড়ায়। এদের নেতা **লুই ব্লাঙ্ক** (Louis Blanc) প্রকাশ্যে সমাজ-বিপ্লবের কথাই বলতেন। প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম নাগরিকের জীবিকা-উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য, এবং এর জন্য রাষ্ট্র-পরিচালিত কল-কারখানা স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন, এই ছিল লুই ব্লাঙ্কের বক্তব্য। আর এক সমাজতন্ত্রী নেতা **ব্লাঙ্কি** (Blanqui) অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ চিন্তা করতেন না, আকস্মিক আঘাত হেনে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অচল করে দিয়ে রাষ্ট্রকে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে ফ্রান্সের নানা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-বিক্ষোভ দেখা দেয়, কিন্তু পরিণামে তা সফল হয়নি।

সমাজতন্ত্রীদের আবির্ভাব

ফ্রান্সে **মধ্যপন্থীদের** মধ্যেও দুটি বড় দল এই সময় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমটি ছিল **বোনাপার্টির অনুগামী দল** (Bonapartists) যারা রাজনীতিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। নেপোলিয়নের এক ভ্রাতুষ্পুত্র, **লুই নেপোলিয়ন** (Louis Napoleon), ছিলেন এদের নেতা। এরা মুখে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও কার্যতঃ এদের লক্ষ্য ছিল নিরঙ্কুশ কিন্তু জনহিতকামী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৩৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লুই নেপোলিয়ন দুবার তাঁর অনুকূলে আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

নেপোলিয়নের প্রভাব

দ্বিতীয় মধ্যপন্থী দলটি ছিল গণতন্ত্রের সমর্থক অপেক্ষাকৃত অল্পবিত্তদের নিয়ে গঠিত, যারা রাজনৈতিক দুর্নীতি দূর করার জন্য চাইছিল ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এদের এক কথায় **সংস্কারপন্থী দল** (Reformists) বলা চলে। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন **গিজো** (Guizot)। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি অত্যন্ত সৎ লোক ছিলেন, চিন্তাশীল দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু জনসাধারণকে

সংস্কারপন্থী আন্দোলন

রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, তাঁর মতো দক্ষ প্রশাসক ফ্রান্সে আর নেই ; সুতরাং ভালো-মন্দ যে কোন উপায়ে নিজের ক্ষমতা তাঁকে অটুট রাখতে হবে। এর জন্য তিনি অকৃপণভাবে সরকারী আনুকূল্য (patronage) বিতরণ করে, অর্থ ও পদের লোভ দেখিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকেদের তাঁর দলে আনার চেষ্টা করতেন। ভোটাধিকার মুষ্টিমেয় লোকের হাতে থাকায় তাঁর এই চেষ্টা সফলও হয়েছিল। পার্লামেন্টের নির্বাচনে তাঁর দলকে হারানো সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কারপন্থীরা এই কারণেই ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হয়।

রাজতন্ত্রের অবসান—ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঃ সংস্কারপন্থীরা আঠারশো চল্লিশের দশকের শেষ দিকে ফ্রান্সে এক তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। সরকারের দুর্নীতির বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য নানা সভা-সমিতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি আরম্ভ হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পার্লামেন্টের উদারপন্থী সদস্যেরা প্যারিসে এক বিরাট ভোজ-সভার (banquet) আয়োজন করে। এই ধরণের ভোজ-সভায় রাজনীতির আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করত। লুই ফিলিপের সরকার এই ভোজসভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পার্লামেন্টের সদস্যেরা তখন ভোজসভা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু বহু সাধারণ লোক সেখানে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে উপস্থিত হয়, এবং চরমপন্থীদের প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। পুলিশের সঙ্গে জনতার বারবার সংঘর্ষ হয়। **গিজো** এই আন্দোলনের ফলে **পদত্যাগ করতে বাধ্য হন**। এর পর প্রজাতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে প্যারিসে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা বার হয় ও কয়েক রাত্রি ধরে রাজধানীতে আলোকসজ্জা চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উত্তেজনার মুহূর্তে গিজোর বাড়ীর প্রহরীরা রাজপথে বিক্ষোভরত জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে ও তাতে কিছু লোক প্রাণ হারায়। মৃত ব্যক্তিদের দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বার হলে জনতার ক্ষোভ ফেটে পড়ে। এবারে সৈন্যরাও বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি বর্ষণ করতে অস্বীকার করে। রাজপ্রাসাদ বিপন্ন হলে **লুই ফিলিপ** তাঁর পৌত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে **পলায়ন করেন**। পার্লামেন্টের সদস্যেরা তাঁর এই মনোনয়ন মেনে নেয়, কিন্তু প্যারিসের জনসাধারণ তা মানতে চায় নি। **তারা অবিলম্বে ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র** (Republic) **বলে ঘোষণা করে।** প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দুই দলের নেতৃত্বে প্রথমে দুটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, কিন্তু শীঘ্রই এই দুই দল মিলিত হয়ে একটি নতুন মন্ত্রিসভা

বিপ্লবের সূচনা

গিজোর পদত্যাগ

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

গঠন করে। এই সব ঘটনা ঘটতে মাত্র তিন দিন সময় লাগে। ফ্রান্সে নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ফরাসী বিপ্লবের গৌরবময় দিনগুলির স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

জুলাই রাজতন্ত্রের পতনের কারণ ঃ লুই ফিলিপের সরকারের পতনের প্রধান কারণ ছিল **ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ওপর এর একান্ত নির্ভরতা**। এই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ফ্রান্সে এক অতি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছিল। জমিদারেরা এদের অবজ্ঞা করত, আর জনসাধারণ করত ঘৃণা। লুই ফিলিপ যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কার্যসূচী গ্রহণ করতেন, তাহলে অনেকটা জনসমর্থন তিনি পেতেন। অথবা, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ের দ্বারা ফ্রান্সের প্রভাব বিস্তার করে তিনি ফরাসীজাতির গৌরবস্পৃহা চরিতার্থ করতেও পারতেন। কিন্তু এর কোনটাই না করে তিনি জনগণের বিরাগভাজন হন, এবং পরিণামে তাঁর ক্ষমতা অল্পস্থায়ী হয়।

শিল্পপতিদের উপর নির্ভরতা

সংস্কার-বিমুখতা ও বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮২১-২৯)
(Greek War of Independence)

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় গ্রীস দেশ ছিল তুরস্কের **অটোমান** (Ottoman) **সুলতানদের অধীন**। প্রাচীন গ্রীকদের অধঃপতিত বংশধরেরা পূর্বপুরুষদের গৌরবের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অত্যন্ত হীন অবস্থায় সেখানে জীবন যাপন করত। তাদের স্বধর্মাচরণের পথে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু সরকারকে তাদের প্রচুর কর দিতে হত, এবং শাসক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের প্রায়ই জুটত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, এবং তার সুযোগ নিয়ে গ্রীকদের মধ্যে ক্রমশঃ এক জাতীয় চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের চর্চা আবার আরম্ভ হয়, এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষার ব্যবহার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়। গ্রীকদের মধ্যে তাদের ধর্মের জন্যও এক নতুন উন্মাদনা দেখা দেয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের ওডেসায় (Odessa) **'হেটাইরিয়া ফিলিকে'** (Hetairia Philike) বা বান্ধব সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল তুরস্কের অধীনতা পাশ থেকে গ্রীকদের মুক্ত করা, এবং কালক্রমে ইউরোপ থেকে তুর্কী অধিকারের চিহ্ন মুছে দেওয়া। দিন দিন এই প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

জাতীয়তাবোধের জাগরণ

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডানিয়ুব নদীর তীরবর্তী **ওয়ালেশিয়া** (Wallachia) প্রদেশে

একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে তুরস্কের সুলতান সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন। কিন্তু এর পর ঐ বৎসরই দক্ষিণ গ্রীসের **মোরিয়া** (Morea) **অঞ্চলে** যে **বিদ্রোহ** দেখা দেয় তাকে দমন করা খুব কঠিন হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহ অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত গ্রীসে ছড়িয়ে পড়ে, এবং গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই ভাবেই সূচনা হয়।

মোরিয়ার বিদ্রোহ

১৮২১ থেকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম যুগ। এই তিন বৎসরের যুদ্ধে উভয় পক্ষই **চরম নৃশংসতার পরিচয়** দেয়। গ্রীকরা নিরীহ তুর্কী কৃষকদের দলে দলে হত্যা করে, আর তুর্কীরা গ্রীকদের প্রধান ধর্মগুরু কনস্টান্টিনোপলের 'প্যাট্রিয়ার্ক'কে (Patriarch of Constantinople) তাঁর প্রাসাদের বাইরেই ফাঁসি দেয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই সময় **গ্রীকদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সমর্থন করবার জন্য নতুন সভা-সমিতি** স্থাপিত হয় এবং সৈন্য ও অর্থ সাহায্যও ঐ সব দেশ থেকে আসতে থাকে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে এসে এই স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয়। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি লর্ড বায়রন (Lord Byron) এবং ফ্রান্সের সুসাহিত্যিক শ্যাটোব্রিয়াঁ (Chateaubriand) গ্রীকদের প্রতি তাঁদের দেশবাসীর সহানুভূতি জাগ্রত করার জন্য লেখনী ধারণ করেন। প্রাচীন গ্রীসের কাছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ঋণ এইভাবে শোধ করার চেষ্টা না হলে গ্রীকদের বিদ্রোহ অল্পদিনের মধ্যেই দমিত হত, সন্দেহ নেই।

ইউরোপে ব্যাপক জন-সমর্থন

১৮২৪ থেকে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ এই স্বাধীনতার যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে মিশরের শাসক ('পাশা') **মেহেমেত আলির** (Mehemet Ali) **সাহায্যপুষ্ট** হয়ে তুর্কীরা বিদ্রোহী গ্রীকদের যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে এবং **মোরিয়া অধিকার** করে নেয় (১৮২৫)। রাশিয়ার জার **প্রথম নিকোলাস** (Nicholas I) ধর্মীয় কারণে বরাবরই নিজেকে গ্রীকদের বন্ধু বলে পরিচয় দিতেন। তিনি এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তাদের হয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এতে বিচলিত বোধ করে, কারণ রাশিয়া একক ভাবে গ্রীকদের যুদ্ধজয়ে সাহায্য করলে পরবর্তী কালে স্বাধীন গ্রীক রাষ্ট্রে রাশিয়ার প্রভাবই চূড়ান্ত হবে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে **লণ্ডনের সন্ধির** (Treaty of London) দ্বারা ঠিক হয় যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া তিনটি রাষ্ট্রই তুরস্কের সুলতানকে তাদের

তুর্কীদের সাময়িক সাফল্য

মধ্যস্থতা স্বীকার করতে ও গ্রীসকে স্বায়ত্তশাসনের (autonomy) অধিকার দিতে বাধ্য করবে।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তৃতীয় ও শেষ পর্ব আরম্ভ হয়। তুরস্কের সুলতান ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যস্থতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তিনটি দেশই গ্রীসে তাদের নৌ-বাহিনী পাঠায়, এবং প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও **নাভারিনো উপসাগরে** (Bay of Navarino) আকস্মিক উত্তেজনার ফলে তুর্কী নৌ-বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। **নাভারিনোর নৌ-যুদ্ধে** (১৮২৭) তুর্কী নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় ও তার ফলেই গ্রীকদের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্কের সুলতান এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে **আড্রিয়ানোপলের সন্ধির** (Treaty of Adrianople) দ্বারা গ্রীসকে তুরস্কের সম্রাটের অধীনে একটি স্বয়ং-শাসিত (Self-governing) রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু গ্রীকরা এতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিন বৎসর পরে আর একটি চুক্তির দ্বারা তাদের **পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার** করা হয়, এবং ওয়ালেশিয়া ও তার সন্নিহিত মলডেভিয়া প্রদেশকেও তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে অনেকটা মুক্ত করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এই ভাবে একটি স্বাধীন খ্রীষ্টান রাজ্য জন্মলাভ করে (১৮৩২)। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এককভাবে তাদের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে গ্রীকরা রাশিয়াকেই তাদের ত্রাণকর্তা বলে মনে করে ও তার ফলে বলকান উপদ্বীপে রাশিয়ার মর্যাদা ও প্রভাব দুই-ই বৃদ্ধি পায়।

নাভারিনোর যুদ্ধে তুর্কীদের পরাজয়

গ্রীসের স্বাধীনতা লাভ

রাশিয়ার ইতিহাস (১৮০১-৫৫ খ্রীঃ)

রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাঃ উনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্ব হতেই রাশিয়া **রোমানভ (Romanov) বংশীয়** সম্রাটদের (Tsar) দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন হলেও রাশিয়াতে সে আন্দোলনের প্রভাব বিশেষ পড়েনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে (১৯১৭) জারতন্ত্রের (Tsardom) অবসান হওয়া পর্যন্ত রাশিয়ায় **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রই** প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ব্যবস্থায় রুশ জনসাধারণের রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকার আদৌ স্বীকৃত হয়নি। অর্থনৈতিক দিক থেকেও রাশিয়া ছিল অনুন্নত।

অনুন্নত দেশ

শিল্প-বিপ্লব ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে রাশিয়ায় প্রবেশ করে। **কৃষি-প্রধান রাশিয়াতে** জমিদারেরা নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও **কৃষকদের অবস্থা** ছিল অতি শোচনীয়; তাদের অধিকাংশই ছিল **ভূমিদাস পর্যায়ের**। ধর্মের দিক থেকে রাশিয়ার অধিবাসীরা খ্রীষ্টান হলেও তাদের গ্রীক বা রক্ষণশীল (Orthodox) 'চার্চের' ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি রোম্যান ক্যাথলিক বা প্রোটেষ্টাণ্ট 'চার্চের' অনুষ্ঠান থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। এক কথায় বলা যেতে পারে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক থেকে রাশিয়া ইউরোপের অঙ্গ হলেও তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে অনেকটা পৃথক ছিল।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (১৮০১-১৮২৫ খ্রীঃ)ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় জার প্রথম পলের পুত্র **প্রথম আলেকজাণ্ডার** (Tsar Alexander I) রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮০১)। তাঁর চরিত্রে **নানা পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমাবেশ** ছিল, এবং তাঁর কার্যকলাপের মধ্যেও এই স্ব-বিরোধিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, জার আলেকজাণ্ডার নিজেকে **উদারপন্থী বলে পরিচয় দিতেন**। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে **টিলসিটের সন্ধির** দ্বারা নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদান করলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের (বিশেষতঃ স্পেনের) রাজাদের প্রতি ফরাসী সম্রাটের দুর্ব্যবহার তাঁকে বিচলিত করে, এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের পর আলেকজাণ্ডার প্রকাশ্যে তাঁর শত্রু শিবিরে যোগদান করেন। **নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের মুক্তি-সংগ্রামের তিনি অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন**। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর পরাজিত শত্রু ফ্রান্সের উপর অতিরিক্ত শাস্তিমূলক সন্ধির সর্ত আরোপ করারও তিনি বিরোধিতা করেন। **পোল্যাণ্ডকে** স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তিনি এক সময় চিন্তা করেছিলেন এবং সেখানে লিখিত সংবিধানের প্রবর্তনও তিনিই প্রথম করেন। **ইটালী ও জার্মানীর উদারপন্থীদের গোপনে তিনি উৎসাহ দিতেন**। **রাশিয়াতেও নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা** প্রবর্তনের পরিকল্পনা তাঁর ছিল, এবং **সেণ্টপিটার্সবার্গের লাইব্রেরি** (১৮১৪) ও **বিশ্ববিদ্যালয়** (১৮১৯) তিনিই স্থাপন করেন। ভূমিদাসদের অবস্থার উন্নতির প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের উদার নীতি

কিন্তু, আপাত দৃষ্টিতে উদারপন্থী ও সংস্কারকামী হলেও আলেকজাণ্ডার জারতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার ঐতিহ্যও একেবারে বিসর্জন দেননি। নেপোলিয়নের সঙ্গে

হাত মিলিয়ে এক সময় তিনি সুইডেন ও তুরস্ক জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। **জর্জিয়া (Georgia), ফিনল্যাণ্ড (Finland), বেসারাবিয়া (Bessarabia)** এই তিনটি রাজ্য তিনি রাশিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেটারনিকের বিপ্লব-বিরোধী নীতি তিনি গ্রহণ করেন, এবং পরবর্তী কালে **মেটারনিকের একজন বিশেষ অনুরাগী** হয়ে ওঠেন। রাশিয়াতে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত তিনি প্রবর্তন করেন নি, ভূমিদাসদের উন্নতির জন্যও প্রায় কিছুই করেন নি বলা চলে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত তিনি দুর্ব্যবহার করেন, এবং তাঁর নিজের দেওয়া সংবিধান সাময়িক ভাবে প্রত্যাহার করে নেন।

স্বেচ্ছাচারিতার ঐতিহ্য

এ ছাড়া জার আলেকজাণ্ডারের মধ্যে কিছুটা **ধর্মীয় উন্মাদনা ও অতীন্দ্রিয়বাদের** (Mysticism) **প্রতি আকর্ষণ** ছিল। মাদাম ক্রুডেনার (Madame Crudener) নামে এক মহিলার প্রভাবে পড়ে তিনি এই ব্যাপারে আকৃষ্ট হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত **পবিত্র চুক্তির** (Holy Alliance) সর্তগুলির মধ্যে আলেকজাণ্ডারের এই ধর্মভাব লক্ষ্য করা যায়। জার্মান উদারপন্থীরা স্বাধীন চিন্তা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করার জন্যই নাকি তাঁর সমর্থন হারায়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় উৎসাহ দেবার জন্য আলেকজাণ্ডার **'বাইবেল সোসাইটি'** (Bible Society) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শেষ জীবনে রাশিয়ায় ধর্মদ্রোহীদের উপর তিনি কিছুটা উৎপীড়নও করেছিলেন।

ধর্মোন্মাদনা

আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে **রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের যোগাযোগ** ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে সব রুশ সৈন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তারা পশ্চিম ইউরোপের অপেক্ষাকৃত উদার রাজনৈতিক ভাবধারা ও উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় লাভ করে, এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের মন সংস্কারমুখী হয়। রাশিয়ায় সে সময় **জনসাধারণের অসন্তোষের** অনেক কারণই বর্তমান ছিল। সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও সততার অভাব পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। বেতনের স্বল্পতার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এবং বিচারকেরাও অনেক সময় ঘুষ নিত। তহবিল তছরুপের ব্যাপার খুব সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড় জমিদার এবং সামরিক প্রশাসকেরা অসৎ উপায়ে দিন দিন ধনকুবের হয়ে উঠছিল। আলেকজাণ্ডার নিজেও তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে সংস্কারপন্থীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন।

জনসাধারণের অসন্তোষ

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় স্বভাবতই এক সংস্কার-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় **'সোসাইটি অব্ দি পাবলিক গুড্'** (Society of the Public Good) নামে একটি রাজনৈতিক দল স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে কিছু লোক সীমিত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল, অপরেরা ছিল প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা **প্রথম নিকোলাস রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।** নিকোলাসের সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীল মনোভাবের কথা উদারপন্থীদের জানা ছিল। তাই তারা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল বলে এর নাম **ডিসেমব্রিষ্ট আন্দোলন** (Decembrist Movement)। কিন্তু নিকোলাসের পক্ষে এই আন্দোলন দমন করা বিশেষ কঠিন হয়নি। কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করে আন্দোলনের নেতাদের তিনি হয় হত্যা করেন, অথবা নির্বাসন দণ্ড দেন, এবং তারপর রাশিয়ায় এক প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব শুরু হয়।

ডিসেমব্রিষ্ট আন্দোলন

জার প্রথম নিকোলাস (১৮২৫-৫৫ খ্রীঃ) ঃ আলেকজাণ্ডারের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী প্রথম নিকোলাস (Nicholas I) **স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক** ছিলেন। কঠোর হস্তে **ডিসেমব্রিষ্ট আন্দোলনকে দমন** করে তিনি যে **প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন** করেন পরবর্তী ত্রিশ বৎসর তা রাশিয়াতে স্থায়ী হয়েছিল। এই ত্রিশ বৎসর রাশিয়ায় **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না,** উদারপন্থী ভাবধারার প্রসারে সহায়ক হতে পারে এমন কোন বইও রাশিয়ায় ছাপা বা বিদেশ থেকে আনা যেতে পারত না। রাশিয়ার **গোপন পুলিশ বিভাগের 'তৃতীয় শাখা'** (Third Section) নামক সংস্থাটি সারা দেশে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট লোকেদের সন্ধান করে বেড়াত, এবং সন্ধান পাওয়া গেলে সেই সব লোকের কঠোর শাস্তিবিধানও হত। **বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারেও** রুশ নাগরিকদের উপর **নানা বিধি-নিষেধ আরোপ** করা হয়। পশ্চিম ইউরোপের অপেক্ষাকৃত উদার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা রাশিয়ায় যাতে প্রবেশ না করে নিকোলাস সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও এ সময় রাশিয়ার শাসককুলের অভিপ্রেত ছিল না। নিকোলাসের কঠোর শাসনের ফলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কোন প্রভাবই রুশ রাজনীতিতে পড়েনি।

স্বৈরাচারী শাসন

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নিকোলাস **মেটারনিকের অনুগামী** ছিলেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের বিদ্রোহে তিনি ধর্মীয় কারণে **বিদ্রোহী গ্রীকদেরই সমর্থন** করেন। পরবর্তী কালে তুরস্কের সাম্রাজ্যের অধীনস্থ খ্রীষ্টান প্রজাদের অভিভাবকত্বের দাবীতে তিনি **ক্রিমিয়ার যুদ্ধে** (১৮৫৪-৫৬) যোগদান করেন। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে সংস্কারকামী আন্দোলন দেশে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার আগেই নিকোলাসের মৃত্যু হয় (১৮৫৫)।

বৈদেশিক নীতি

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধ্য-শতাব্দীর অভ্যুত্থান
(The Mid-Century Upheaval)

(১৮৪৮-৫০ খ্রীঃ)

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের মতো ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবও ইউরোপের দেশে দেশে সাড়া জাগায়। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, ইটালী প্রভৃতি দেশে এই সময় যে সব আন্দোলন দেখা দেয়, সেগুলির **মূল প্রেরণা** ছিল **উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদ**, এবং **লক্ষ্য** ছিল **স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ও জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা**। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু **কিছুটা প্রারম্ভিক সাফল্যের পর আন্দোলন ব্যর্থ** হয়। এই ব্যর্থতার কারণ বিপ্লবীদের সাংগঠনিক দৌর্বল্য ও একতার অভাব এবং তাদের বিরুদ্ধে শাসক সম্প্রদায়ের সামরিক শক্তি প্রয়োগ।

বিপ্লবের লক্ষ্য

জার্মানীতে বিপ্লব ঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে যে বিপ্লব দেখা যায় তার প্রধান লক্ষ্য ছিল বহুধা-বিভক্ত জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন। বহুদিন ধরেই এই আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব চলছিল। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে **জার্মানীতে শিল্প বিপ্লবের সূচনা** হয়, এবং জার্মান রাষ্ট্রগুলি একটি সাধারণ শুল্ক-নীতি অনুসরণের জন্য **'সলভেরিন'** (Zollverein) নামে এক **বাণিজ্যিক সঙ্ঘ** (Customs Union) স্থাপন করে। **হেগেল** (Hegel) এবং **ফয়ারবাকের** (Feuerbach) দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা শিক্ষিত জার্মানদের ওপর এই সময় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইন-শাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানা লেখক ও চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে। বন (Bonn), বার্লিন (Berlin), মিউনিক (Munich) ও লিপজিগ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। **রাজনৈতিক আন্দোলন** এবং **শ্রমিক আন্দোলনও** জার্মানীতে এই সময় দানা বাঁধে। প্রাশিয়ার রাজা **চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম** (Frederick William IV) উদারপন্থীদের ওপর কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন, এবং

বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্ব

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজ রাজ্যে তিনি একটি প্রতিনিধিসভা (United Landtag) স্থাপন করেন। রাইনল্যাণ্ড (Rhineland) অঞ্চলের শহরগুলিতে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল কয়েকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপও এই সময় লক্ষ্য করা যায়। সাইলেশিয়া অঞ্চলে **তন্তুবায়দের ব্যাপক ধর্মঘট** দেখা দেয়, এবং এই সুযোগে সমাজতন্ত্রীরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। **মার্ক্স ও এঙ্গেলসের জার্মান রাজনীতিতে** আবির্ভাব এই সময়েই প্রথম ঘটেছিল।

লুই ফিলিপের পতনের কিছুদিন পরেই **বার্লিনে জনতার বিক্ষোভ** দেখা যায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নানা জনসভার আয়োজন হয়, এবং **পুলিশের সঙ্গে জনতার বার বার সংঘর্ষ** বাধে। প্রাশিয়া-রাজ **চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম** প্রজাদের দাবী মেনে নিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেন, নতুন সংবিধান রচনার জন্য তাঁর রাজ্যের প্রতিনিধিসভার বৈঠক ডাকেন, এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারেও তাঁর সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। **জার্মান উদারপন্থীরা** ভিয়েনা চুক্তির ফলে জার্মানীতে যে দুর্বল, সংহতিহীন রাজ্যসঙ্ঘ (Confederation) স্থাপিত হয়েছিল তার পরিবর্তে একটি **শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে** চাইছিল। হাইডেলবার্গ (Heidelberg) শহরে একটি সভায় মিলিত হয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা নিয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করে, এবং তারপর তাদেরই আহূত একটি প্রতিনিধিসভার (Vorparlament) নির্দেশক্রমে জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক **জাতীয় মহাসভা গঠনের সিদ্ধান্ত** নেওয়া হয়। এই জাতীয় মহাসভাই জার্মানীর ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা করবে বলে ঠিক হয়। জার্মান রাজারা এই জাতীয় মহাসভার নির্বাচনে বাধা দিতে সাহস পাননি। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে **ফ্রাঙ্কফুর্ট** (Frankfurt) **নগরে এই জাতীয় মহাসভার বৈঠক** বসে।

প্রাশিয়ায় নতুন সংবিধান

ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় মহাসভা

জাতীয় মহাসভা কিন্তু জার্মান উদারপন্থীদের আশা পূরণ করতে পারেনি। এই সভার অধিকাংশ সদস্যই ছিল বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর। নিষ্ফল তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্কে তারা বহু সময় নষ্ট করে, এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়। প্রস্তাবিত নতুন জার্মান রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের সীমানা জার্মানীর বাইরেও প্রসারিত ছিল বলে এবং এই সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে অনেকেই জার্মান জাতির লোক নয় বলে জাতীয় মহাসভা শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না করার

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত সংবিধান

সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন জার্মান রাষ্ট্র একটি যুক্তরাষ্ট্রের (Federal State) আকার গ্রহ করবে, এই রাষ্ট্রের একটি প্রতিনিধি সভা থাকবে, এবং এর শাসক বংশানুক্রমে সিংহাসন লাভ করবে ও সম্রাট উপাধি গ্রহণ করবে বলে জাতীয় মহাসভা ঘোষণা করে। ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে **প্রাশিয়ার রাজাকে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের সম্রাট পদ গ্রহণ** করতে অনুরোধ জানান হয়।

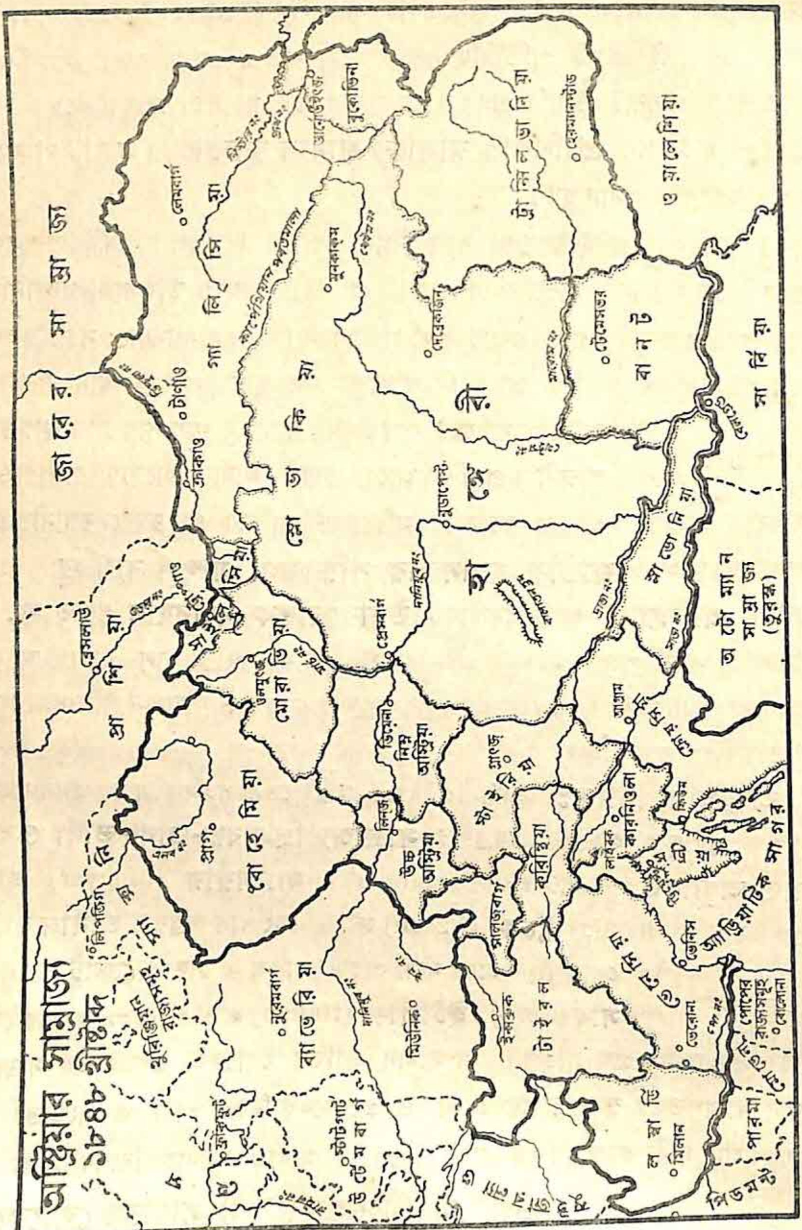
ইতিমধ্যে কিন্তু ইউরোপের সর্বত্র বিপ্লব পরাভূত হয়েছিল। অষ্ট্রিয়ার সরকা সরাসরি এই সংবিধান নাকচ করে দেয়। প্রাশিয়ার রাজাও তাঁর প্রজা-প্রতিনিধিদে কাছ থেকে রাজমুকুট গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। নতুন সংবিধানে সম্রাটের ক্ষমত যে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হয়েছিল তা তিনি জানতেন; তা ছাড়া এই সংবিধান গ্রহণ করলে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গেও তাঁর সংঘর্ষ বাধতে পারত। হ্যানোভার, স্যাক্সনী প্রভৃতি আরো চারটি জার্মান রাজ্যের রাজারাও এই সংবিধান মানতে অস্বীকার করেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই দুই নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রে বিরোধিতার ফলে **জাতীয় মহাসভার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ** হয়। ১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে **প্রাশিয়ায়** একটি মোটামুটি **উদারনৈতিক সংবিধান** গৃহীত হয়, কি জার্মানীর অন্যত্র পূর্বের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-পদ্ধতি চালু হয়। অলমুটজ সম্মেলনের (Olmutz Convention) পর অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বাধীন জার্মান রাজ্যসঙ্ঘ আবা ক্ষমতায় ফিরে আসে।

বিপ্লবের ব্যর্থতা

অস্ট্রিয়ায় বিপ্লব ঃ জার্মানীর মতো অষ্ট্রিয়াতেও বহুদিন ধরে জনসাধারণে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। অষ্ট্রিয়ার **সাম্রাজ্য ছিল বহু-ভাষা-ভাষী ও বহু জাতি-অধ্যুষিত**। হাঙ্গেরীতে (Hungary) **ম্যাগিয়ার** (Magyar) জাতি বোহেমিয়ায় (Bohemia) **চেক** (Czech) জাতি এবং খাস অষ্ট্রিয়ায় **জার্মান** জাতি লোক ছিল এদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু এ ছাড়াও **ক্রোট** (Croat) **সার্ব** (Serb), **ইটালীয়** (Italian) প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লো অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রজা ছিল। অ-জার্মান জাতির লোকেরা কেউই এই সাম্রাজে জার্মান আধিপত্যকে সুনজরে দেখত না ও প্রত্যেকেই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির জ বিশেষ মর্যাদা দাবী করত, কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যেও আবার বিশেষ ঐক্য ছি না। অষ্ট্রিয়ার প্রতিনিধিসভায় (Diet) **সাধারণ লোকেদে ভোটাধিকার ছিল না** এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রায় নিরঙ্কুশভাবে রাজ্যশাসন করতেন। কিন্তু ভোটাধিকার না থাকলেও **সাধারণ লোকের উপর সব চেয়ে গুরু করভার** ন্যস্ত হয়েছিল। উদারপন্থীদের স্বভাবতই এই ব্যবস্থ

জাতিগত বিভেদ

জনগণের অসন্তোষ


অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য
১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ
প্রাগ
বোহেমিয়া
মোরাভিয়া
প্রাশিয়া
ব্রেসলাউ
লিপজিগ
স্যাক্সনি
ক্রাকাও
টার্নো
লেমবার্গ
জারের সাম্রাজ্য
বুকোভিনা
বুডাপেস্ট
প্রেসবার্গ
ভিয়েনা
নিম্ন অস্ট্রিয়া
উচ্চ অস্ট্রিয়া
লিনজ
সালজবার্গ
ক্যারিস্থিয়া
কারনিওলা
ট্রিয়েস্ট
ভেনিস
ভেরোনা
মিলান
পিডমণ্ট
পারমা
বোলোনা
পোপের রাজ্যসমূহ
আড্রিয়াটিক সাগর
মিউনিক
নুরেমবার্গ
ব্যাভেরিয়া
স্টাটগার্ট
ইনসব্রুক
সুইজারল্যান্ড
টেমেসভর
বানাট
সার্বিয়া
অটোমান সাম্রাজ্য (তুরস্ক)
আগ্রাম
ট্রানসিলভানিয়া
ওয়ালেশিয়া
সার্বিয়া
ক্লসেনবার্গ
হার্মানস্টাড
ডেব্রেজিন
হাঙ্গেরী
স্লোভাকিয়া
কার্পেথিয়ান পর্বতমালা

যথেষ্ট আপত্তি ছিল। অস্ট্রিয়ায় **শিল্প-বিপ্লবের সূচনাও** এই সময় হয়, এবং তার ফলে শ্রমিক-অসন্তোষও দিন দিন বাড়তে থাকে।

ফ্রান্সে লুই ফিলিপের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে বিপ্লব দেখা দেয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ হাঙ্গেরীর খ্যাতনামা জননায়ক **লুই কসুথ** (Louis Cossuth) **ক্ষমতা অধিকারের জন্য বিপ্লবীদের আহ্বান** জানান। ১৩ই মার্চ তারিখে অস্ট্রিয়ার রাজধানী **ভিয়েনা** (Vienna) **শহরে শ্রমিক ও ছাত্রেরা বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরে** এবং সরকার এই বিপ্লব দমনে ব্যর্থ হয়। **মেটারনিক ছদ্মবেশে ইংলণ্ডে পলায়ন করেন,** তাঁর প্রাসাদে অগ্নি-সংযোগ করা হয় এবং তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিপন্ন **সম্রাট প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ড** (Ferdinand I) প্রজাদের নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতি দেন, সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেন, এবং নাগরিকদের নিয়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের প্রস্তাবেও সম্মতি দেন, **হাঙ্গেরীর স্থানীয় প্রতিনিধিসভা** (Diet) **মার্চ মাসেই কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে** (March Laws), যার দ্বারা সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের অবসান, পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতার প্রবর্তন, এবং গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী পার্লামেণ্টের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। **অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী একই সম্রাটের অধীনে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে থাকবে,** কিন্তু এক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে নয়, এ রকম প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। সম্রাট ফার্ডিন্যাণ্ড নিরুপায় হয়ে এ সব প্রস্তাবই মেনে নেন। হাঙ্গেরীর নিজস্ব সৈন্যদল গঠন করা হয়, স্বতন্ত্র জাতীয় পতাকা নির্ধারিত হয়, এবং বিদেশে হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রদূত পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয়। **বোহেমিয়াতেও** হাঙ্গেরীর মত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবী ওঠে এবং সেখানেও **নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়** (মার্চ, ১৮৪৮)। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীনে বোহেমিয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অস্ট্রিয়ার জন্য একটি নূতন সংবিধান সরকারপক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু ভিয়েনার জনসাধারণ এতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় মে মাসে আবার সেখানে গোলযোগ দেখা দেয়।

মেটারনিকের পতন

হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহের সাফল্য

বোহেমিয়ায় সফল অভ্যুত্থান

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হতে **পালা-বদলের সূচনা হয়**। বিপ্লবীদের মধ্যে মতানৈক্য এবং জাতিগত স্বার্থের সংঘাত তাদের দুর্বল করে ফেলে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এর ফলে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

বোহেমিয়াতেই প্রথম বিপ্লবের পরাভব দেখা যায়। সেখানে **চেক ও**

জার্মান, এই দুই জাতির মতানৈক্য এত তীব্র হয়ে ওঠে যে প্রাগ (Prague) শহরের রাজপথে তাদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ দেখা দেয়। অষ্ট্রিয়ার সরকার তখন সেনাপতি **উইণ্ডিশগ্রাত্‌জ্‌কে** (Windischgratz) বিদ্রোহ দমনে পাঠায়, এবং বারো ঘণ্টা গোলা বর্ষণের পর **অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী** ১৭ই জুন তারিখে **প্রাগ অধিকার করে**। বোহেমিয়ার বিপ্লবের এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

বোহেমিয়ায় বিপ্লবের ব্যর্থতা

হাঙ্গেরীতেও অনুরূপভাবে প্রবল ম্যাগিয়ার জাতির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ক্রোট, সার্ব ও রুমানিয়ানদের সংঘর্ষ ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতির লোকেরাই নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সরকারী ভাষা হিসাবে তাদের ভাষার স্বীকৃতি দাবী করে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট **জেলাশিশ** (Jellachich) নামে একজন ক্রোট সেনানায়ককে **ম্যাগিয়ার-বিরোধী বিক্ষোভে ইন্ধন** জোগাবার জন্য নিযুক্ত করেন, এবং তার ফলে হাঙ্গেরীতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আরো বৃদ্ধি পায়।

ইতিমধ্যে সেনাপতি উইণ্ডিশগ্রাত্‌জ্‌ ভিয়েনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে সেনাদলের সাহায্যে **ভিয়েনায় বিপ্লব দমন** করা হয়। খাস অষ্ট্রিয়ায় বিপ্লবীদের পরাজয় ঘটলে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বিপ্লব দমনে সরকারের তৎপরতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ড পদত্যাগ করেন, এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র **ফ্রান্সিস জোসেফ** (Francis Joseph) **অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত** হন। সিংহাসন লাভ করেই তিনি **হাঙ্গেরীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নাকচ করে দেন**, এবং অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে পাঠান। হাঙ্গেরী এবার ফ্রান্সিস জোসেফের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, এবং হাঙ্গেরীর পার্লামেণ্ট কসুথের নেতৃত্বে **হাঙ্গেরীকে একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা** করে (১৮৪৯)। অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের অনুরোধে রাশিয়ার 'জার' **প্রথম নিকোলাস হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনের জন্য রুশ সেনাবাহিনীকে পাঠান। ভিলাগসের** (Vilagos) **যুদ্ধে** রুশ সৈন্যদের কাছে হাঙ্গেরীর সেনাপতি পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। রুশ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে **হাঙ্গেরীতে অস্ট্রিয়ার অধিকার পুনঃস্থাপিত** হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ অষ্ট্রিয়ার সরকার হাঙ্গেরীর বহু দেশপ্রেমিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিন্তু এই বিপ্লবের নেতা **লুই কসুথ** কয়েক হাজার অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে **তুরস্ক সাম্রাজ্যে**

অষ্ট্রিয়ায় বিপ্লব দমন

হাঙ্গেরীর পরাজয়

আশ্রয় নেন। হাঙ্গেরী আবার অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর **একটি সুফল** অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে চিরস্থায়ী হয়। বিপ্লবের সময় সামন্তপ্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **ভূমিদাসপ্রথার** (serfdom) **উচ্ছেদ** ঘোষণা করা হয়েছিল। বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরেও ঐ প্রথা কিন্তু আর ফিরে আসেনি। কৃষকদের বেগার খাটানোর রীতিও সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর অষ্ট্রিয়ার সরকার দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি একেবারে নির্বিকার হয়ে থাকতে পারেনি, মেটারনিকের সরকারের মতো তারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন-বিরোধী ছিল না।

বিপ্লবের সুফল

ইটালীতে বিপ্লব: ভিয়েনা কংগ্রেসে ইটালীর উদারপন্থীদের আশাভঙ্গের কথা আগেই বলা হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ইটালীতে এক নতুন জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল ; দেশের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইটালীর বিভিন্ন ছোট-বড় রাজ্যকে নিয়ে একটি শক্তিশালী অখণ্ড ইটালী রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু ভিয়েনা চুক্তির ফলে ইটালী আবার ছোট-বড় কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হয়, পোপ মধ্য ইটালীতে তাঁর রাজ্য ফিরে পান, এবং **প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সারা ইটালীতেই অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব** প্রতিষ্ঠিত হয়। মেটারনিকের ভাষায়, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ছিল একটি **'ভৌগোলিক সংজ্ঞা'** (geographical expression) মাত্র।

১৮১৫ সালে ইটালী

ভিয়েনা কংগ্রেসের এই অন্যায় ও অবাস্তব সিদ্ধান্ত ইটালীর উদারপন্থীরা মানতে চায়নি। **মেটারনিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির** ফলে ইটালীর ঐক্যের জন্য প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সেখানে গড়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থীরা **নানা গুপ্ত সমিতির** মধ্য দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। এই গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে **'কার্বোনারি'**র (Carbonari) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের কার্যকলাপের ফলেই ১৮২০'র দশকে **নেপলস এবং সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টে বিদ্রোহ** দেখা দেয়, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্যে এই বিদ্রোহগুলি অল্পদিনের মধ্যে দমন করা হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে **জুলাই বিপ্লবের** ঢেউ ইটালীতে পৌছালে মধ্য ইটালীর **পার্মা, মডেনা ও পোপের রাজ্যে আবার বিদ্রোহ** দেখা দেয় এবং সাময়িকভাবে ঐ সব রাজ্যের শাসকেরা স্ব স্ব রাজধানী থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু এবারও মেটারনিকের নির্দেশে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদল বিদ্রোহীদের দমন করে বিতাড়িত রাজাদের সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়।

কার্বোনারি আন্দোলন

'কার্বোনারি' আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বিপ্লবী নায়ক **জোসেফ ম্যাৎসিনি** (Mazzini) **তরুণ ইটালী** (Young Italy) নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩১)। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মিলানের এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ম্যাৎসিনির জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই ম্যাৎসিনি জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ইটালীর শোকের স্মারক হিসাবে সব সময় কালো পোশাক পরে থাকতেন। সাহিত্যের দিকে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা থাকলেও ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের জন্য তিনি লেখক হবার বাসনা ত্যাগ করেন। প্রথম যৌবনে 'কার্বোনারি'তে যোগ দিয়ে তিনি কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি সাময়িকভাবে দেশ ত্যাগ করে চলে যান, কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কার্বোনারি আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠলে তিনি তরুণ ইটালী নামে নতুন জাতীয়তাবাদী সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির কার্যকলাপের ফলে অল্প দিনের মধ্যে ইটালীতে এক ব্যাপক ও শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, যাকে ইটালীর ইতিহাসে **নবজাগরণ আন্দোলন** (Risorgimento = Revival or Resurrection) বলা হয়।



ম্যাৎসিনি

তরুণ ইটালী ও নবজাগরণ আন্দোলন

ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে ম্যাৎসিনি তাঁর **জীবনের প্রধান ব্রত** হিসাবে গ্রহণ করেন। সারা ইটালীকে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করে সেখানে **একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা** করতে হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এর জন্য প্রথম কর্তব্য ছিল অষ্ট্রিয়াকে ইটালী থেকে বহিষ্কার করা। শুধু মাত্র গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব নয় বলে ম্যাৎসিনি মনে করতেন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল **দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন** গড়ে তোলা, যে আন্দোলন বিপ্লবে পরিণতি লাভ করবে। **ইটালীর যুব সম্প্রদায়ের ওপর ম্যাৎসিনির গভীর আস্থা** ছিল। তারা যদি সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করে, তাহলে নতুন ঐক্যবদ্ধ ইটালী গড়ে উঠবেই, এ ছিল তাঁর ধ্রুব

ম্যাৎসিনির লক্ষ্য ও আদর্শ

বিশ্বাস। ম্যাৎসিনি তাঁর এই আদর্শবাদ দেশের বহু যুবকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলেই পরবর্তী কালে ইটালীর ঐক্য স্থাপনের পথ সুগম হয়েছিল। ম্যাৎসিনির শিষ্যদের মধ্যে পরবর্তী কালে সব চেয়ে খ্যাতি লাভ করেন বিপ্লবী বীর **গ্যারিবল্ডি** (Garibaldi)।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে প্রথম **নেপলসে বিদ্রোহ** দেখা দেয়। পরে অষ্ট্রিয়ায় বিপ্লব এবং মেটারনিকের পতনের সংবাদ প্রচারিত হলে **লম্বার্ডি** (Lombardy) ও **ভেনিশিয়ায়** (Venetia) **অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান** ঘটে। অষ্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনী লম্বার্ডির ভিতর চারটি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে। **রোমের পোপও** জনমতের চাপে এই আন্দোলনকে অন্ততঃ মৌখিকভাবে সমর্থন করতে বাধ্য হন। **সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের** রাজা **চার্লস অ্যালবার্ট** (Charles Albert) কিন্তু স্বেচ্ছায় এবং উৎসাহের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দেন, এবং তাঁর নিজের রাজ্যের জন্য একটি লিখিত সংবিধান (Statuto) রচনা করেন।

১৮৪৮ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টা

কিন্তু প্রথম দিকে বিপ্লব সাফল্যলাভ করলেও ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে **অস্ট্রিয়ার সৈন্য-দল ইটালীর সর্বত্র বিদ্রোহ দমন করে।** পোপ **নবম পায়াস** (Pius IX) তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি কার্যকরী করেননি। একমাত্র **চার্লস অ্যালবার্টই** তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেননি ; কিন্তু **কাস্টোজা** (Custozza) **ও নোভারার** (Novara) **যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন,** এবং তাঁর পুত্র **ভিক্টর ইম্যানুয়েল** (Victor Emmanuel) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। **মধ্য ইটালীতে** ম্যাৎসিনির অনুগামীরা দুটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিল, কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী সে দুটি রাষ্ট্র ভেঙ্গে দেয়। এই ভাবে সারা ইটালীতে আবার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব ফিরে আসে।

বিপ্লবের ব্যর্থতা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক (১৮৫০-৭১)
(Relations of Great Powers 1850-71)

পূর্ব ইউরোপের সমস্যা ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য **ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।** গ্রীসের স্বাধীনতা লাভকে (১৮২৯) আমরা **এই সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসে প্রথম পর্ব** বলে চিহ্নিত করতে পারি। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের **দ্বিতীয় পর্বে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন** মিশরের প্রায়-স্বাধীন শাসক (পাশা) **মেহমেত আলি।** মিশর সে সময় নামেমাত্র তুরস্কের অধীন ছিল। মেহমেত আলি ছিলেন আলবানিয়ার এক ভাগ্যান্বেষী। নেপোলিয়নের সংস্পর্শে এসে তিনি ফরাসীদের অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং ফরাসী আদর্শে একটি শক্তিশালী সৈন্য ও নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। গ্রীসের স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে তুরস্কের সুলতানকে সাহায্য করতে তিনি এগিয়ে আসেন, এবং **সামরিক শক্তির সাহায্যে দক্ষিণ গ্রীস অধিকারও করেন।** কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ **নাভারিনোর নৌ-যুদ্ধে তাঁর নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস** হয় ও তিনি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। তাঁর এই সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে তুরস্কের সম্রাট তাঁকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের শাসক পদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ সে প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেননি। তার ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে **মেহমেত আলি সিরিয়া অভিযান করেন,** এবং তাঁর পুত্র ইব্রাহিম এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেন। তুরস্কের এই দুঃসময়ে **সুলতান ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে সাহায্যপ্রার্থী** হন। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, যে রাশিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তুরস্কের প্রধান শত্রু ছিল, একমাত্র সেই **রাশিয়াই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।** ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবারে মেহমেত আলির পক্ষে যোগ দিয়ে সুলতানকে মেহমেত আলির হাতে সিরিয়া তুলে দিতে বাধ্য করে। ক্ষুব্ধ **সুলতান আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন** (১৮৩৩) এবং রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কৃষ্ণ সাগরে (Black Sea) ইংরাজ ও ফরাসীদের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেন।

মেহমেত আলির অভ্যুত্থান (১৮৩২-৪১)

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মেহমেত আলির সঙ্গে তুরস্কের স্থলতানের আবার সংঘর্ষ বাধে ও **মেহমেত আলি তুরস্কের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের** (Constantinople) **দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন**। এবারে ফ্রান্স তাঁর পক্ষ নেয়; কিন্তু রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড একযোগে তুরস্ককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এবং **মেহমেত আলিকে সিরিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য করে** (১৮৪০)। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে **লণ্ডনের সন্ধির** দ্বারা **তুরস্কের স্থলতানের সঙ্গে** তাঁর সাহায্যকারী **ইউরোপীয় শক্তিগুলির মৈত্রী-সম্পর্ক** আবার স্থাপিত হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের রক্ষার ব্যাপারে রাশিয়ার আর কোন বিশেষ দায়িত্ব থাকে না। লুই ফিলিপের ভ্রান্ত নীতির ফলে **ফ্রান্স অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন** হয়ে পড়ে।

মেহমেত আলির পরাজয়

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬)ঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির ইতিহাসে এর পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** (Crimean War)। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও তুরস্ক এবং অপর পক্ষে ছিল রাশিয়া। **যুদ্ধের মূলগত-কারণ** ছিল বলকান অঞ্চলে **ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত**। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহামতি পিটারের আমল (১৬৮৯-১৭২৫) থেকেই **রাশিয়া পূর্ব ইউরোপ থেকে তুরস্ককে উৎখাত করতে সচেষ্ট** ছিল। কিন্তু **ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কায় তুরস্ককে রক্ষা করে যাচ্ছিল**। অবশ্য গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়, এই ধারার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তখন ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি সবাই গ্রীসের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ তুরস্কের বিরোধিতা করে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার 'জার' প্রথম নিকোলাস তুরস্কের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যকে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য এক বিশদ পরিকল্পনা তৈরী করেন, কিন্তু ইংলণ্ড রাশিয়ার অত্যধিক শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।

মূলগত কারণঃ তুরস্কের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থের সংঘাত

ক্রিমিয়ার **যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ** অবশ্য **প্যালেস্টাইনে** খ্রীষ্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত **পবিত্র তীর্থস্থানগুলির অধিকার নিয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ**। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির দ্বারা তুরস্ক সরকার ফরাসী চার্চকে প্যালেস্টাইনের খ্রীষ্টান ধর্মস্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে **কুচুক-কায়নার্ডজির** (Kutchuk-Kainardji) **সন্ধিতে** রুশ চার্চ একই অধিকার তুরস্কের কাছ থেকে লাভ করে। ফরাসী সম্রাট **তৃতীয় নেপোলিয়ন** (Napoleon III) এই সময় ফ্রান্সে রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় রত

ছিলেন। সুতরাং চার্চকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যে ফ্রান্সের ধর্মীয় স্বার্থ, অর্থাৎ ক্যাথলিক চার্চের অধিকার রক্ষা করতে অগ্রসর হন। তা ছাড়া রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস তৃতীয় নেপোলিয়নকে সুনজরে দেখতেন না, উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত মনোমালিন্য যথেষ্ট ছিল। ফরাসী সম্রাট তাই অনেকটা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই রাশিয়ার সঙ্গে ধর্মীয় অধিকার নিয়ে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হলেন, এবং তুরস্ক সরকার এই দুই শক্তিকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে একবার মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হল না। রুশ সরকার তুরস্ককে এই মর্মে এক চরম পত্র দিল যে রাশিয়ার সমস্ত দাবী তুরস্ক অবিলম্বে না মেনে নিলে রুশ সৈন্যবাহিনী তুরস্কের অধীনস্থ **ওয়ালেশিয়া** (Wallachia) ও **মলডেভিয়া** (Maldavia) নামে দুটি রাজ্যখণ্ড অধিকার করে নেবে। অল্প দিন পরেই রুশ বাহিনী এই দুটি স্থান আক্রমণ করলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ইউরোপের ইতিহাসে এই যুদ্ধ **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** নামে পরিচিত।

প্রত্যক্ষ কারণ : প্যালেষ্টাইনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার কলহ

যুদ্ধ বাধার অল্প দিন পরে ইটালীর ক্ষুদ্র রাজ্য **সার্ডিনিয়া-পীডমণ্ট** নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয়। রুশ সরকার ও সৈন্যবাহিনীর অযোগ্যতা এই যুদ্ধে পরিষ্কার ধরা পড়ে। ওয়ালেশিয়া ও মলডেভিয়া থেকে রুশ সৈন্যেরা শীঘ্রই বিতাড়িত হয় এবং ডানিয়ুব (Danube) নদীর তীর পর্যন্ত তাদের হঠে যেতে হয়। ক্রিমিয়া উপদ্বীপের **সিবাস্টোপোল** (Sebastopol) নামক স্থানের রুশ নৌ-ঘাঁটিটি শত্রুপক্ষ অধিকার করে নেয়। **ব্যালাক্লাভা** (Balaclava) ও **ইঙ্কারম্যানের** (Inkermann) যুদ্ধে রুশ সৈন্যেরা চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করে। জার প্রথম নিকোলাস এই যুদ্ধ চলার সময়েই মারা যান। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে **প্যারিসের সন্ধির** (Treaty of Paris) দ্বারা যুদ্ধের নিবৃত্তি হয়।

যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী

প্যারিসের সন্ধিতে বলা হল যে রাশিয়া ওয়ালেশিয়া ও মলডেভিয়ার ওপর তার সমস্ত দাবী এবং প্যালেষ্টাইনে খ্রীষ্টান তীর্থস্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দাবীও ত্যাগ করবে; ডানিয়ুব নদী আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে; এবং কৃষ্ণ সাগরের তীরে রাশিয়া কোন নৌ-ঘাঁটি নির্মাণ করতে পারবে না। তুরস্কের সুলতান এর বিনিময়ে প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টান প্রজাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

প্যারিস সন্ধির সর্ত

প্যারিসের সন্ধির দ্বারা **পূর্ব ইউরোপের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান**

হয়নি। কয়েক বৎসর পরে সন্ধির সর্তগুলি উভয় পক্ষই লঙ্ঘন করে। রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরে যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরী করতে অগ্রসর হয় (১৮৭০) এবং তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাদের অভিভাবকত্বের দাবীও সে কার্যতঃ ত্যাগ করেনি। তুরস্কের সম্রাটও তাঁর খ্রীষ্টান প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সব কারণে কিছুই করেননি। **কোন কোন ঐতিহাসিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে একটি 'নিস্ফল সংগ্রাম' বলে বর্ণনা করেছেন।** কিন্তু আমাদের এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, পূর্ব ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারটি এতই জটিল ছিল যে কোন একটি বা দুটি যুদ্ধের দ্বারা তার নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর ছিল না। রাশিয়ার ওয়ালেশিয়া ও মলডেভিয়া অধিকারের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের যে সাময়িক সমস্যা দেখা দিয়েছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুধু তারই নিষ্পত্তি করে, এবং পতনোন্মুখ **তুরস্ক সাম্রাজ্যকে আর একবার নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের ও আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের সুযোগ করে দেয়।** দুর্ভাগ্যের বিষয়, **তুরস্ক সরকার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।**

নিস্ফল সংগ্রাম

এই যুদ্ধের সময় **রাশিয়ার প্রশাসনিক ও সামরিক দুর্বলতা প্রকট** হয়ে ওঠে, ও তার ফলে **যুদ্ধের পর ঐ দেশে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের দাবী প্রবল হয়।** প্রথম নিকোলাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী **দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার** (১৮৫৫-৮১) এই সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর সময়েই রুশ দেশে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ এবং নানা প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় সংস্কারের সূচনা হয়।

রাশিয়ায় সংস্কার প্রেরণা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইটালীর ক্ষুদ্র রাজ্য **সার্ডিনিয়া-পীডমণ্ট** ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দলে যোগ দিয়ে তাদের সহানুভূতি অর্জন করে। পরবর্তীকালে ঐ দুই দেশের, **বিশেষতঃ ফ্রান্সের, সহায়তায় সার্ডিনিয়া-পীডমণ্ট ইটালীকে অস্ট্রিয়ার অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত করে। রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার বিরোধের সুযোগ নিয়ে প্রাশিয়াও পরবর্তীকালে রাশিয়ার সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করে,** এবং অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে জার্মান সাম্রাজ্য গড়ার চেষ্টায় 'জারের' সমর্থন লাভ করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল যে সুদূর-প্রসারী হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যবিধান

ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যুদয় ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে **দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র** (Second Republic) স্থাপিত হয়েছিল, তা **দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।** নতুন ফরাসী

সরকারের দেশের কৃষকশ্রেণীর উপর বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। তা ছাড়া এই সরকারের দুই প্রধান শরিক **প্রজাতন্ত্রী দল** (Republicans) ও **সমাজতন্ত্রী দলের** (Socialists) **মধ্যে নানা বিষয়ে শীঘ্রই মনোমালিন্য দেখা দেয়।** সমাজতন্ত্রী নেতা **লুই ব্লাঙ্ক** দেশের বেকার যুবকদের কাজ দেবার জন্য যে **জাতীয় কারখানার পরিকল্পনা** করেছিলেন, প্রজাতন্ত্রীরা তা পরোক্ষভাবে বানচাল করে দেয়। সমাজতন্ত্রীদের লাল পতাকাকেও (Red Flag) প্রজাতন্ত্রীরা ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচনার জন্য যে সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সমাজতন্ত্রী দলের শোচনীয় পরাজয় হয় (১৮৪৮)। সমাজতন্ত্রীরা এর প্রতিবাদে প্যারিসে এক বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করে, কিন্তু ফরাসী সরকার বলপ্রয়োগের দ্বারা বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। জাতীয় কারখানার শ্রমিকদের অভ্যুত্থানও একই ভাবে দমন করা হয় (জুন, ১৮৪৮)।

সমাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীদের সংঘর্ষ

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্য যে **নতুন সংবিধান** রচনা করা হয় তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে **রাষ্ট্রপতিকে** (President) **প্রচুর প্রশাসনিক ক্ষমতা** (executive power) **দেওয়া হয়,** এবং দেশের নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার সুযোগে কোন প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতি যে প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে তাঁর ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, এ সম্ভাবনার কথা প্রজাতন্ত্রী নেতারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র **লুই নেপোলিয়ন** যখন শুধু তাঁর বংশের জনপ্রিয়তার জোরে **দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত** হলেন, তখন এই সম্ভাবনাই মারাত্মকভাবে দেখা দিল।

নতুন সংবিধান

লুই নেপোলিয়ন চার বৎসর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন (১৮৪৮-৫২)। এই চার বৎসরের মধ্যেই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে একজোটে কাজ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে **ইটালীতে উদারপন্থীদের অভ্যুত্থান দমনের জন্য ফরাসী সৈন্যবাহিনী নিয়োগ** করা হয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে **শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর ক্যাথলিক চার্চের নিয়ন্ত্রণ** পুনঃস্থাপিত হয় ও শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিরাট অংশকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। **রাষ্ট্রপতি ও প্রতিনিধি সভার মধ্যে** শীঘ্রই **ক্ষমতার দ্বন্দ্ব** উপস্থিত হয়, এবং প্রতিনিধি সভার সমস্ত বিরোধী সদস্যদের

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব

রাতারাতি গ্রেপ্তার করে ও এক নতুন সংবিধান প্রবর্তন করে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা চিরস্থায়ী করবার ব্যবস্থা করেন। 'নেপোলিয়ন' নামের তখন এতই জনপ্রিয়তা যে, ফ্রান্সের লোকেরা লুই নেপোলিয়নের ক্ষমতা-অধিকারের এই চেষ্টায় কোনই বাধা দেয়নি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন (১৮৫২)

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে **লুই নেপোলিয়ন নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন,** এবং ফ্রান্সের অধিবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে তাঁর এই কাজের পূর্ণ অনুমোদন করে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের এইভাবেই পতন হয়।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতিঃ ১৮৫২ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আঠার বৎসর লুই নেপোলিয়ন **সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন** (Napoleon III) নামে ফ্রান্স শাসন করেন। তিনি যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফ্রান্সের ইতিহাসে তা **'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য'** (Second Empire) নামে পরিচিত (নেপোলিয়নের রাজত্বকে 'প্রথম সাম্রাজ্য' হিসাবে গণনা করে)। নেপোলিয়ন

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রকৃতি

ও তৃতীয় নেপোলিয়ন দুজনেই দাবী করতেন যে তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে স্বৈরাচারী বলে মনে হলেও যেহেতু ফ্রান্সের জনগণের দ্বারা তা অনুমোদিত হয়েছে, সে কারণে তা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনেরই নামান্তর। **দুই নেপোলিয়নেরই ক্ষমতা-অধিকারকে ফ্রান্সের জনসাধারণ গণভোটের (plebiscite) মাধ্যমে সমর্থন করেছিল।** তাঁদের রচিত সংবিধানও বিপুল ভোটাধিক্যে ফ্রান্সের জনগণ অনুমোদন করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের প্রশাসন ও আইন-প্রণয়নের সঙ্গে জনসাধারণের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে দুই নেপোলিয়নের কেউই তা থাকতে দেননি। **এঁদের শাসন ছিল আসলে ব্যক্তিগত একনায়কত্বের নামান্তর** এবং তার রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না দক্ষিণপন্থী, না বামপন্থী। তবে প্রথম নেপোলিয়নের অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক



তৃতীয় নেপোলিয়ন

তৃতীয় নেপোলিয়ন

দূরদৃষ্টি তৃতীয় নেপোলিয়নের ছিল না, ফলে **তাঁর শাসন প্রথম নেপোলিয়নের শাসনের একটি অক্ষম ও হাস্যকর অনুকরণ হয়ে দাঁড়ায়।** তৃতীয় নেপোলিয়ন যদি তাঁর পিতৃব্যের মতো সাফল্য

অর্জন করতে পারতেন, তা হলে হয়তো তাঁর সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি তা পারেননি ; ফলে পরবর্তী সঙ্কটেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের **আভ্যন্তরীণ শাসনকে** এক কথায় **প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্র** বলা যেতে পারে। দেশের জনগণকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেও তাদের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এই সরকার আদৌ অমনোযোগী ছিল না। প্রথমতঃ, তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর **দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সংবিধানকে** প্রথম নেপোলিয়নের সংবিধানের আদর্শে রচনা করেন। 'কাউন্সিল অব স্টেট' এবং 'সিনেট' নামে দুটি পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্রাট শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, এবং এদের কোনটিই জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ছিল না। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভার (Legislative Chamber) ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। দেশে রাজনৈতিক সভা-সমিতির আয়োজন করা নিষিদ্ধ হয়েছিল, এবং সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়নি। মধ্যে মধ্যে গণভোটের আয়োজন করা হলেও সরকারী আমলাদের হস্তক্ষেপের ফলে দেশে স্বাধীন নির্বাচন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বহু স্বাধীনতা-প্রিয় ফরাসী নাগরিক এই সময় ফ্রান্স ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় ; এদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো (Victor Hugo)।

রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কোচ

দ্বিতীয়তঃ, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন **ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির** জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। রেলপথ নির্মাণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার, টেলিগ্রাফের প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে সরকার যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। কল-কারখানায় যে সব শ্রমিক কাজ করত তাদের জন্য উন্নততর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকদের স্বাধীন সংগঠন (trade union) গড়বার অধিকারও স্বীকার করা হয়। রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল এবং নিরাশ্রয় লোকেদের জন্য আশ্রম (asylum) নির্মাণ করে সম্রাট তাঁর দরিদ্র প্রজাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

অর্থনৈতিক উন্নতি

তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের **বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে** সহায়তা করার জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার **ইংলণ্ডের সঙ্গে এক বাণিজ্য-চুক্তি** সম্পাদন করে। দুই দেশের মধ্যে নিঃশুল্ক বাণিজ্যের নীতি এই চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই চুক্তির ফলে শেষ পর্যন্ত

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার

ফ্রান্সের চেয়ে ইংলণ্ডই বেশি উপকৃত হয়, কারণ দুই দেশের মধ্যে ইংলণ্ডই ছিল বেশি শিল্পোন্নত।

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর প্রজাদের মুগ্ধ করবার জন্য **প্রচুর আড়ম্বরপূর্ণ এক রাজসভা** গড়ে তোলেন। রাজধানী **প্যারিসের সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজেও** তৃতীয় নেপোলিয়ন উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে বিপ্লবীরা যাতে সহজে রাজপথ অবরোধ করে সৈন্য-চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য রাজপথগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত করা হয়। বহু বেকার লোককে এই কাজে নিয়োগ করে সাময়িকভাবে তাদের কর্ম-সংস্থানও করা হয়।

প্যারিসের সংস্কার ও পুনর্গঠন

তৃতীয় নেপোলিয়নের এই সব কীর্তি সত্ত্বেও **ফ্রান্সের জনমত দিন দিন তাঁর বিরোধী হয়ে উঠছিল**। প্রজাতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী দল আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। প্রথম 'ইণ্টারন্যাশনাল' (First International) নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সংগঠনের একটি শাখা প্যারিসে ১৮৬৪ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সমস্ত **রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি** দেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত **আইনসভার ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়**। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ (censorship) শিথিল করা হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে **পার্লামেণ্টারি শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন** করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার আগেই তাঁর পতন হয়।

রাজনৈতিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ঃ বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতাই যে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর **বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য** ছিল **সামরিক গৌরব অর্জন** এবং চমকপ্রদ সাফল্যের দ্বারা দেশবাসীর কাছে আপন মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি। যে **ভিয়েনা চুক্তি** নেপোলিয়নের তথা ফ্রান্সের পরাজয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে **নস্যাৎ করা,** এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে **জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন** করে নিজের প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দেওয়াও তাঁর বৈদেশিক নীতির অন্য দুটি লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে নেপোলিয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললেও নেপোলিয়নের অসাধারণ সামরিক প্রতিভা বা ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি তাঁর ছিল না। ফলে নেপোলিয়নের তুলনায় তাঁর সাফল্যও হয়েছিল অনেক সীমিত। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ-

বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে তিনি যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, পরিণামে তা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পতন ডেকে আনে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য—**ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬) জয়লাভ**। আগেই বলা হয়েছে যে, প্যালেস্টাইনে তুরস্ক সম্রাটের অধীনস্থ খ্রীষ্টান তীর্থস্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে ফ্রান্স ও রাশিয়ার পরস্পর-বিরোধী দাবী এবং তুরস্ক সরকারের গোপনে উভয়কেই প্ররোচনা দেওয়ার নীতি ছিল এই যুদ্ধের মূলগত কারণ। তা ছাড়া জার নিকোলাসের সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত কারণেও কিছুটা মনোমালিন্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ওয়ালেশিয়া ও মলডেভিয়া অধিকার করতে উদ্যত হলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, এবং দু বৎসর যুদ্ধ চলার পর রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের বিশেষ কিছুই লাভ হয়নি, তবে যুদ্ধের শেষে প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের অধিবেশন বসলে **ফ্রান্স আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা মর্যাদা লাভ করে**। কিন্তু অকারণে রাশিয়ার বিরাগভাজন হয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন পরিণামে নিজেরই ক্ষতি করেছিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান

এর পর **তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয় ঐক্যবিধানের সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়েন**। ফরাসী সম্রাট চিরকালই নিজেকে একজন জাতীয়তাবাদী (Nationalist) বলে গর্ব বোধ করতেন। সুতরাং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী **কাভুর** (Cavour) যখন ইটালী থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়নের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন সহজেই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন। ইটালীর সঙ্গে প্রথম নেপোলিয়নের স্মৃতি জড়িত ছিল। তা ছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়ন যৌবনে কার্বোনারি নামে ইটালীর জাতীয়তাবাদীদের গোপন সমিতির সভ্যও ছিলেন। ইটালী থেকে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব লোপ করতে পারলে ফ্রান্সেও তাঁর বিশেষ জনপ্রিয় হবার কথা। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাভুরের সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নের গোপন চুক্তি হবার পর দুই দেশের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ও পরপর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভও করে। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন এর পর হঠাৎ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে (Armistice of Villafranca) যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। সম্ভবতঃ ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ইটালী রাজ্যের অভ্যুত্থান পরিণামে তাঁর দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। তাছাড়া প্রাশিয়ার দিক

ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম

থেকে আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল। তাঁর এই আকস্মিক মত পরিবর্তন কাভুরের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও অসুবিধাজনক হলেও ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম এতে ব্যাহত হয়নি, এবং পরবর্তী কালে তৃতীয় নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়ার সঙ্গে মধ্য ইটালীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সংযুক্তির প্রস্তাব সমর্থন করলে কাভুর তাঁকে স্যাভয় (Savoy) ও নীস সমর্পণ করেন। কিন্তু এর পরেও ফরাসী সম্রাট রোমে পোপের ক্ষমতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং নতুন ঐক্যবদ্ধ ইটালী রোমকে গ্রাস না করে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর এই অদ্ভুত স্ববিরোধী নীতির ফলে তিনি **ইটালীর জাতীয়তাবাদীদের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন,** এবং ফ্রান্সেও কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে তৃতীয় নেপোলিয়নের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় **কোচিন-চীন** রাজ্যে তিনি ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন (১৮৬৪)। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের (Civil War) সুযোগ নিয়ে মধ্য আমেরিকার **মেক্সিকোয় (Mexico) ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা** করে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংলণ্ড ও স্পেন প্রথম দিকে তাঁকে সাহায্য করলেও শীঘ্রই তারা সরে দাঁড়ায়, এবং ছয় বৎসর যুদ্ধের (১৮৬১-৬৭) পর মেক্সিকোবাসীদের দৃঢ় প্রতিরোধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কাছে **ফ্রান্সকে নতি স্বীকার করতে হয়।** এই যুদ্ধে **তৃতীয় নেপোলিয়নের গৌরবহানি** হওয়া ছাড়াও তাঁকে **প্রচুর অর্থক্ষয় ও লোকক্ষয়** স্বীকার করতে হয়।

মেক্সিকোয় রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা

ইতিমধ্যে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়া জয়লাভ করে, এবং উত্তর জার্মানীর রাজ্যগুলিকে নিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে **উত্তর জার্মান রাজ্যসঙ্ঘ** (North German Confederation) গঠিত হয়। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য না করে তৃতীয় নেপোলিয়ন পরোক্ষভাবে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিরই সহায়ক হন। এর পর প্রাশিয়া মেইন (Main) নদীর দক্ষিণে অন্য জার্মান রাজ্যগুলিকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে তৃতীয় নেপোলিয়নের টনক নড়ে। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া তখন ফ্রান্সের উপর বীতশ্রদ্ধ, এবং ইংলণ্ড ও ইটালীকেও প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক (Bismarck) সুকৌশলে আপন দলভুক্ত করে নেন। ফলে ফ্রান্সকে একাই প্রাশিয়াকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হতে হয়। **স্পেনের উত্তরাধিকারের সমস্যা** নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, এবং সুচতুর বিসমার্ক এই মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যাতে নিজের মর্যাদারক্ষার জন্যই তৃতীয় নেপোলিয়নকে যুদ্ধে নামতে হয়। ফ্রান্স ও

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ (১৮৭০)

প্রাশিয়ার যুদ্ধে (Franco-Prussian War) ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয় ও তৃতীয় নেপোলিয়ন **সেডানের** (Sedan) রণক্ষেত্রে আশী হাজার ফরাসী সৈন্যসহ জার্মানদের হাতে বন্দী হন (১৮৭০)। এই যুদ্ধের ফলে একদিকে ফ্রান্সে **দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন** হয়, অপরদিকে **জার্মানীর ঐক্যবিধান সম্পূর্ণ** হয়। জার্মান শিবির থেকে মুক্তি লাভের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন ও ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন

কিছুটা ভাগ্যচক্রে ও কিছুটা প্রথম নেপোলিয়নের অসাধারণ জনপ্রিয়তার সুযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হঠকারী বৈদেশিক নীতির ফলে একে একে তিনি রাশিয়া, ইটালী ও অষ্ট্রিয়ার সহানুভূতি হারান, এবং বিসমার্কের কূটনীতির কাছে পরাজিত হয়ে অবশেষে তাঁকে সিংহাসন হারাতে হয়।

ইটালীর ঐক্যবিধান (**Unification of Italy**)

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যুত্থানগুলির শোচনীয় ব্যর্থতার পর ইটালী আবার ভিয়েনা চুক্তির অব্যবহিত পরেকার অবস্থায় ফিরে যায়। একাধিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্যের সহাবস্থান, সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসন এবং অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য ইটালীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই তিনটিই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি মাত্র ইটালীয় রাজ্যে আমরা এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি, তার নাম **সার্ডিনিয়া-পীডমণ্ট**। সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের রাজা **চার্লস অ্যালবার্ট** ইটালীকে অষ্ট্রিয়ার প্রভাবমুক্ত করতে গিয়ে ইতিপূর্বেই তাঁর সিংহাসনকে বিপন্ন করেছিলেন এবং নিজের রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রচলন করে ইটালীর অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসকদের সামনে তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও স্থাপন করেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী **দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েল** (Victor Emmanuel II) অষ্ট্রিয়া সরকারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও পিতার প্রদত্ত সংবিধান প্রত্যাহার করে নেননি। ইটালীর বিভিন্ন রাজ্য থেকে পলাতক উদারপন্থীরা এসে তাঁর রাজ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করত। স্বভাবতঃই, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর সার্ডিনিয়া-পীডমণ্ট রাজ্য ইটালীর জাতীয়তাবাদীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং সেখানকার স্যাভয় বংশীয় (House of Savoy) রাজার নেতৃত্বেই শেষ পর্যন্ত ইটালীর ঐক্যবিধান প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের নেতৃত্ব

ম্যাৎসিনির **তরুণ ইটালী আন্দোলনের ব্যর্থতা** থেকে ইটালীর উদারপন্থীরা

এই সিদ্ধান্তে আসেন যে তাঁর প্রদর্শিত পথে ইটালীর রাজনৈতিক মুক্তি আসার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। অন্য কোন পথে ইটালীকে অষ্ট্রিয়ার প্রভাবমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তী কালে **ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনের প্রধান নায়ক হন দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলের প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট কাভুর** (Count Cavour)। ম্যাৎসিনির মত কাভুর জননেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন কূটনীতিবিদ। ম্যাৎসিনি ছিলেন প্রজাতন্ত্রের ভক্ত, কিন্তু কাভুর ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। ম্যাৎসিনি চাইতেন বাইরের কোন শক্তির সাহায্য না নিয়েই ইটালীবাসীরা তাদের দেশকে অষ্ট্রিয়ার প্রভাবমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করবে। কিন্তু কাভুরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গণ-আন্দোলনের পথে নয়, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ন্যায় বৃহৎ শক্তির সহায়তায় কূটনীতি ও যুদ্ধের পথেই ইটালীর মুক্তি ও ঐক্য আসবে। সামরিক শক্তিতে তাঁর দৃঢ় অবস্থা ছিল বলে তিনি সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের জন্য একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। সার্ডিনিয়ার রাজার নেতৃত্বে সমস্ত জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সুসংহত করবার জন্য কাভুর 'জাতীয় সমিতি' (National Society) নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থাও স্থাপন করেন।

কাভুরের রাজনৈতিক আদর্শ



কাভুর

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিত্বলাভের পর ইটালীর ঐক্য-বিধানের উদ্দেশ্যে কাভুরের প্রথম পদক্ষেপ হল **ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান**। এই যুদ্ধে সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না; কিন্তু কাভুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহায়তা করে তাদের সহানুভূতি লাভ, এবং তাঁর এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর **প্যারিসে যে শান্তি সম্মেলন বসে** (১৮৫৬) **কাভুর তাতে অস্ট্রিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও আমন্ত্রিত হন**, এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সামনে ইটালীর সমস্যা তুলে ধরে ইটালীর ঐক্য বিধান প্রচেষ্টায় তাদের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ক্ল্যারেণ্ডন (Clarendon) কাভুরের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

এর পর কাভুর ফরাসী সম্রাটের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন (জুলাই, ১৮৫৮)। **প্লম্বিয়ার্সের চুক্তিতে** (Pact of Plombieres) সম্রাট তৃতীয়

নেপোলিয়ন কাভুরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে যদি অষ্ট্রিয়া তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাহলে ফ্রান্স সার্ডিনিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। ফ্রান্সের সহায়তায় এই যুদ্ধে জয়লাভ করলে কাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নীস নামে ইটালীর দুটি অঞ্চল সমর্পণ করবেন বলে কথা দেন। এর পর কাভুর অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার সুযোগ সন্ধান করেন। সার্ডিনিয়ার যুদ্ধের প্রস্তুতি ও লম্বার্ডির কাছে সৈন্য-সমাবেশের ফলে অষ্ট্রিয়ার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ও সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কাভুরকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। **ম্যাজেণ্টা** (Magenta) ও **সলফেরিনোর** (Solferino) **যুদ্ধে** (জুন, ১৮৫৯) ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী অষ্ট্রিয়াকে পর্যুদস্ত করে এবং ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার রাজ্য লম্বার্ডি (Lombardy) তাদের হস্তগত হয়। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন এর পর অকস্মাৎ অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে **ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি** করে যুদ্ধ ত্যাগ করেন। এই সন্ধিতে বলা হয় যে ইটালীর যে সব রাজা ইতিমধ্যে ভয়ে তাঁদের রাজ্য ত্যাগ করে পলায়ন করেছিলেন তাঁদের স্ব স্ব রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে, **সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি লাভ করবে,** কিন্তু ভেনিশিয়া (Venetia) অষ্ট্রিয়ার অধীনেই থাকবে, এবং ইটালীর সব কটি রাজ্য নিয়ে পোপের নেতৃত্বে একটি রাজ্যসঙ্ঘ (Confederation) গড়ে তোলা হবে। ইটালীর উদারপন্থীরা এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত হতাশা বোধ করেন, এবং ক্ষোভে, দুঃখে কাভুর তাঁর মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল কিন্তু কাভুরের চেয়েও স্থিতধী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধিকে মন্দের ভালো বিবেচনায় মেনে নেন।

ফ্রান্সের সঙ্গে গোপন চুক্তি

ফ্রান্সের যুদ্ধত্যাগ

ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ইতিমধ্যে **মধ্য ইটালীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান** দেখা গিয়েছিল। **পার্মা, মডেনা, টাস্কানী ও রোমানা** (Romagna) **রাজ্যের** প্রজারা ক্ষমতা অধিকার করে, এবং তারা কোন মতেই ভিলাফ্রাঙ্কার চুক্তি অনুযায়ী তাদের পলাতক রাজাদের ফিরিয়ে নেবে না বলে ঘোষণা করে (আগষ্ট, ১৮৫৯)। কাভুর কোনদিনই বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু মধ্য ইটালীর এই অভ্যুত্থানগুলি তাঁর কাছে দৈব-প্রেরিত সুযোগ বলে মনে হয়। অল্পকালের মধ্যেই তিনি আবার সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরে যান, এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে এই মর্মে এক রফা করেন যে **মধ্য ইটালীর রাজ্যগুলিতে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাবে গণভোট** নেওয়া হবে। গণভোটের মাধ্যমে যদি ঐ রাজ্যগুলির লোকেরা সংযুক্তির প্রস্তাব সমর্থন করে তাহলে

মধ্য ইটালীর অভ্যুত্থান

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাতে বাধা দেবেন না। এই ভাবে গণভোটের মাধ্যমে মধ্য ইটালীর **পার্মা, মডেনা, টাস্কানী ও রোমানা রাজ্য সার্ডিনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়,** এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর এই সাহায্যের জন্য স্যাভয় ও নীস লাভ করেন (মার্চ, ১৮৬০)।

গ্যারিবল্ডির অভিযান

এই ঘটনার দুই মাসের মধ্যেই দক্ষিণ ইটালীর **নেপলস-সিসিলী রাজ্যের** (Kingdom of the Two Sicilies) প্রজারা বুর্বোঁ বংশীয় রাজা **দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের** বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ম্যাৎসিনির সুযোগ্য শিষ্য বীর **গ্যারিবল্ডি** এই সুযোগে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে সিসিলী দ্বীপ আক্রমণ করেন। তিন মাসের মধ্যে তাঁর 'লালকোর্তা বাহিনী' (Red Shirts) **সিসিলী দ্বীপ জয় করে,** এবং গ্যারিবল্ডি তার পর প্রায় বিনা বাধায় **নেপলস আক্রমণ ও অধিকার** করেন। গ্যারিবল্ডির মনে রোম জয়ের বাসনাও ছিল, কিন্তু ফরাসী সৈন্যেরা তখন রোম রক্ষা করছিল এবং গ্যারিবল্ডি রোম আক্রমণ করলে ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য এবং গ্যারিবল্ডি যাতে দক্ষিণ ইটালীতে একটি স্বতন্ত্র ইটালীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন না করেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য কাভুর সার্ডিনিয়া-রাজ ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে নেপলস অভিযানে উৎসাহিত করেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল প্রথমে মধ্য ইটালীতে **রোম বাদে পোপের রাজ্যের বাকী অংশটুকু সব অধিকার** করেন এবং তার পর

দক্ষিণ ইটালীর সার্ডিনিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি



গ্যারিবল্ডি

সসৈন্যে নেপলসে উপস্থিত হন। গ্যারিবল্ডি ছিলেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক ; তিনি প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হলেও ইটালীর ঐক্যের খাতিরে ভিক্টর ইম্যানুয়েলের সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধা বোধ করলেন না। বিজিত রাজ্যগুলির প্রজারা গণ-ভোটের মাধ্যমে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করল। **১৮৬১** খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে **ভিক্টর ইম্যানুয়েল 'ইটালীর রাজা' উপাধি গ্রহণ করলেন**। ভেনিশিয়া ও রোম শহর বাদে সারা ইটালী তাঁর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হল। এর তিন মাস বাদে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে **কাভুরের মৃত্যু** হয়।

কাভুর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ইটালীর ঐক্য দেখে যেতে না পারলেও দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে **অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষ নেয়** এবং যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটলে বিসমার্ক প্রাগের চুক্তির দ্বারা **ইটালীকে ভেনিশিয়া অধিকার করার অনুমতি দেন** (১৮৬৭)। তিন বৎসর পরে **ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ** বাধলে তৃতীয় নেপোলিয়ন আত্মরক্ষার জন্য রোম থেকে সমস্ত ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যান। এই সুযোগে **ভিক্টর**

ভেনিশিয়া ও রোম অধিকার



ইটালীর ঐক্যবিধান
১৮৬১-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ

ইম্যানুয়েল রোম শহর অধিকার করে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন (১৮৭০)। ইটালীর জাতীয়তাবাদীদের বহু দিনের স্বপ্ন এত দিন পরে বাস্তবে রূপায়িত হয়। স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ইটালী ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে নিজের স্থান করে নেয়।

জার্মানীর ঐক্যবিধান (Unification of Germany)

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর জার্মানীর সর্বত্র আবার **স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত** হয় এবং উদারপন্থীদের উপর প্রচণ্ড উৎপীড়ন চলে। হাজার হাজার লোক তাদের রাজনৈতিক মতামতের জন্য দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জার্মানীতে এই সময় এক নবযুগের সূচনা হয়। বিজ্ঞান-চর্চা ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে জার্মানীতে **শিল্প-বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত** হয়। রেলপথের প্রসার ও ব্যাঙ্ক সংগঠনের উন্নতির ফলে **বাণিজ্যের দ্রুত অগ্রগতি** ঘটে। **সলভেরিন** (Zollverein) নামে জার্মান আন্তঃরাষ্ট্রীয় শুল্ক সংস্থাটির কার্যকলাপের ফলে জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে **বাণিজ্য বিষয়ে যে একতাবোধ জাগ্রত হয়** কালক্রমে তা জার্মান রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান উদারপন্থীরা 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন' (National Union) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল স্থাপন করে, এবং এর দু বৎসর পরে প্রাশিয়াতে জার্মান 'প্রোগ্রেসিভ পার্টির' (Progressive Party) জন্ম হয়। জার্মান রাজনীতিতে ক্রমশই **প্রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি ও অস্ট্রিয়ার আধিপত্য হ্রাস** লক্ষিত হতে থাকে। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার বাসনা প্রাশিয়ার বহু দেশপ্রেমিকের মনে এ সময় জাগ্রত হয়। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই জার্মানীর ঐক্য-বিধান প্রচেষ্টার ইতিহাস আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

ঐক্য-আন্দোলনের পটভূমিকা

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে **অটো ফন বিসমার্ক** (Otto Von Bismarck) **প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী** (Minister-President) নিযুক্ত হন। বিসমার্ক জার্মানীর ধনী ভূস্বামীদের (Junker) প্রতিনিধি ছিলেন। **রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নিতান্ত রক্ষণশীল** বা প্রাচীনপন্থী। উদারনীতিতে বা গণ-আন্দোলনে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। **কিন্তু মেটারনিকের মতো তিনি সব রকম পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন না।** যেখানে সামান্য কিছু পরিবর্তন স্বীকার করলে প্রচলিত রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করা সম্ভব হত, সেখানে তিনি ঐ পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতেন। তা ছাড়া বিসমার্ক ছিলেন **প্রখর বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ** (Realpolitiker)। বাস্তববাদী হিসাবে অনেক সময়ে তিনি আপাতদৃষ্টিতে উদারনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পশ্চাৎপদ হতেন না, যদিও তাঁর লক্ষ্য উদারপন্থীদের লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। জার্মান উদারপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রের দাবী তিনি আপাতদৃষ্টিতে

বিসমার্কের রাজনৈতিক আদর্শ

মেনে নিয়েছিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাসনা ছিল প্রাশিয়ার রাজার নেতৃত্বে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র গঠন। জার্মান আইনসভার সদস্য হিসাবেই বিসমার্ক ঘোষণা করেছিলেন যে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুটি রাষ্ট্রের একত্র সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়, এদের একটিকে জার্মানী ত্যাগ করতেই হবে। বিসমার্কের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়েই জার্মান সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়। জার্মান আইনসভার বন্ধ্যা রাজনীতি বিসমার্ককে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা জার্মানীর জটিল রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান কখনোই সম্ভব হবে না, সে কাজ সম্ভব হবে রক্তপাত ও অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা (Policy of blood and iron)। বিসমার্কের এই বক্তব্য তাঁর বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক।



বিসমার্ক

প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা প্রথম উইলিয়াম (William I) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি **ফন রুনকে** (Von Roon) সমর সচিব ও **ফন মোল্‌টকে**-কে (Moltke) প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু প্রাশিয়ার আইনসভা তাঁর এই কাজের জন্য যথেষ্ট অর্থ অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। ক্ষোভে, দুঃখে উইলিয়াম পদত্যাগ করতে মনস্থ করেন, কিন্তু তাঁর সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং **আইনসভার বিনা অনুমোদনেই তিনি অতিরিক্ত কর আদায় করে সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা করেন।** কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী শুধু জার্মানীতে নয়, সারা ইউরোপে সব চেয়ে শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী রূপে পরিচিত হয় এবং এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমস্ত জার্মানীকে একটি

প্রাশিয়ার সৈন্যবল বৃদ্ধি

ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। প্রাশিয়ার উদারপন্থীদের এইখানেই প্রথম পরাজয় হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে **পোল্যাণ্ডে রুশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ** দেখা দিলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু রাশিয়ার এই দুর্দিনে **বিসমার্ক জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন** এবং পলাতক বিদ্রোহীদের জার্মানীতে এসে আশ্রয় গ্রহণের পথ বন্ধ করেন। এইভাবে কূটনীতির একটি চালে বিসমার্ক রাশিয়াকে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার বৈরী করে তোলেন, এবং পরবর্তী কালে কখনো অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার সংঘর্ষ বাধলে রাশিয়ার সমর্থন লাভের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন।

রাশিয়ার সহানুভূতি লাভ

পরের বৎসরই (১৮৬৪) বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহায়তায় **ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ** ঘোষণা করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন চুক্তি (Treaty of London) অনুসারে **শ্লেসউইগ** (Schleswig) ও **হলস্টাইন** (Holstein) নামে দুটি ছোট রাজ্যখণ্ড (Duchy) ডেনমার্কের রাজার ব্যক্তিগত শাসনাধীন ছিল, কিন্তু ডেনমার্ক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং, হলস্টাইন আইনতঃ জার্মান রাজ্যসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হলস্টাইনের প্রায় সব অধিবাসী এবং শ্লেসউইগেরও অধিকাংশ প্রজা ছিল জাতিতে জার্মান। ডেনমার্কের রাজা দুটি অঞ্চলকেই নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছিলেন, কিন্তু শ্লেসউইগের জার্মান অধিবাসীরা তাদের দেশকে জার্মান রাজ্যসঙ্ঘের সদস্য করা হোক বলে দাবী জানাচ্ছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের আইনসভা একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে শ্লেসউইগকে ডেনমার্ক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করে। জার্মান প্রতিনিধি সভা (Diet) অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, এবং বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহায়তায় ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ডেনমার্ক অল্পায়াসেই পরাজিত হয় এবং **ভিয়েনার চুক্তির** (১৮৬৪) দ্বারা দুটি রাজ্যখণ্ডের উপরেই তার দাবী ত্যাগ করে। এর পর অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে **গাস্টিনের সন্ধি** (Treaty of Gastein) অনুসারে প্রাশিয়া শ্লেসউইগ এবং অষ্ট্রিয়া হলস্টাইন লাভ করে (১৮৬৫)। প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির একটি পরীক্ষা এই যুদ্ধে হয়ে গেল।

ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৪)

এর পর বিসমার্ক **অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি** করে জার্মান রাজ্যসঙ্ঘ থেকে তাকে বিতাড়িত করতে চাইলেন। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে **বিয়ারিট্জে** (Biarritz) দেখা করে বিসমার্ক তাঁর কাছ থেকে এই গোপন আশ্বাস নিয়ে ফিরলেন যে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স সেই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে।

ইংলণ্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিসমার্কের সন্দেহ ছিল না, কারণ ইংলণ্ড সচরাচর ইউরোপের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না। রাশিয়া বিসমার্কের কাছে পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমনে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল। ইটালীকেও ভেনিশিয়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিসমার্ক তাকে দলে টেনে নিলেন। এর পর বিসমার্ক হঠাৎ জার্মান রাজ্যসজ্ঞের পুনর্গঠন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জার্মান প্রতিনিধি সভার নির্বাচন বিষয়ে একটি সংস্কার-পরিকল্পনা পেশ করলেন। অষ্ট্রিয়ার এই পরিকল্পনা আদৌ পছন্দ ছিল না। অষ্ট্রিয়া বিসমার্ককে জব্দ করার জন্য শ্লেসউইগ ও হলস্টাইনের সমস্যা জার্মান প্রতিনিধি সভার সামনে নিয়ে এল। প্রাশিয়া ইতিমধ্যে হলস্টাইনের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে ঐ রাজ্যখণ্ডটি আক্রমণ করে বসেছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার ঐ কাজকে বিসমার্ক এখন গাস্টিন চুক্তির বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন, জার্মান রাজ্যসজ্ঞকেই অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করার অপরাধে ভেঙ্গে দিলেন এবং **অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন**। জার্মান রাজ্যসজ্ঞের অধিকাংশ বৃহৎ রাজ্য অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করলেও মাত্র **সাত সপ্তাহের যুদ্ধে** বিসমার্ক তাঁর সমস্ত শত্রু রাষ্ট্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করলেন। **স্যাডোয়ার যুদ্ধে** (Battle of Sadowa) অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটার পর **প্রাগের সন্ধির** (Peace of Prague) দ্বারা অষ্ট্রিয়া ভেনিশিয়ার উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করল এবং প্রাশিয়াকে হলস্টাইন রাজ্যখণ্ড ও কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হল। বিসমার্ক ইচ্ছা করেই অষ্ট্রিয়ার উপর আর কোন কঠিন বা অপমানজনক সর্ত আরোপ করলেন না (১৮৬৬)।

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৬)

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের পর মেইন নদীর উত্তরে জার্মানীর সমস্ত রাজ্যগুলিকে নিয়ে বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি **উত্তর জার্মান রাজ্যসজ্ঞ** (North German Confederation) গঠন করলেন। অষ্ট্রিয়া এই রাজ্যসজ্ঞের সদস্য রইল না। প্রাশিয়ার রাজা এই সজ্ঞের স্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং বিসমার্ক এর প্রধানমন্ত্রী (Federal Chancellor) হলেন। ইটালী প্রাশিয়াকে সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ ভেনিশিয়া লাভ করল। এর পর বিসমার্কের প্রধান সমস্যা হল দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিকে উত্তর জার্মান রাজ্যসজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত করে একটি অখণ্ড জার্মান রাজ্যসজ্ঞ গঠন। দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক রাজ্যগুলি সহজে প্রোটেস্টান্ট প্রাশিয়ার বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত হবে না, বিসমার্ক তা জানতেন। তা ছাড়া প্রাশিয়ার উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ফ্রান্স এই চেষ্টায় বাধা দেবে, এ বিষয়েও বিসমার্ক নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ও ইটালী

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৭০-৭১)

বিসমার্কের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল ; ইংলণ্ড তৃতীয় নেপোলিয়নের বেলজিয়াম গ্রাসের সম্ভাবনায় ভীত ছিল ; আর অষ্ট্রিয়াও প্রাগের সন্ধির পর বিসমার্কের উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিল না। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলির মধ্যেও বিসমার্ক ধীরে ধীরে ফরাসী আক্রমণের আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিলেন। এর পর তাঁর প্রধান কাজ হল ফ্রান্সকে শক্তি পরীক্ষায় পরাজিত করে দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিকে নতুন জার্মান রাজ্যসঙ্ঘে যোগ দিতে বাধ্য করা।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ পেতে বিসমার্কের খুব বিলম্ব হল না। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে রাণী দ্বিতীয় ইসাবেলা (Isabella II) সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন। স্পেনের নতুন সরকার প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ণ (Hohenzollern) রাজবংশের রাজকুমার **লিওপোল্ডকে** তাদের রাজা হিসাবে মনোনীত করে। তৃতীয় নেপোলিয়নের এ বিষয়ে প্রবল আপত্তি থাকায় লিওপোল্ড এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ফরাসী সরকার এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে প্রাশিয়ার রাজার কাছে এই প্রতিশ্রুতি দাবী করে যে লিওপোল্ড ভবিষ্যতে কখনো স্পেনের সিংহাসন-প্রার্থী হবেন না। প্রাশিয়ার রাজা ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে ভদ্রভাবে জানান যে এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এবং বিসমার্কের কাছেও একটি টেলিগ্রাম মারফৎ তিনি ফরাসী রাজদূতের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছিল তা জানিয়ে দেন। বিসমার্ক এই টেলিগ্রামটিকে (Ems Telegram) কিছুটা বিকৃত করে জার্মান সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন, যাতে জার্মানদের ধারণা হয় যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাদের রাজাকে অপমান করেছে, আর ফরাসীদের মনে হয় যে প্রাশিয়ার রাজাই তাদের রাষ্ট্রদূতকে অপমান করে বিদায় দিয়েছে। ফলে উভয় দেশেই তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং **তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রথম প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন** (জুলাই, ১৮৭০)। কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী এই যুদ্ধে জার্মানদের কাছে পরাজয় বরণ করে ও **সেডানের** (Sedan) রণক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ন আশী হাজার সৈন্য সহ জার্মানদের কাছে বন্দী হন। কয়েক মাস পরে বিজয়ী জার্মান সৈন্যবাহিনী প্যারিস অধিকার করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে **ফ্রাঙ্কফুর্টের স ন্ধর** (Peace of Frankfurt) দ্বারা ফ্রান্স তার সীমান্তবর্তী **আলসাস** (Alsace) ও **লোরেন** (Lorraine) প্রদেশ জার্মানীকে ছেড়ে দেয় ও **যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ** বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে সম্মত হয়। দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলি এবার উত্তর জার্মান রাজ্যসঙ্ঘের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে **নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের সৃষ্টি** করে। প্যারিসের উপকণ্ঠে ভার্সাই শহরের ফরাসী রাজপ্রাসাদে প্রাশিয়ার রাজা **প্রথম উইলিয়াম জার্মানীর সম্রাট** (Kaiser) **উপাধি গ্রহণ করেন**। বিসমার্কের চেষ্টায় প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য এভাবে সম্পূর্ণ হয়।

ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি (১৮৭১)

নবম পরিচ্ছেদ

ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস—শক্তিজোটের সৃষ্টি
(Major European States and the System of Alliances)

(১৮৭১-১৯১৪)

১৮৭১ সালের ব্যবস্থার ঐতিহাসিক তাৎপর্য : ইউরোপের ইতিহাসে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ এক যুগের অবসান ও অপর যুগের সূচনার সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত। আগেই বলা হয়েছে যে ভিয়েনার সন্ধিতে (১৮১৫) ইউরোপের উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেনি, কারণ জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই ঐ সন্ধির সর্তগুলি রচিত হয়েছিল। ভিয়েনার সন্ধির পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। বেলজিয়াম ও গ্রীসের স্বাধীনতা লাভ তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু ইটালী ও জার্মানীর জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ও ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঐ দুই দেশে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী বিশ বৎসরে দুই দেশেই জাতীয় ঐক্যবিধান-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে। **১৮৭০-১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ইটালীর ও অখণ্ড জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ইউরোপে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির বিরাট সাফল্যের প্রতীক।**

জাতীয়তাবাদের জয়

১৮৭০-৭১ সালে ইউরোপে **জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হলেও উদারনীতির জয় হয়েছিল বলা যায় না।** কারণ উদারপন্থীরা যে ভাবে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবেন বলে ভেবেছিলেন, ইটালী বা জার্মানীর জাতীয় ঐক্য আদৌ সেভাবে আসেনি। ঐ দুই দেশেই রাজতন্ত্রের সমর্থক রাষ্ট্রনায়কদের কূটনৈতিক কার্যকলাপ, জোট-বাঁধা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যবিধান শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। ফলে **কূটনীতি ও সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতা পরবর্তী কালের ইউরোপে উদারনৈতিক**

উদারনীতির অসাফল্য : ইটালী ও জার্মানী

আন্দোলনের উপর জয়ী হয়, এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে এই কূটনীতির ও জোট-বাঁধার খেলাই চলতে থাকে।

ইউরোপের নতুন মানচিত্র

জাতীয়তাবাদের জয়লাভের ফলে **ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে সরলতর হয়েছিল** সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও রাশিয়া এই ছয়টি বৃহৎ রাষ্ট্রই পরবর্তী কালে ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে; এবং এই ছয়টি দেশের মধ্যেও আবার আগের তুলনায় শক্তির সমতা কিছুটা দেখা যায়।

কিন্তু **জাতীয়তাবাদের জয়লাভের ফলে আবার অন্যদিক থেকে নানা সমস্যারও সৃষ্টি** হয়। জার্মানীর ঐক্য-বিধানের জন্য ডেনমার্ককে শ্লেসউইগ ও ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু ডেনমার্ক বা ফ্রান্স কেউই সন্তুষ্ট চিত্তে এ কাজ করেনি। তাদের উভয়ের, বিশেষতঃ ফ্রান্সের, মনে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং **ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যে মনোমালিন্য পরবর্তী কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার সূত্রপাত হয়েছিল আলসাস-লোরেনের ব্যাপারেই**। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে **পূর্ব ইউরোপেও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে** এবং তার ফলে **বহু-জাতি-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ও তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিভেদ-প্রচেষ্টা দেখা যায়**। রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপন সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে ও এই ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে।

নতুন শক্তিজোটের সৃষ্টি

রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় জয়ী হবার জন্য অস্ট্রিয়া জার্মানীর সঙ্গে হাত মেলায় (১৮৭৯), আর অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সম্মিলিত শক্তির সম্মুখীন হয়ে রাশিয়া শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় (১৮৯৪)। এ দিকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর নৌ-শক্তি বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিস্তারের প্রচেষ্টায় ভীত হয়ে **ইংলণ্ড** তার নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করে **ক্রমশঃ ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়** (১৯০৪-০৭)। **ইটালী** প্রথম কয়েক বৎসর জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার দলে থাকলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে গোপনে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এইভাবে **সারা ইউরোপই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়** এবং **উগ্র জাতীয়তাবাদ এই দুই শক্তিজোটের মধ্যে এক তীব্র**

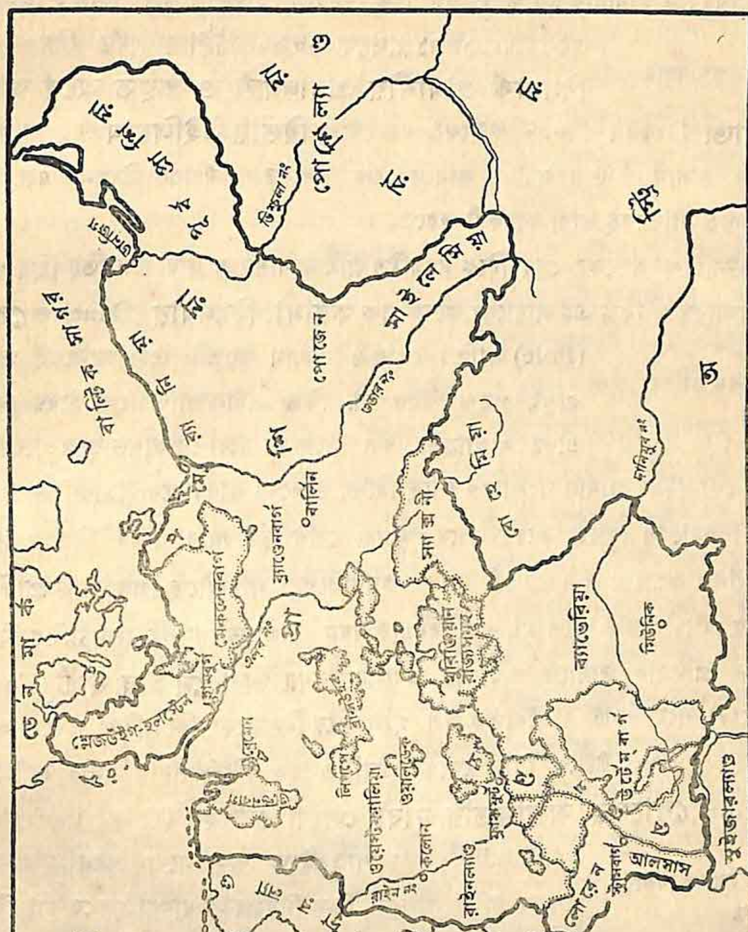
প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে, যার পরিণতি আমরা দেখি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে।

জার্মানীর ইতিহাস (১৮৭১-১৯১৪)

বিসমার্কের যুগ (১৮৭১-৯০)ঃ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বিসমার্ক এই সাম্রাজ্যের জন্য এক **সংবিধান রচনা** করেন। এই সংবিধান অনুযায়ী নতুন জার্মান সাম্রাজ্য এক রাজ্যসঙ্ঘের (Federation) রূপ ধারণ করে। কিন্তু পঁচিশটি রাজ্য নিয়ে গঠিত এই রাজ্যসঙ্ঘে প্রাশিয়াই প্রধান রাজ্য ছিল এবং **প্রাশিয়ার রাজাই বংশানুক্রমিক ভাবে জার্মানীর সম্রাট** (Kaiser) হবেন বলে সংবিধানে নির্ধারিত হয়। সাম্রাজ্যের **আইনসভায় দুটি কক্ষ** ছিল। উর্ধ্বতন কক্ষটিতে (Bundesrath) পঁচিশটি রাজ্যের রাজাদের প্রতিনিধিরা সদস্য নিযুক্ত হতেন, আর নিম্নতন কক্ষটিতে (Reichstag) সমস্ত জার্মান নাগরিকদের প্রতিনিধিরা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে আসতেন। কিন্তু **ক্ষমতার বিচারে উর্ধ্বতন কক্ষটিই বেশি প্রভাবশালী** ছিল। সমস্ত সাম্রাজ্যের জন্য কোন নতুন আইন প্রণয়ন করতে হলে উভয় কক্ষেরই সম্মতি প্রয়োজন হত; নতুন কর নির্ধারণ নিম্নতন কক্ষটির অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল, কিন্তু প্রচলিত করগুলি আইন সভার সম্মতি ছাড়াই আদায় করা চলত। সংবিধান সংশোধনের জন্য উর্ধ্বতন কক্ষের অনুমোদন আবশ্যিক ছিল এবং ঐ কক্ষে প্রাশিয়ার প্রতিনিধিদের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। **সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী** (Imperial Chancellor) সম্রাটের পরেই সব চেয়ে ক্ষমতাশালী ছিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার (Cabinet) অন্যান্য সদস্যেরা সকলেই সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং তাদের কার্যকলাপের জন্য শুধু সম্রাটের কাছেই দায়ী থাকতেন। যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধিতে স্বাক্ষর করা, সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি **কয়েকটি ব্যাপারে সম্রাটের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা** ছিল। রাজ্যসঙ্ঘের সদস্য রাজ্যগুলি তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেকটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়েছিল। বিসমার্ক তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ করতে চাননি।

জার্মান সাম্রাজ্যের সংবিধান (১৮৭১)

১৮৭১ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল এই জার্মান সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৭১ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত **প্রথম উইলিয়াম** জার্মানীর সম্রাট ছিলেন; তারপর মাত্র তিন মাস তাঁর পুত্র **তৃতীয় ফ্রেডারিক** রাজত্ব করেন; সব শেষে ফ্রেডারিকের পুত্র **দ্বিতীয় উইলিয়াম** জার্মানীর সম্রাট হন (১৮৮৮) এবং


জার্মান সাম্রাজ্য
১৮৭১-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ
বাল্টিক সাগর
উত্তর সাগর
বার্লিন
ব্রান্ডেনবার্গ
পোজেন
সাইলেসিয়া
ব্যাভেরিয়া
মিউনিক
আলসাস
লোরেন
রাইনল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
সুইজারল্যাণ্ড
স্লেজউইগ-হলস্টেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় পর্যন্ত (১৯১৮) তিনিই ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যে **১৮৭১ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ** পর্যন্ত বিশ বৎসর **বিসমার্ক জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ও প্রকৃত অর্থে ভাগ্য-বিধাতা** ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে **দ্বিতীয় উইলিয়াম** তাঁর ব্যক্তিগত শাসন চালান। তাঁর মন্ত্রীরা আসলে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত নীতিকেই তাঁরা কার্যকরী করতেন।

তিন জার্মান সম্রাট

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে নবগঠিত জার্মান সাম্রাজ্যে জার্মান জাতিই ছিল প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই সাম্রাজ্যে কয়েক লক্ষ **ফরাসী, দিনেমার** (Dane) ও **পোল** (Pole) জাতির লোকও বসবাস করত। এরা অনেকেই জার্মান প্রভুত্ব পছন্দ করত না, কিন্তু জার্মান জাতির লোকেদের তুলনায় এদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবের জন্য এরা কোনদিনই জার্মান সরকারের কাছে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।

বৈদেশিক জাতির সমস্যা

বিসমার্কের কাছে এদের চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভাবনার কারণ. ছিল জার্মানীর ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও সমাজতন্ত্রী দল। ক্যাথলিকেরা জার্মানীতে প্রোটেস্টান্ট প্রাশিয়ার প্রভুত্ব আদৌ পছন্দ করত না, এবং বিসমার্ক যখন ইটালীতে পোপের রাজ্যচ্যুতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাতে অস্বীকার করলেন তখন তারা **সেণ্টার পার্টি** (Centre Party) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে বিসমার্কের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোম থেকে প্রচারিত এক নির্দেশনামায় ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাপারে **পোপের অভ্রান্ততার দাবী** ঘোষণা করা হল (Dogma of Papal Infallibility)। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক সংঘর্ষের ইঙ্গিত ছিল না, কিন্তু বিসমার্কের ধারণা হল যে ক্যাথলিকরা ভবিষ্যতে পোপের নির্দেশে জার্মান-স্বার্থ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে। পোপের প্রতি যার চূড়ান্ত আনুগত্য রয়েছে এমন ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব তিনি জার্মান সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক বলেই মনে করতেন। ক্যাথলিকদের দমনের জন্য বিসমার্ক অনেকগুলি কঠোর আইন (May Laws) প্রবর্তন করেছিলেন (১৮৭৩-৭৫)। স্কুল-কলেজ পরিচালনার অধিকার তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, ধর্মানুষ্ঠান-নিরপেক্ষ 'রেজিষ্ট্রি' বিবাহ (Civil marriage) বাধ্যতামূলক করা হয়, যাজকদের নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন লাভ আবশ্যিক হয়ে পড়ে, এবং জেস্থইট (Jesuit) সম্প্রদায়ভুক্ত ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের জার্মানী ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বিসমার্কের সঙ্গে ক্যাথলিকদের এই সংঘর্ষকে **সভ্যতার স্বার্থে সংগ্রাম**

ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

(Kulturkampf) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামে ক্যাথলিকেরাই জয়ী হয় এবং সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিসমার্ক ক্যাথলিকদের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করে নেন (১৮৭৯-৮৬)। ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করা হয়। শুধু সরকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনের অধিকার ও বাধ্যতামূলক 'রেজিস্ট্রি' বিবাহের আইন থেকে যায়।

সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গেও বিসমার্কের সংগ্রাম দীর্ঘকাল চলেছিল। জার্মানীতে **ফার্ডিন্যাণ্ড লাসাল** (Ferdinand Lassalle) প্রথম সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে **লাইবনেখট** (Leibknecht) ও **বেবেল** (Bebel) **কার্ল মার্ক্সের** (Karl Marx) আদর্শে পরিচালিত আর একটি সমাজতন্ত্রী দল স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দুটি দল মিলিত হয়ে যে নতুন **সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির** (Social Democratic Party) সৃষ্টি করে তাদের রাজনৈতিক ও সমাজ-বিষয়ক চিন্তাধারা বিসমার্কের কাছে সর্বনাশা বলে মনে হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিসমার্কের জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ সম্পূর্ণ রূপেই পরিত্যক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। বিসমার্ক শ্রমিক-স্বার্থ-বিরোধী ছিলেন না। রাষ্ট্রই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে ও তাদের কল্যাণ সাধন করবে এ কথা তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি। এ কারণে বিসমার্ককে ইউরোপে **রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদের** (State Socialism) জনক বলা হয়। এই নীতির অনুসরণে বিসমার্ক জার্মান শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের লোকদের **বিনাব্যয়ে চিকিৎসার** ব্যবস্থা করেন, এবং তাদের **দুর্ঘটনা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা** দেবার আয়োজনও করা হয় (১৮৮৩-৮৯)। সে কালে ইউরোপের আর কোন দেশে শ্রমিকেরা এইসব সুবিধা পেত না। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দলকে শ্রমিক শ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র ভাবে গণ্য করে তাদের উপর বিসমার্ক প্রায় **বারো বৎসর কঠোর উৎপীড়ন** চালান (১৮৭৮-৯০)। তাদের সভা-সমিতির আয়োজন করা, পুস্তক-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ অথবা কোনভাবে দলীয় প্রচারকার্য চালান সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামেও বিসমার্ক পরাজিত হন। জার্মান আইনসভার নিম্নতন কক্ষে সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলে এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের পদত্যাগের পর সমাজতন্ত্রী দল আবার বিনা বাধায় কাজ করবার সুযোগ পায়।

সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে সংঘর্ষ

বিসমার্কের দীর্ঘ শাসনকালে **জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি**

হয়। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব এক শতাব্দী কালে যতদূর অগ্রসর হয়েছিল জার্মানীতে ঊনবিংশ শতকের শেষ ত্রিশ বৎসরে তার প্রায় ততদূর অগ্রগতি হয়। লৌহ, কয়লা ও বস্ত্র শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি এই সময় জার্মানীতে দেখা যায়। রেলপথের প্রসার, ব্যাঙ্ক সংগঠনের উন্নতি এবং কারিগরী শিক্ষার বিস্তার জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। জার্মান যন্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য বিসমার্ক নিঃশুল্ক বাণিজ্যের (Free Trade) নীতি ত্যাগ করে উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ বা **শিল্প-সংরক্ষণের নীতি** (Protectionist Policy) গ্রহণ করেন (১৮৭৯)। এর ফলে শুধু যে জার্মান শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটেছিল তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কবৃদ্ধিজনিত অর্থাগমও প্রচুর হয়। জার্মানীর **বৈদেশিক বাণিজ্যও** শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলে। বিসমার্কের যুগের এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জার্মান জাতির রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করেছিল সন্দেহ নেই।

শিল্পবিপ্লব ও সংরক্ষণ নীতি

বিসমার্ক প্রথমে ইউরোপের বাইরে **জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের** পক্ষপাতী ছিলেন না। উপনিবেশ বিস্তারের ফলে দেশের প্রকৃত শক্তিবৃদ্ধি হয় না, সাময়িক ভাবে গৌরববৃদ্ধি হয় মাত্র, এই তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু জার্মানীতে শিল্পের প্রভূত প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাড়তি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশে বাজারের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং উপনিবেশগুলিই ছিল সে যুগে কাঁচা মাল সরবরাহ ও শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের পক্ষে আদর্শ বাজার। কিন্তু ইতিমধ্যেই এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছিল। তাই জার্মানীকে আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব ভাগে উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা করতে হল। টোগোল্যাণ্ড (Togoland), কামেরুন (Kamerun), জাঞ্জিবার (Zanzibar) ও পূর্ব আফ্রিকায় বিসমার্ক জার্মানীর উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীকে একটি বিরাট বাণিজ্যিক ও সামরিক নৌ-বহরও (mercantile marine and navy) গড়ে তুলতে হল।

উপনিবেশ বিস্তার

দ্বিতীয় উইলিয়ামের যুগ (১৮৯০-১৯১৮)ঃ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আটাশ বৎসর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের যুগ (Wilhelmian Era) নামে জার্মানীর ইতিহাসে খ্যাত। দ্বিতীয় উইলিয়াম নানা গুণের অধিকারী ছিলেন এবং জার্মানীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি মধ্যযুগের রাজাদের মতো **নিজের অধিকারকে ঈশ্বর-প্রদত্ত বলে মনে করতেন** এবং দেশের আইনসভার বা রাজনৈতিক দলগুলির মতামতের কোন মূল্যই দিতেন না। তাঁর প্রধান মন্ত্রীরাও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর মতোই কাজ করতেন।

দ্বিতীয় উইলিয়ামের **জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে শুধু ইউরোপের মধ্যে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা।** এর জন্য তিনি জার্মানীর **সামরিক শক্তি ও নৌ-বল বৃদ্ধি** এবং **উপনিবেশ বিস্তারের** প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন। এই ব্যাপারে **ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর প্রবল প্রতিযোগিতা** উপস্থিত হয় এবং পরিণামে তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকেই এগিয়ে আনে। জার্মানীর **বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের** জন্য দ্বিতীয় উইলিয়াম অস্ট্রিয়া, ইটালী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার সঙ্গে কয়েকটি বাণিজ্য-চুক্তিও সম্পাদন করেন।

সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও উপনিবেশ বিস্তার



দ্বিতীয় উইলিয়াম

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দ্বিতীয় উইলিয়াম সমাজতন্ত্রী দলকে প্রথমে বিনা বাধায় কাজ করতে দিলেও পরে আবার তাদের প্রতি উৎপীড়নমূলক নীতি গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে দেশের আইনসভার সমর্থন তিনি পাননি। জার্মানীতে **সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন** ক্রমশই প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীতে বসবাসকারী **বিদেশী জাতিগুলির সঙ্গেও বোঝাপড়া** করার চেষ্টা করেছিলেন। আলসাস ও লোরেনের ফরাসী অধিবাসীদের এবং পূর্ব প্রাশিয়ার পোলদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু এ-ভাবে তিনি তাদের বিরূপতা সম্পূর্ণ দূর করতে পারেননি। জার্মানীতে এই সময় **ইহুদী-বিরোধী মনোভাব** প্রবল হয়ে ওঠে। জার্মান জাতিই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি এ রকম ধারণা বহু বুদ্ধিজীবীই পোষণ করতেন, সাধারণ লোকেদের তো কথাই নেই। **উদারনৈতিক আন্দোলন** কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করলেও জার্মানী অদূর ভবিষ্যতে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে উঠবে, এ রকম কোন সম্ভাবনাই এ যুগে দেখা দেয়নি। বরং **সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণাই** এ যুগে জার্মান জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলা যায়, এবং এই **সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই ১৯১৪ সালে জার্মানীকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।**

আভ্যন্তরীণ নীতি

সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা

ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র (১৮৭১-১৯১৪)

সেডানের রণক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মান সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে ফ্রান্সে **দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন** ঘটে। সেডানের যুদ্ধের (সেপ্টেম্বর, ১৮৭০) মাত্র দু'দিন পরে প্যারিসের বিখ্যাত প্রজাতন্ত্রী নেতা **গ্যাম্বেটা** (Gambetta) ফ্রান্সে **তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা** ঘোষণা করেন। জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্য গ্যাম্বেটার নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, কিন্তু রণক্লান্ত ফ্রান্সের পক্ষে সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জার্মান সৈন্যবাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি প্যারিস জার্মান সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিসমার্ক ফরাসীদের নতুন **জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের** সুযোগ দেন, যে পরিষদ জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই নতুন জাতীয় পরিষদই (National Assembly) শেষ পর্যন্ত জার্মানীর সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধির সর্তগুলি অনুমোদন করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সম্পাদিত **ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধিতে** বলা হয় যে (১) ফ্রান্স জার্মানীকে আলসাস ও লোরেন সমর্পণ করবে; (২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ (প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড) দেবে; এবং (৩) যতদিন না এই ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ দেওয়া হচ্ছে ততদিন একটি জার্মান সেনাদলকে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে ফরাসীদের খরচেই মোতায়েন রাখা হবে। ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফ্রান্সের জাতীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি এর ফলে যথেষ্ট খর্ব হল।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি

নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে রাজতন্ত্রের সমর্থকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। তারা তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে অবিলম্বে ভেঙ্গে না দিলেও প্যারিসের প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে নানা কারণে তাদের শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধল। জাতীয় পরিষদ প্যারিসের পরিবর্তে ফরাসী রাজতন্ত্রের স্মৃতি-বিজড়িত ভার্সাই শহরে তার অধিবেশন শুরু করল, এবং ন্যাশনাল গার্ড (National Guard) বা প্যারিসের জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ভেঙ্গে দিল। প্যারিসের অধিবাসীরা প্রজাতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, এবং তাদের শহরের প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবার জন্য ৯০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি সংসদ নির্বাচন করল। **প্যারিস কমিউন** (Paris Commune) নামে পরিচিত এই বিপ্লবী সংসদ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে প্রায় দু মাস জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে রেখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবলতর সামরিক শক্তির কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে

প্যারিস কমিউন

হল (এপ্রিল, ১৮৭১)। প্যারিস কমিউনের এই বিদ্রোহে কয়েক সহস্র লোক প্রাণ হারায় এবং কয়েক সহস্র লোককে ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করা হয়।

জাতীয় পরিষদ **অ্যাডলফ থিয়ার্স** (Adolphe Thiers) নামে এক প্রবীণ রাষ্ট্রনায়ককে প্রশাসনিক বিভাগের প্রধানের পদে (Chief of the Executive Power) নির্বাচিত করেছিল। প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ দমন এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি স্বাক্ষর করার পর থিয়ার্সের প্রধান কাজ হল **দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও পুনর্গঠনের কাজ সুসম্পন্ন করা**। আড়াই বৎসরের মধ্যে থিয়ার্স **যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকা পুরো মিটিয়ে দিলেন,** এবং তার ফলে **জার্মান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেল**। প্রাপ্তবয়স্ক ফরাসী পুরুষদের পক্ষে অন্ততঃ কয়েক বৎসর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করে থিয়ার্স **ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির** ব্যবস্থা করলেন, এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করা হল। কিন্তু থিয়ার্স প্রথমে নিয়মানুগ রাজতন্ত্রের (Constitutional monarchy) সমর্থক হলেও ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্রের ভক্ত হয়ে উঠছিলেন। সুতরাং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি জাতীয় পরিষদের সমর্থন হারিয়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে হল।

থিয়ার্সের পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

থিয়ার্সের পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান **মার্শাল ম্যাকম্যাহোন** (Marshal Macmahon) মনে-প্রাণে রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, এবং অনেকেই আশা করেছিল যে তাঁর আমলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হবে। কিন্তু **রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা এ সময় একাধিক দলে বিভক্ত** ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কিছুতেই ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হল না। **১৮৭৫** খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের জন্য যে **নতুন সংবিধান** রচনা করা হল তাতে ফরাসী শাসন-ব্যবস্থাকে নামে প্রজাতন্ত্র বলা হল বটে, কিন্তু কার্যতঃ **রাষ্ট্রপতিকে নানা বিশেষ ক্ষমতা ও দীর্ঘ সাত বৎসরের কাজের মেয়াদ দেওয়া হল** যাতে পরবর্তী কালে ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে সহজেই নিয়মানুগ রাজতন্ত্রে পরিণত করা যায়। ফ্রান্সের **আইনসভার দুই কক্ষকে প্রায় সমান ক্ষমতা দেওয়া হল,** যদিও উর্ধ্বতন কক্ষটির নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল না। ফরাসী মন্ত্রিসভা উভয় কক্ষের কাছেই তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকবে বলে ঠিক হল।

১৮৭৫ সালের সংবিধান

এই নতুন সংবিধান অনুযায়ী ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ফ্রান্সে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীরা আইনসভার নিম্নতন কক্ষে (Chamber of Deputies) সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও **উর্ধ্বতন** কক্ষ (Senate) রাজতন্ত্রের

সমর্থকদের প্রভাবাধীন থেকে যায়। ম্যাকম্যাহোন প্রথমে প্রজাতন্ত্রীদের নিয়েই তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, কিন্তু রাজতন্ত্রের সমর্থকদের চাপে পড়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সেই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন ও আইনসভার নিম্নতন কক্ষকেও ভেঙ্গে দিয়ে আবার সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দেন। রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে এবার তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়, এবং রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রকাশ্যে প্রথম দলকেই সমর্থন করে। নির্বাচন-দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরাই জয়লাভ করে (১৮৭৭), এবং এক বৎসরের মধ্যে উর্ধ্বতন কক্ষেও তারা সংখ্যাধিক্য লাভ করে। **১৮৭৯** খ্রীষ্টাব্দে **ম্যাকম্যাহোন রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন,** এবং প্রজাতন্ত্রী দলের অন্যতম নেতা **জুলস** গ্রেভি (Jules Grevy) তাঁর স্থলে **রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন**। এত দিন পরে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র সত্য সত্যই প্রজাতন্ত্রীদলের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এই সাফল্যের স্মারক হিসাবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী ভার্সাই থেকে আবার প্যারিসে স্থানান্তরিত হয়।

রাজতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী সংঘর্ষ

১৮৭৯ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে **ফরাসী প্রজাতন্ত্রী সরকার কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়**। প্রথমতঃ, ফ্রান্সের অধিবাসীরা এই সময় তাদের হৃত **রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারগুলি** অনেকাংশে ফিরে পায়। সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রন তুলে নেওয়া হয়, এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতির অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে করার অনুমতি মেলে।

নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সে একটি **জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা** গড়ে তোলা হয় এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠন করা হয়। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব দূর করা হয়; চার্চ-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি অবিলম্বে লোপ পায়নি বটে, কিন্তু ঐ সব বিদ্যালয়ে সরকারী অনুদান দেওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা

তৃতীয়তঃ, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে **সংবিধান সংশোধন** করে প্রজাতন্ত্রকে ফ্রান্সের চিরস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করা হয়। প্রাক্তন রাজপরিবারগুলির কোন বংশধর ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন-প্রার্থী হতে পারবে না বলেও সিদ্ধান্ত করা হয়, এবং এর দুই বৎসর পরে ফ্রান্স থেকে প্রাক্তন রাজ-পরিবারের লোকেদের বহিষ্কৃত করা হয়।

সংবিধান সংশোধন

চতুর্থতঃ, এই সময় ফ্রান্সে **কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির** জন্য নানা ব্যবস্থা

নেওয়া হয়, এবং **উপনিবেশ বিস্তারের প্রচেষ্টাও** যথেষ্ট সাফল্যঅর্জন করে। উত্তর আফ্রিকার **টিউনিস** (Tunis) কার্যতঃ ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হয়। ইন্দোচীনে ফরাসী উপনিবেশের সঙ্গে **আনাম** (Annam) ও **টংকিন** (Tonkin) যুক্ত হয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের নিকটবর্তী **মাদাগাস্কার** (Madagascar) দ্বীপ, এবং **পশ্চিম আফ্রিকার** এক বিরাট অংশও ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

উপনিবেশ বিস্তার

পঞ্চমতঃ, ফ্রান্সে **সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন** এই যুগে প্রসার লাভ করে, এবং সময়ে সময়ে ফরাসী মন্ত্রিসভায় সমাজতন্ত্রীরাও স্থান পায়। সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে নানা দল-উপদল থাকায় তারা তাদের সংখ্যার অনুপাতে ফরাসী রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কিন্তু **শ্রমিক-কল্যাণমূলক কয়েকটি ব্যবস্থা** ফরাসী সরকার এই সময় গ্রহণ করে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করবার অধিকার আইনসম্মত হয়। ১৮৯২ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরো কয়েকটি আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, দিনে দশ ঘণ্টার বেশি কোন শ্রমিককে কাজ করানো চলবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়, সপ্তাহে এক দিন করে তাদের ছুটির সুযোগ দেওয়া হয় এবং কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়লে মালিককে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। এর পরে বিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু ধর্মঘট দমনের জন্য ফরাসী সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি।

শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

সব শেষে (রোম্যান ক্যাথলিক) চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে নেপোলিয়ন যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এই সময় তা সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন হয়। ক্যাথলিক চার্চ রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল বলে প্রজাতন্ত্রীরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করে। প্রথমে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক পদ থেকে যাজকদের অপসারিত করা হয় এবং ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের অনুমোদন ব্যতীত কোন ধর্মীয় সংস্থার অস্তিত্বই রাখা চলবে না বলে ফরাসী আইনসভা একটি আইন প্রণয়ন করে। সামাজিক ক্ষেত্রে চার্চের প্রভাব হ্রাসের জন্য 'রেজিস্ট্রি' বিবাহ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদও আইনসম্মত বলে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এক আইনের বলে **ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।**

চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ

রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের পাদ্রীদের সরকারী তহবিল থেকে বেতনলাভের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, অবশ্য ঐ সঙ্গে তাদের নিয়োগের ব্যাপারেও সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়। চার্চের সমস্ত সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু পাদ্রীদের সাধারণ উপাসনাগারে উপাসনা পরিচালনার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়নি। এই সব আইনের ফলে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব ফ্রান্সে দিন দিন হ্রাস পায়, এবং ফরাসী নাগরিকেরা ক্রমশঃ নাস্তিকতা বা ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার দিকে আকৃষ্ট হয়।

১৮৭৯ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে তিনবার বিশেষ বিপদের মুখে পড়তে হয়েছিল। **বুলাঙ্গার** (Boulanger) নামে এক ফরাসী সেনাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী উনবিংশ শতাব্দীর আশীর দশকে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। প্রজাতন্ত্রী দলের ও সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি আইনসভার নিম্নতন কক্ষে একাধিক বার নির্বাচিত হন। ফরাসী সংবিধানের সংশোধন এবং আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। আর একটু সাহসী ও তৎপর হলে তিনি নেপোলিয়নের মতো নিজেকে ফ্রান্সের একনায়কত্বে অধিষ্ঠিত করতে পারতেন, কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করলে ভীরু বুলাঙ্গার দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করেন (১৮৮৯) এবং দুই বৎসর পরে ব্রাসেলসে আত্মহত্যা করে সব বাদ-বিতণ্ডার অবসান ঘটান। এর পর **পানামা খাল কোম্পানীর** (Panama Canal Company) সঙ্গে বে-আইনী আর্থিক লেনদেনের জন্য ফ্রান্সের কয়েকজন মন্ত্রী ও আইনসভার সদস্য দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়েন এবং তার ফলে প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয় (১৮৯২)। কিন্তু এঁরা সবাই পদত্যাগ করলে সরকার কোন রকমে সে যাত্রা রক্ষা পায়, যদিও তার সুনাম ফিরে পেতে বেশ কিছু দিন সময় লাগে। সব শেষে **ড্রেফুস** (Dreyfus) নামে এক সামরিক বিভাগের পদস্থ ইহুদী কর্মচারীকে বিনা দোষে দেশদ্রোহিতার অপরাধে যে ভাবে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় তা নিয়ে ফ্রান্সে এক তুমুল ও দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং এই সুযোগে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল লোক ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যবশতঃ ড্রেফুসের নির্দোষিতা দীর্ঘকাল পরে, কিছুটা আকস্মিক ও চাঞ্চল্যকর ভাবেই প্রমাণিত হয় ও তিনি সসম্মানে তাঁর পুরানো পদে ফিরে আসেন। প্রজাতন্ত্রী সরকার শেষ পর্যন্ত আপন অস্তিত্ব ও সুনাম দুই-ই রক্ষা করতে সমর্থ হয় (১৮৯৪-১৯০৬)।

বুলাঙ্গারের আন্দোলন

পানামা খাল কোম্পানীর আর্থিক লেনদেন

ড্রেফুসের মামলা

রাশিয়ার জারতন্ত্রের ইতিহাস (১৮৫৫-১৯১৪)

জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার** (১৮৫৫-৮১) রাশিয়ার সম্রাট হন। আলেকজাণ্ডার প্রথম জীবনে আদৌ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না, বরং তাঁর **নানা রকম সংস্কার কার্যের পরিকল্পনা** ছিল। তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেন, নির্বাসিতদের স্বদেশে ফেরার অনুমতি দেন, সংবাদ-পত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেন এবং তাঁর প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং রেলপথ নির্মাণেও তিনি উৎসাহী ছিলেন।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল **ভূমিদাসদের মুক্তিদান** (১৮৬১)। রাশিয়ায় সে যুগে লক্ষ লক্ষ ভূমিদাসের বাস ছিল। এরা জমিদারদের দেওয়া জমিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত এবং তার বিনিময়ে বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারদের খাস জমিতেও চাষের কাজ তাদের করতে হত। জমিদারের বিনা অনুমতিতে জমি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। জারের নিজের জমিতেও বহু ভূমিদাসের বসতি ছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এক সরকারী নির্দেশের (Emancipation Edict) বলে সমস্ত ভূমিদাসকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেন এবং ঐ সঙ্গে প্রত্যেকে তার বসবাসের কুটীর এবং সংলগ্ন সামান্য জমিও পায়। এ ছাড়া প্রতিটি গ্রামে জমিদারের কিছু জমি গ্রাম-পঞ্চায়েতকে (Mir) দেওয়া হয়। এই জমিটি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য না হলেও মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসেরাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে এ জমি চাষ করত এবং যে যার জমির ফসল ভোগ করবার অধিকারী ছিল। জমিদারদের এর জন্য অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় এবং ক্ষতিপূরণের টাকা মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের কাছ থেকেই দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে আদায় করা হয়। ভূমিদাসদের আর্থিক সচ্ছলতা এর ফলে কিছুই বাড়েনি, কিন্তু তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পূর্ণ নাগরিক অধিকার পায়, এবং পরবর্তী কালে তাদের মধ্য থেকেই কলকারখানার শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। কৃষিকার্যের দায়িত্ব থেকে লক্ষ লক্ষ ভূমিদাস মুক্তি না পেলে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।



দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার

ভূমিদাসদের মুক্তি দান

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ায় এক নতুন **আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থারও** প্রবর্তন করেন। প্রতিটি জেলায় **'জেমস্টভো'** (Zemstvo) নামে একটি জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক পরিষৎ স্থাপিত হয়, এবং জেলা পরিষৎগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার প্রাদেশিক পরিষৎ গঠিত হয়। পথঘাট নির্মাণ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল-গুলির তত্ত্বাবধানের ভার এই পরিষৎগুলির উপর দেওয়া হয়েছিল। 'জেমস্টভো'গুলি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিল সন্দেহ নেই, এবং যারা এখানে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল পরবর্তী কালে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও তারা অনেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। **বিচার-ব্যবস্থাতেও** দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর সময়েই রাশিয়ায় ফৌজদারী মামলায় **জুরীর দ্বারা বিচারের** (Trial by Jury) প্রথা প্রবর্তন হয়।

আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থা

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কিন্তু খুব বেশি দিন এই উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে **পোল্যাণ্ডের প্রজারা বিদ্রোহী** হলে আলেকজাণ্ডার কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করেন এবং পোল্যাণ্ডকে রুশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। এত দিন পোল্যাণ্ড জারের ব্যক্তিগত রাজ্য বলে পরিগণিত হত, রুশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসাবে নয়। তবে পোল্যাণ্ডের এই বিদ্রোহ একেবারে নিষ্ফল হয়নি। এই বিদ্রোহের পরে সেখানকার ভূমিদাসেরা মুক্তি লাভ করে।

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের শেষ দিকে রাশিয়ায় **'নিহিলিস্ট'** (Nihilist) নামে এক **গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দলের** (নিহিলিস্ট = সব কিছুতে অবিশ্বাসী) **আবির্ভাব** হয়। এরা প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ছিল এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে রাশিয়ার সমাজ ও রাজনীতিকে গড়তে চাইত। এদের প্রচারকার্যে বহু রুশ যুবক আকৃষ্ট হয়, কিন্তু রুশ পুলিশও শীঘ্রই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বহু সন্ত্রাসবাদীকে কারারুদ্ধ ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। এর ফলে সন্ত্রাসবাদীরা মরিয়া হয়ে ওঠে ও শাসকগোষ্ঠীর নিধনের জন্য গুপ্তহত্যার পথ নেয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিজেই এক 'নিহিলিস্ট' গুপ্ত-ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান।

নিহিলিষ্ট আন্দোলন

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসন (১৮৮১-৯৪): দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (Alexander III) **অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও অত্যাচারী রাজা** ছিলেন। তাঁর আমলে রুশ পুলিশ 'নিহিলিস্ট' এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে ও তাদের হয় হত্যা কর

হয় অথবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা ছাড়াও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও খর্ব করা হয়। জুরীর দ্বারা বিচারের প্রথা কোন ধরনের মামলায় একেবারে তুলে দেওয়া হয় এবং 'জেমেস্টভো'গুলির ক্ষমতাও সঙ্কুচিত করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য রুশ সরকার 'ভূমি-নায়ক' (Land Captain) নামে এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করে, এবং জমিদারদের মধ্য থেকেই এদের মনোনয়ন করা হয়। এরা ইচ্ছা করলে এদের অধীনস্থ কৃষকদের বিনা বিচারে বন্দী পর্যন্ত করতে পারত।

দমন নীতির প্রয়োগ

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকালেই **রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লবের সূচনা** হয়। **ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের** ফলে বহু কৃষক অল্প দিনের মধ্যেই আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে। যে সামান্য কৃষিযোগ্য জমি তাদের ভাগে পড়েছিল তাতে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। ফলে, তারা দলে দলে শহরে চলে আসতে থাকে এবং কল-কারখানায় অল্প মজুরিতে কাজ নেয়। কল-কারখানা দ্রুত গড়ে তোলার জন্য শুধু অল্প মজুরিতে কাজ করার শ্রমিক প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল প্রচুর মূলধনেরও। ফরাসী শিল্পপতি ও মহাজনেরা রাশিয়ায় নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ ঋণ হিসাবে দিতে সম্মত হয় (Hoskier loan)। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের দূরদর্শী **অর্থমন্ত্রী উইট** (Witte) নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেবার জন্য রেলপথ নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং **শিল্প-সংরক্ষণের নীতি** অনুসরণ করে বিদেশ থেকে আনা পণ্যের উপর আমদানি-শুল্ক বৃদ্ধি করেন। শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতির ফলে রাশিয়ায় বড় বড় শহর গড়ে ওঠে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে বহু লোক শহরে এসে বসবাস করতে থাকে। আবার, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের মতো রাশিয়াতেও **শ্রমজীবীদের আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি প্রসার লাভ করে ;** জারের পুলিশ-বাহিনী এই সব আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দমন করতে ব্যর্থ হয়।

শিল্প-বিপ্লবের সূচনা

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে **ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী** স্থাপন (১৮৯৪) তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উদীয়মান জার্মান শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই দুই দেশের এই মৈত্রী প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল।

দ্বিতীয় নিকোলাস ও জারতন্ত্রের পতন (১৮৯৪-১৯১৭) : তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস (Nicholas II) রাশিয়ার সিংহাসন লাভ করেন। তিনিই রোমানফ (House of the Romanoffs) বংশের শেষ রাজা ও রাশিয়ার শেষ জার। নিকোলাসের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরে জারতন্ত্রের

আভ্যন্তরীণ নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সমস্ত উদারনৈতিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধের জন্য রুশ সরকার ও তার পুলিশবাহিনী সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। দেশের **অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি** এই সময় লক্ষিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষিযোগ্য জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে ও **কৃষকদের জীবিকা-নির্বাহ করা আরো কষ্টকর হয়।** সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেলপথ নির্মাণের জন্য কৃষকদের উপর করভার বৃদ্ধি করা হয়। কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরও আর্থিক দুরবস্থা বৃদ্ধি পায় ও তার ফলে **শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে।**

অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি

পোল্যাণ্ডের মতো **ফিনল্যাণ্ডও** বহুদিন ধরে রাশিয়ার জারের অন্যতর রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছিল। ফিনল্যাণ্ডের নিজস্ব আইন-সভা, সৈন্যবাহিনী এবং ডাকবিভাগও ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় নিকোলাস ফিনল্যাণ্ডের আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস এবং তার সামরিক বাহিনী ও ডাকবিভাগের অস্তিত্ব লোপ করেন। ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রতিবাদে জার আদৌ কর্ণপাত করেননি।

ফিনল্যাণ্ডের অধিকার হরণ

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে **জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে** রুশ সরকার ও সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা, দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রুশ সৈন্যবাহিনী এই যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হয় এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে **পোর্ট্‌সমাউথের সন্ধির** (Treaty of Portsmouth) দ্বারা লিয়াও-টুং (Lieo Tung) উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার (Port Arthur) বন্দর জাপানের হস্তগত হয়।

রুশ-জাপানী যুদ্ধ

জাপানের কাছে এই পরাজয়ের ফলে রুশ জনগণের অসন্তোষ তীব্র বিক্ষোভের আকার ধারণ করে, এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে **সেণ্টপিটার্সবার্গে** (St. Petersburg) এক **ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট** দেখা দেয়। নগরীর রাজপথে এক শান্তিপূর্ণ শ্রমিক মিছিলের উপর সৈন্যেরা গুলিবর্ষণ করলে (জানুয়ারী, ১৯০৫) অবস্থা সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। কয়েক মাস ধরে চূড়ান্ত অরাজকতা চলে, নানা স্থানে ধর্মঘট দেখা দেয়, বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারায়, গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার নিকোলাসের পিতৃব্য গ্র্যাণ্ড ডিউক সার্জিয়াসও (Grandduke Sergius) এই বিপ্লবে প্রাণ হারান। অবশেষে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জার বিপ্লবীদের শান্ত করবার জন্য **ডুমা** (Duma)

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব প্রচেষ্টা

নামে এক **নির্বাচিত প্রতিনিধি-সভা গঠনের কথা ঘোষণা** করেন। কিন্তু এর ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ ছিল এবং এত অল্প লোককে ডুমার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় যে বিপ্লবীরা জারের এই ঘোষণায় শান্ত হয়নি। **অক্টোবর মাসে এক দীর্ঘকালব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের** ফলে সন্ত্রস্ত জার নিকোলাস ডুমার ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দেন, এবং এর নির্বাচনে আরো বহু লোককে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়। নিকোলাস ফিনল্যাণ্ডেও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বহুলাংশে বর্ধিত করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের এই সাফল্য কিন্তু স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। প্রথম ডুমার নির্বাচনের আগেই তার ক্ষমতা রাজকীয় আদেশ বলে সঙ্কুচিত করা হয়। নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বারংবার সংঘর্ষ বাধে এবং **নিকোলাস একাধিকবার নির্বাচিত ডুমাকে তাঁর ইচ্ছামতো ভেঙ্গে দেন** ও ডুমা-নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার সঙ্কুচিত করেন। শেষ পর্যন্ত ডুমায় জারের অনুগত ব্যক্তিরাই কেবল স্থান পায় এবং তারা জারতন্ত্রের বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন প্রণয়ন করে ডুমা গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধিকারভুক্ত সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি কৃষকদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে হস্তান্তরিত করে। নিকোলাসের মন্ত্রী **স্টলিপিনের** (Stolypin) প্রশ্রয় লাভ করে ধনী কৃষকেরা (Kulak) এ সময় ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করতে আরম্ভ করে। ফিনল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক অধিকারও আবার কিছুটা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

ঐ বিপ্লবের ব্যর্থতা

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ** শুরু হলে জারতন্ত্রের দুর্বলতা আবার প্রকট হয়ে ওঠে। যুদ্ধে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সেনাদলের কাছে রুশ সৈন্যবাহিনী বারংবার পরাজিত হয়। পর পর কয়েক বৎসর অজন্মার ফলে দেশে এ সময় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের ধূমায়িত অসন্তোষ **রুশ বিপ্লবের** আকারে আত্মপ্রকাশ করে (১৯১৭)। জার **দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন** এবং অল্প দিন পরে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ডুমা প্রতিষ্ঠানটিকেও এ সময় ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং প্রধানতঃ শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রচেষ্টায়, মহান **লেনিন** (Lenin) ও তাঁর **বলশেভিক** (Bolshevik) **দলের নেতৃত্বে রাশিয়ায় এক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** (Socialist Republic) **স্থাপিত হয়।** এই প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে **ব্রেস্ট্-লিটভস্কের সন্ধি** (Treaty of Brest Litovsk) স্বাক্ষর করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে আসে। রাশিয়ায় এর পর এক নবযুগের সূচনা হয়।

বলশেভিক বিপ্লব
১৯১৭

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : ইউরোপে শক্তি-জোটের (System of Alliances) সৃষ্টি :

১৮৭১ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ইউরোপের ইতিহাসে **'সশস্ত্র শান্তির যুগ'** (Age of Armed Peace) নামে পরিচিত। আপাত-দৃষ্টিতে এই সময় কোন বিরাট আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ইউরোপে দেখা দেয়নি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-তুর্কী যুদ্ধ এবং ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের দুটি বলকান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক শান্তিকে বিশেষ বিঘ্নিত করেনি। কিন্তু এই বাহ্য শান্তির অন্তরালে ইউরোপে যুদ্ধের প্রস্তুতি এ সময় প্রথমে ধীর পদক্ষেপে ও পরে পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিদের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত এবং বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক ও সামরিক প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ সমস্ত মহাদেশটিকে দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় স্বার্থ প্রসারের জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগের অদম্য বাসনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আরো জটিল করে তোলে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) এরই চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায়।

সশস্ত্র শান্তির যুগ

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপে **প্রথম শক্তিজোটের সৃষ্টি করেন জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা বিসমার্ক**। বিসমার্ক জানতেন, ফ্রান্স কোনদিনই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারবে না। এককভাবে ফ্রান্স কখনোই জার্মানীর সমকক্ষ হবে না, কিন্তু ইউরোপের এক বা একাধিক বৃহৎ শক্তিকে তার দলে টানতে পারলে ফ্রান্স জার্মানীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর **বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য হয় ফ্রান্সকে ইউরোপে মিত্রহীন অবস্থায় রাখা**। এই নীতির অনুসরণে বিসমার্ক ফ্রান্স ভিন্ন ইউরোপের সব কয়টি বৃহৎ শক্তিকে জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেন। ইংলণ্ড সম্বন্ধে তাঁর কোন ভয়ের কারণ ছিল না, কারণ ইংলণ্ড এসময় ইউরোপের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একেবারেই হস্তক্ষেপ করতে চাইত না। অষ্ট্রিয়াকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে পরাজিত করলেও বিসমার্ক তার সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন। পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমনে (১৮৬৩) সহায়তা করে তিনি রাশিয়ার জারেরও সহানুভূতি অর্জন করেন। তাছাড়া অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই দুটি রাষ্ট্রই ছিল জার্মানীর মতো রাজতন্ত্র; ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হয় তার প্রতি তাদের বিশেষ সহানুভূতি থাকার কথা নয়। তাই বিসমার্ক অতি সহজেই এই দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ১৮৭২

বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখার চেষ্টা

তিন সম্রাটের সঙ্ঘ

খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে নিয়ে **তিন সম্রাটের সঙ্ঘ** (Three Emperors' League) প্রতিষ্ঠিত হল। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থাকে স্থিতিশীল রাখা এবং সর্বত্র বিপ্লবের বিরোধিতা করা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু তিন সম্রাটের সঙ্ঘ বেশি দিন স্থায়ী হল না। **দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব** ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছিল। দুটি রাষ্ট্রই চাইছিল পতনোন্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত আপন শক্তির সীমা প্রসারিত করতে।

বার্লিন চুক্তি, ১৮৭৮

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে **রুশ-তুর্কী যুদ্ধে** তুরস্কের পরাজয় ঘটলে রাশিয়া **সান স্টীফানোর সন্ধির** (Treaty of San Stefano) দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বুলগেরিয়া (Bulgaria) নামে একটি বৃহৎ অনুগত রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড তার এই আশায় বাদ সাধল। শেষ পর্যন্ত **বার্লিনের সন্ধিতে** (Treaty of Berlin, 1878) বুলগেরিয়ার আয়তন খর্ব করা হল, রাশিয়া সামান্য ক্ষতিপূরণ পেল, এবং সেই সঙ্গে অষ্ট্রিয়াও তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুটি প্রদেশ, বসনিয়া (Bosnia) ও হার্জগোভিনার (Herzgovina) শাসনের দায়িত্ব পেল। বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার দাবী সমর্থন করায় রাশিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল এবং তার ফলে **তিন সম্রাটের সঙ্ঘ আপনা হতেই ভেঙ্গে গেল।**

এর পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক **অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এক গোপন দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি** করলেন। এই **দ্বিশক্তি মৈত্রীর** (Dual Alliance) প্রধান সর্ত ছিল এই যে দুটি রাষ্ট্রের কোনটি রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা একজোটে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবে; কিন্তু রাশিয়া ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্র তাদের একটিকে আক্রমণ করলে অপরটি সেই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই **বিসমার্ক ইটালীকেও তাঁর দলে টেনে নিলেন।** ফ্রান্সের গোঁড়া রোম্যান ক্যাথলিকেরা এই সময় ইটালীতে পোপের রাজ্য পুনরুদ্ধারের কথা চিন্তা করছিল; সুতরাং ইটালী ফ্রান্সের ভয়ে কিছুটা

দ্বিশক্তি ও ত্রিশক্তি মৈত্রী

ভীতই ছিল বলা যায়। তার উপরে ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার টিউনিস (Tunis) রাজ্যটি গ্রাস করলে ইটালী আরো ক্ষুব্ধ হয়, কারণ ঐ রাজ্যটির উপর ইটালীরও বহুদিন লোভ ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে দ্বিশক্তি মৈত্রীকে **ত্রিশক্তি মৈত্রীতে** (Triple Alliance) পরিণত করল। শেষোক্ত চুক্তিটি প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য করা হলেও পরে এর মেয়াদ একাধিক বার বাড়ানো হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অন্ততঃ কাগজে-কলমে, এই চুক্তি স্থায়ী হয়েছিল, যদিও ইটালী ও অষ্ট্রিয়া কোন দিনই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে নি।

তিন সম্রাটের সঙ্ঘ ভেঙ্গে গেলেও বিসমার্ক রাশিয়াকে শত্রুভাবাপন্ন করতে চাননি। দু বৎসরের মধ্যেই **গোপনে তিন সম্রাটের সঙ্ঘকে তিনি আবার সক্রিয় করে তুললেন**। তিন সম্রাটের যে কোন একজন চতুর্থ কোন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে, অপর দুজন অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন (১৮৮১)। প্রথমে তিন বৎসরের জন্য এই চুক্তিটি সম্পাদিত হলেও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এর মেয়াদ আরো তিন বৎসর বাড়ানো হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক রাশিয়া যাতে ফ্রান্সের সঙ্গে কিছুতেই হাত না মেলায়, তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সঙ্গে নতুন করে **'রি-ইনস্যুরেন্স' সন্ধি** (Reinsurance Treaty) স্বাক্ষর করেন।

রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি

কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিলে তাঁর বৈদেশিক নীতিও পরিত্যক্ত হয়। **জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম রাশিয়ার মৈত্রী লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না,** সুতরাং রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হল না। এরপর রাশিয়া অনিবার্যভাবে ফ্রান্সের দিকে ঝোঁকে। ১৮৮৮ সাল থেকে ফরাসী শিল্পপতি ও মহাজনেরা রাশিয়ায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ লগ্নী করেছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি ফরাসী নৌ-বহর রাশিয়ার ক্রনস্টাট (Kronstadt) বন্দরে এসে পৌঁছালে জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে উপস্থিত থেকে ফরাসী নৌ-সেনাপতি ও নাবিকদের অভ্যর্থনা জানান। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি রুশ নৌ-বহর ফ্রান্সের টুলোঁ (Toulon) বন্দরে গেলে ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাদেরও অনুরূপ সমাদর করে। এরপর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে **ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়**। মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক এই চুক্তিটি বেশ কিছুদিন গোপনে রাখা হলেও **ফ্রান্সের নির্বান্ধব অবস্থার এতে অবসান হয়**। ইউরোপে এইভাবে **প্রথম দুটি শক্তিজোটের সৃষ্টি** হয় : একদিকে থাকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী এবং অপর দিকে থাকে ফ্রান্স ও রাশিয়া।

ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী ১৮৯৪

ইংলণ্ড প্রথমে দুটি শক্তিজোটের কোনটিতেই যোগ দিতে চায়নি। ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের বহুদিন শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে আফ্রিকায় এবং রাশিয়ার সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার ফ্যাশোডা (Fashoda) অঞ্চলে (বর্তমান সুদানে) ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রায় যুদ্ধের উপক্রম হয়। কিন্তু অপর দিকে জার্মানীও দিন দিন বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিযোগী

হয়ে উঠছিল। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম একটি বিরাট নৌ-বহর গড়ে তোলার চেষ্টা করলে (১৮৯৭) ব্রিটিশ সরকার রীতিমত উদ্বেগ বোধ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদের (Boer) সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষ বাধলে দ্বিতীয় উইলিয়াম বোয়ার নেতা পল ক্রুগারকে (Paul Kruger) টেলিগ্রাম মারফৎ তাঁর অভিনন্দন জানান (১৮৯৫)। ইঙ্গ-বোয়ার যুদ্ধের সময়েও (১৮৯৯-১৯০২) জার্মানীর সহানুভূতি বোয়ারদের দিকেই ছিল। ইংলণ্ড শীঘ্রই উপলব্ধি করল যে দুটি শক্তিজোটের কোন একটিতে যোগ না দিলে অদূর ভবিষ্যতে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অনেক বিচার-বিবেচনার পর ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গেই মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

ইংলণ্ডের জোট-নিরপেক্ষতার অবসান

ইংলণ্ডে সপ্তম এডোয়ার্ডের (Edward VII) রাজত্বের (১৯০১-১১) গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের মধ্যে বোঝাপড়ার সূত্রপাত হয়, এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে **ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি** স্বাক্ষর করে ইংলণ্ড তার জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করে। এই চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স মিশরে ইংলণ্ডের বিশেষ অধিকার স্বীকার করে নেয়, এবং তার বিনিময়ে ইংলণ্ড মরোক্কোয় (Morocco) ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার স্বীকার করে। পশ্চিম আফ্রিকা, শ্যামদেশ (বর্তমান থাইল্যাণ্ড) এবং আমেরিকার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে (Newfoundland) উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব বিবাদের ব্যাপার ছিল সেগুলিরও সন্তোষজনক মীমাংসা এই চুক্তির দ্বারা করা হয়। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কোন সামরিক সাহায্যের চুক্তি না হলেও পরস্পরের মধ্যে যে মৈত্রীর সম্পর্ক (Entente) স্থাপিত হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়েই এই চুক্তির দ্বারা উপকৃত হয়েছে বলে অনুভব করে।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী

রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়েও ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বের ছিল না; জাপান তখন ইংলণ্ডের মিত্ররাষ্ট্র, আর রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের। কিন্তু রাশিয়া ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র হওয়ায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের পর বেশি দিন ইংলণ্ড রাশিয়ার কাছ থেকে সরে থাকতে পারেনি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই **ইঙ্গ-রুশ চুক্তি** অনুসারে পারস্য দেশে উভয় রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন অঞ্চল সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারণ করা হয়, আফগানিস্তানকে ইংলণ্ডের প্রভাবাধীন রাষ্ট্র বলে রুশ সরকার স্বীকার করে, আর তিব্বতের ব্যাপারে দুই রাষ্ট্রের কোনটিই হস্তক্ষেপ করবে না বলে পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এইভাবে **ইঙ্গ-ফরাসী**

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি

মৈত্রী (Anglo-French Entente) ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে **ত্রিশক্তি মৈত্রীতে** (Triple Entente) **পরিণত হয়।**

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইউরোপের **দুই শক্তি-শিবিরেই যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে।** ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়া এই পাঁচটি বৃহৎ শক্তির মধ্যেই সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণ এবং মারণাস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। জার্মানী এবং ইংলণ্ডের মধ্যে নৌ-বাহিনীর সম্প্রসারণের ব্যাপারেও এক অর্থক্ষয়ী প্রতিযোগিতা চলে। মরোক্কোয় প্রভাব স্থাপনের ব্যাপারে ফ্রান্স ও জার্মানীর সুদীর্ঘ সংঘর্ষ (১৯০৫-১১) এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে দুটি বলকান যুদ্ধ (১৯১২-১৩) ইউরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাণ্ডের হত্যাকাণ্ডই দুই শক্তি-শিবিরের মধ্যে প্রকাশ্য সামরিক সংঘর্ষের সূচনা করে।

ইঙ্গ-জার্মান অস্ত্র প্রতিযোগিতা

দশম পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ
(Socialism and Imperialism)

সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান : উদারনীতি (Liberalism) ও গণতন্ত্রের (Democracy) মতো সমাজতন্ত্রও (Socialism) ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অবশ্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **প্লেটোর** (Plato) রচনার মধ্যেই সমাজতন্ত্রবাদের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু প্লেটোর সমাজতন্ত্রবাদ ও আধুনিক মার্ক্সীয় সাম্যবাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। 'ইউটোপিয়া' (Utopia) গ্রন্থের রচয়িতা **স্যার টমাস মোরের** (Sir Thomas More) মতো (ষোড়শ শতাব্দী) কোন কোন লেখকও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে **উইনষ্ট্যানলি** (Winstanley) পরিচালিত **'ডিগার'** (Digger) আন্দোলন ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্সে **'বাবুফ'** (Babeuf) আন্দোলনকে আমরা আধুনিক যুগের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্বগামী বলে অভিহিত করতে পারি। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এই যুগে যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে চিন্তা বা আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে **ফুরিয়ের** (Fourier), **সাঁ সিমো** (Saint Simon) ও **রবার্ট আওয়েনের** (Robert Owen) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ, রবার্ট আওয়েনই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism) কথাটির প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার ইতিহাস

উপরে যে সব সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তানায়কদের নাম উল্লেখ করা হল, বর্তমান কালে তাঁদের অনেক সময় **'ইউটোপিয়ান সোস্যালিষ্ট'** (Utopian Socialist) আখ্যা দেওয়া হয়। এঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আইনের চোখে সকলের সমতা বা সকল মানুষের সমান রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয় ; এগুলির সঙ্গে **অর্থনৈতিক সমতা** যুক্ত হলে তবেই আদর্শ সমাজের সৃষ্টি সম্ভব। অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে **সব রকম**

অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। ভূস্বামীদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ এবং কল-কারখানার মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ এইসব অর্থনৈতিক শোষণের মধ্যে প্রধান। দ্বিতীয়তঃ, এই 'ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্ট'রা সমাজে **ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ** করতে চেয়েছিলেন, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকেই সমাজে এক শ্রেণীর লোক অর্থনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে ও তার বলে অন্যান্যদের ইচ্ছামতো পরিচালনা করে। নৈরাজ্যবাদের (Anarchism) উদ্গাতা **প্রুধো** (Proudhon) ঘোষণা করেন, 'সমস্ত সম্পত্তি চুরির মাল', অর্থাৎ শোষণ ও বঞ্চনার দ্বারাই আজ পর্যন্ত যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কারণেই সম্পত্তি রক্ষার নৈতিক অধিকার কারো নেই। তৃতীয়তঃ, এই সব সমাজতন্ত্রবাদী মনীষীরা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে **দারিদ্র্যের অবসান** ঘটাতে চেয়েছিলেন। চতুর্থতঃ, তাঁরা **সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রার আদর্শকেও** জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ হবে এবং প্রত্যেকে তার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে, এই ছিল তাঁদের অন্তরের আশা।

ইউটোপিয়ান সোস্যালিষ্টদের আদর্শ

কিন্তু এই সব চিন্তানায়কদের চিন্তাধারার প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে তাঁরা অতিরিক্ত **কল্পনাবিলাসী ও বাস্তববিমুখ** ছিলেন। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা বা তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজের বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ধারণ করার বিশেষ কোন চেষ্টা তাঁরা করেননি। দ্বিতীয়তঃ, কোন উপায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে সে সম্বন্ধেও তাঁরা বাস্তব পথ নির্দেশ করতে পারেননি। সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর কাছে বারংবার আবেদন জানিয়ে, তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করে, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব বলে এই চিন্তানায়কেরা মনে করতেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের বা সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর কোন সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম বা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেননি। 'ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্ট'দের এই কল্পনা-বিলাস ও সংগ্রাম-বিমুখতার জন্যই **তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি**। তবে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রতি তাঁরা জনসাধারণের দৃষ্টি তীক্ষ্ণভাবে আকর্ষণ করেন এবং সেগুলি দূর করার জন্য তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আন্তরিক চেষ্টাও করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

তাঁদের দুর্বলতা

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদ : 'ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্ট'দের চিন্তাধারার দুর্বলতাগুলি দূর করে আধুনিক **বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের** জন্ম দেন দুই জার্মান

মনীষী,— **কার্ল মার্ক্স** (Karl Marx) এবং **ফ্রেডারিক এঙ্গেলস** (Frederick Engels)। এঁদের দুজনের জীবনের প্রধান কীর্তি ছিল **সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও সমকালীন শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যোগস্থাপন**। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতে সমাজ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয় না, গঠিত হয় কতকগুলি অর্থনৈতিক শ্রেণী (class) বা গোষ্ঠীকে নিয়ে। এই সব শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী, এবং তাদের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ সমাজের ইতিহাসই **শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস**। সকল সময়েই সমাজ কোন না কোন শ্রেণীর প্রভাবাধীন, এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণী অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীগুলিকে শোষণ বা নিপীড়ন করেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। সংগ্রাম ভিন্ন কোন ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা কখনো সম্ভব নয়। বিভিন্ন যুগে এই শ্রেণী-সংগ্রাম (Class Struggle) বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান যুগে শ্রেণী-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে এই সংগ্রাম প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ, এবং সংগঠন ও সংঘর্ষের পথেই শ্রমিকদের এ সংগ্রামে জয়লাভ করতে হবে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের প্রধান কর্তব্য হল শ্রমিকদের এই শ্রেণী-সংগ্রাম বিষয়ে সচেতন করা ও সংগ্রামে জয়লাভ করতে তাদের সাহায্য করা। শ্রমিকদের জয়লাভের পরেই পৃথিবীতে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে।

ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রাম

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস **জড়বাদী দর্শনে** (Materialism) বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্বে তাঁরা আস্থাবান ছিলেন না, চৈতন্যকে তাঁরা বস্তুরই একটি গুণ বলে বিচার করতেন। ধর্মকেও তাঁরা সেজন্য শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতিতে বিশ্বাস করলে মানুষের সংগ্রামী মনোভাব কমে যায়, সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলে মেনে নেয়, এই ছিল তাঁদের যুক্তি।

জড়বাদী দর্শন

প্রচলিত **ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সমালোচনা** ছিল অতি তীব্র। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল যে সমস্ত বিত্তই শ্রমের সৃষ্টি, এবং শ্রমিকেরা যা উৎপাদন করে তার পূর্ণ মূল্যই তাদের প্রাপ্য। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কল-কারখানার মালিকেরা ও তাদের অনুচরেরা শ্রমিকদের তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে উৎপন্ন বিত্তের অধিকাংশই নিজেরা আত্মসাৎ করে। তবে **ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবণতা হল ক্রমশঃ স্বল্পতর ব্যক্তির হস্তে**

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সমালোচনা

অধিকতর ধনের সঞ্চয়। তার ফলে সমাজে বিত্তহীন ও বিত্তবানের পার্থক্য ক্রমশই প্রকট হয়ে পড়বে এবং সংখ্যাগুরু বিত্তহীনের দল মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহিত হবে। **পরিণামে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ধ্বংস ও শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।**

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস **আন্তর্জাতিকতাবাদী** (Internationalist) ছিলেন। তাঁদের প্রবর্তিত সাম্যবাদে কোন ভৌগোলিক বা জাতিগত সীমারেখা স্বীকার করা হয়নি। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই শ্রমিকেরা নির্যাতিত, সুতরাং দেশ ও জাতি নির্বিশেষে তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। যে কোন দেশের বা জাতির শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য দেশ বা জাতির শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের যতটা মিল আছে, আপন দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে তাদের ততটা মিল নেই। তাঁর এই নীতিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য মার্ক্স ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে **প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ** (First International Workingmen's Association) প্রতিষ্ঠা করেন, তবে মার্ক্সের জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যে মতভেদের ফলে এই সঙ্ঘ খুব দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন: উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে **সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসারের মূল কারণ ছিল শিল্প-বিপ্লবের দ্রুত অগ্রগতি।** শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর দুর্গতি প্রথম দিকে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। শ্রমিকেরা কল-কারখানাগুলিকেই তাদের দুর্গতির কারণ মনে করে অন্ধ আক্রোশের বশে সেগুলিকেই প্রথমে ভাঙ্গার চেষ্টা করে। ইংলণ্ডে **লাড্ডাইটদের দাঙ্গা** (Luddite Riots) শ্রমিকদের এই অন্ধ আক্রোশেরই প্রকাশ। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং সংগঠন ও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এইভাবে **শ্রমজীবী-সঙ্ঘগুলি** (Trade Union) গড়ে ওঠে। ইংলণ্ডে রবার্ট আওয়েনের নেতৃত্বে **গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল** (Grand National) নামে বিরাট শ্রমজীবী-সঙ্ঘ গঠিত হয়, কিন্তু কার্যতঃ এর দ্বারা শ্রমিক-শ্রেণীর বিশেষ কিছু সুবিধা হয়নি। এর পর ইংলণ্ডে **চার্টিস্ট** (Chartist) **আন্দোলনের** (১৮৩৬-৪৮) মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা চলে। শ্রমজীবীরা পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের কথা ভেবেছিল। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সুচিন্তিত কর্মপন্থার অভাবে চার্টিস্ট আন্দোলনও সফল হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি

সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন

সময়ে ফ্রান্সে **লুই ব্লাঙ্কের** (Louis Blanc) নেতৃত্বে এবং **জার্মানীতে** সাইলেশিয়া (Silesia) অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে কিছুদিন সমাজতন্ত্রী দল প্রজাতন্ত্রীদের সহযোগিতায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তারা আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে **কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-৮৩) অভ্যুদয়** হয়। প্রাশিয়ার এক জার্মান ইহুদী পরিবারে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক্সের জন্ম হয়। বন (Bonn) ও বার্লিন (Berlin) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি হেগেলের (Hegel) দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন। একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক রূপে সরকার-বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি প্রাশিয়া থেকে বহিষ্কৃত হন। এর পর কিছুদিন তিনি প্যারিসে এসে বসবাস করেন এবং সেখানেই ভবিষ্যতের সহযোগী এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।



কার্ল মার্ক্স

কার্ল মার্ক্সের কৃতিত্ব

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে আশ্রয় নেন। ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রবাদী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে বিপ্লবের প্রাক্কালে তিনি **'সাম্যবাদের ইস্তাহার'** (The Communist Manifesto) নামে তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকাটি রচনা করেন। মার্ক্সের সাম্যবাদী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রথম এই পুস্তিকাতে পাওয়া যায়। এর পর লণ্ডনে বসবাস কালে মার্ক্সের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **'ক্যাপিটাল'**-এর (Das Capital) প্রথম খণ্ড ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (এর পরবর্তী দুই খণ্ড প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে)। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্ক্সের চিন্তাধারা এক নতুন যুগের সূচনা করে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁর মতবাদের ভিত্তিতে সাম্যবাদী দল (Communist Party) গড়ে ওঠে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পরিচালিত করার জন্য মার্ক্স **'প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ'** স্থাপন করেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিভেদের জন্য এই সঙ্ঘ শীঘ্রই দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৭১

খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের বামপন্থী বিপ্লবীরা ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (Revolt of the Paris Commune) ঘোষণা করলে মার্ক্সবাদীরা তাতে যোগ দেয়, কিন্তু এই বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। **জার্মানীতে** ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং **রাশিয়াতে** ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রী দল স্থাপিত হয় এবং দুই দেশেই সরকারী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রবল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিনের নেতৃত্বে **রাশিয়াতেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চূড়ান্ত জয়লাভ করে,** এবং পৃথিবীর **প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র** রাশিয়াতেই স্থাপিত হয়।

রাশিয়ায় সাম্যবাদী আন্দোলনের সাফল্য

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল মোটামুটি ভাবে **ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগ।** শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডে প্রথম আরম্ভ হওয়ায় **ইংলণ্ডই ইউরোপের মধ্যে সব চেয়ে শিল্পোন্নত দেশ** হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আপন শিল্পজাত পণ্য বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানির জন্য **ইংলণ্ড নিঃশুল্ক বাণিজ্যের** (Free Trade) **নীতি প্রবর্তন করে** এবং ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশ এই নীতি গ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিঃশুল্ক বা অবাধ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং দ্রুত কল-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে শিল্প-সমৃদ্ধি অর্জনই ছিল এ যুগে ইউরোপের বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে **বিভিন্ন শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে এক তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়।** বিশেষতঃ জার্মানী, আমেরিকা ও জাপান ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রতিটি দেশই তখন **শিল্প-সংরক্ষণের নীতি** (Protectionist Policy) গ্রহণ করে অন্য দেশ থেকে শিল্পজাত পণ্যের আমদানি কমাবার চেষ্টা করে। ঐ সঙ্গে আপন শিল্পজাত পণ্য বিদেশে বিক্রয় ও কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধার জন্য প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশেই **উপনিবেশ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী** হয়। এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ড অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এই ভাবেই **এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।** উপনিবেশ স্থাপন ছাড়াও ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির কাছ থেকে নানা রকম **বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায়** করার জন্য চাপ দিতে থাকে

ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণ

ধনতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

উপনিবেশ বিস্তারের প্রেরণা

ও **বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল** (Sphere of Influence) **স্থাপন** করে সেগুলিকে কার্যতঃ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। এই ভাবে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন **অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ** (Economic Imperialism) মাথা তুলে দাঁড়ায়, এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সাম্রাজ্য-বিস্তার নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মধ্যে মধ্যে যুদ্ধেরও সৃষ্টি হয়। পাঁচ-ছয়টি শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই সাম্রাজ্যবাদের যুগে সারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষার জন্য এই **বৃহৎ শক্তিদের প্রাধান্য** স্বীকার করে তাদের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কি ভাবে এশিয়া ও আফ্রিকাকে গ্রাস করল এখন তারই আলোচনা করা হবে।

অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ

আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ (Partition of Africa)

ঊনবিংশ শতকের সূচনায় আফ্রিকা মহাদেশের খুব সামান্য অংশেই ইউরোপীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আফ্রিকার উত্তর উপকূল ইউরোপীয়দের কাছে সুপরিচিত হলেও এর অধিকাংশ ছিল নামতঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, কার্যতঃ স্বয়ংশাসিত। সুদূর দক্ষিণে কেপ কলোনী (উত্তমাশা অন্তরীপ), পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে কয়েকটি অঞ্চল ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে মাত্র দুটি অঞ্চল ছিল ইউরোপীয়দের অধিকারে। বাদবাকী সমস্ত আফ্রিকাই ছিল ইউরোপীয়দের কাছে রহস্যে আবৃত **অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ** (Dark Continent)। **বার্টন** (Burton), **লিভিংস্টোন** (Livingstone), **স্ট্যানলি** (Stanley) প্রভৃতি পর্যটকদের চেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ রূপটি ইউরোপীয় জাতিদের কাছে প্রকাশিত হয়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে **ফ্রান্সই** প্রথম আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে উদ্যোগী হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জলদস্যুদের দমনের অছিলায় লুই ফিলিপের সরকার আফ্রিকার উত্তর উপকূলে আলজিয়ার্সে এক অভিযান পাঠায়। কিছুদিনের মধ্যেই **আলজিরিয়ার** (Algeria) অভ্যন্তরেও তারা আপন প্রভাব স্থাপনের চেষ্টা করে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রচণ্ড বাধা দান সত্ত্বেও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যেরা কনস্ট্যানটাইন (Constantine) শহর অধিকার করে এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশপ্রেমিক নেতা আবদুল খালেককে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে তারা আলজিরিয়াকে ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করে।

আলজিরিয়ায় ফরাসী অধিকার

কেপ কলোনীতে প্রথমে **ওলন্দাজেরা** (Dutch) তাদের উপনিবেশ স্থাপন

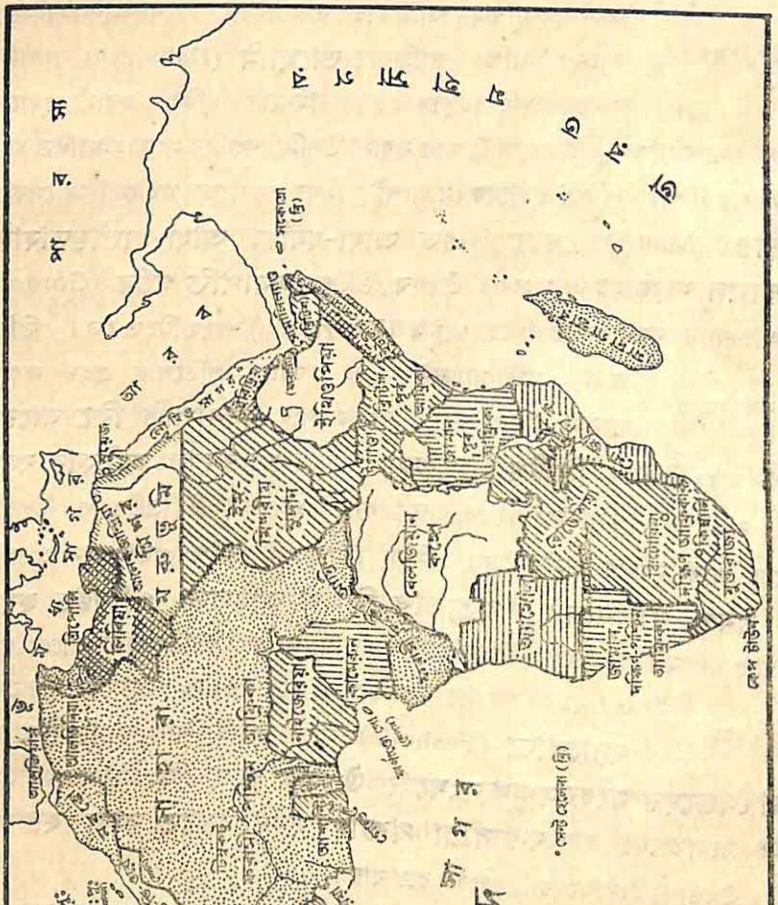
করেছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলার সময় ইংরাজরা কেপ কলোনী অধিকার করে। তখন ব্রিটিশ প্রভুত্ব থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য **'বোয়ার'** (Boer) নামে পরিচিত কেপ কলোনীর ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের বংশধরেরা দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে অপসরণ করতে থাকে। এরাই ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে **অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট** (Orange Free State) এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে **ট্রান্সভাল** (Transvaal) নামে দুটি রাজ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থাপন করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বোয়ার-অধিকৃত অঞ্চলে হীরার খনি আবিষ্কৃত হলে ইংরাজদের লোলুপ দৃষ্টি তার উপর পড়ে এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা দুটি বোয়ার রাজ্যই দখল করে নেয়। কিন্তু বোয়ারেরা অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ১৮৮১ সালে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন (Gladstone) দুটি বোয়ার প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার অধিকার

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যান্দ দ্য লেসেপস (Ferdinand de Lesseps) মিশরের মধ্য দিয়ে **সুয়েজ খাল** (Suez Canal) **খনন** করলে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথও সুগম হয়। স্বভাবতঃই যে সব ইউরোপীয় জাতি দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ছিল তারা সুয়েজ খালটিকে আপন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের সুলতান ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর সুয়েজ খাল কোম্পানীর 'শেয়ার'গুলি (Shares) বিক্রয় করেন, এবং পরের বৎসরেই **মিশরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ নিয়ন্ত্রণ** স্থাপিত হয়। এই বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আরাবী পাশার (Arabi Pasha) নেতৃত্বে **মিশরে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন** দেখা যায়। ফরাসীরা এ ব্যাপারে অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকলেও **ব্রিটিশ সরকার** সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে **এই আন্দোলন দমন করে** (১৮৮২-৮৩), এবং তার ফলে **মিশরের উপর যৌথ ইঙ্গ-ফরাসী নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে একক ভাবে ইংলণ্ডের আধিপত্য স্থাপিত হয়।**

মিশরে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপন

ফরাসীরা এইভাবে মিশর হারালেও ইতিমধ্যে তারা আফ্রিকার উত্তর উপকূলে **টিউনিস** (Tunis) রাজ্যটি গ্রাস করেছিল (১৮৮১)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ফরাসীরা আফ্রিকার এক বিরাট অংশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর উপকূলে আলজিরিয়া ও টিউনিস থেকে দক্ষিণ দিকে এবং পশ্চিম উপকূলে


আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ
১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ
ব্রিটিশ অধিকৃত
ফরাসী ,,
জার্মান ,,
পর্তুগীজ ,,
ইটালী ,,

সেনেগাল (Senegal) থেকে পূর্ব দিকে রাজ্যবিস্তার করে তারা সাহারা সহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার এক বিরাট অংশ আপন নিয়ন্ত্রণে আনে। পশ্চিম আফ্রিকার **ডাহোমি** (Dahomey) রাজ্যটিও তাদের অধিকারভুক্ত হয়। মিশরের দক্ষিণে ফরাসী সুদানের (Sudan) সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলির সংযোগ স্থাপিত হয়।

ফরাসী উপনিবেশ বিস্তার

এর পর মিশরের দক্ষিণে সুদানের যে অংশটুকু মিশর সরকারের অধীনে ছিল সেখানে **মাহ্‌দীর** (Mahdi) **নেতৃত্বে এক আধা-ধর্মীয়, আধা-জাতীয়তাবাদী আন্দোলন** আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ **সেনাপতি গর্ডন** (Gordon) এই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে খার্টুম (Khartoum) শহরে নিহত হন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাননি, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে **সেনাপতি কিচেনারের** (Kitchener) অধীনে **ব্রিটিশ সৈন্যেরা** **য় সুদান অধিকার করে** (১৮৯৭-৯৮) এবং তুলা-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এই অঞ্চলটি ব্রিটিশ ও মিশরীয় সরকারের যৌথ নিয়ন্ত্রণে আনীত হয়। মিশর ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ প্রভাবাধীন হওয়ায় কার্যতঃ **সমগ্র নীলনদের উপত্যকায় ব্রিটিশ অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।** ফরাসীরাও পশ্চিম দিক থেকে নীলনদের উপত্যকায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য এ সময় অগ্রসর হচ্ছিল। ফলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুদানের **ফ্যাশোডা** (Fashoda) নামে একটি জায়গায় **ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে সম্মুখ সংঘর্ষের উপক্রম** হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য **ফরাসীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়** ও নীলনদের উপত্যকা ইংরাজদের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে যায়।

সুদানে ব্যর্থ বিদ্রোহ

ফ্যাশোডার ঘটনা

আফ্রিকার অভ্যন্তরে ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ক্ষমতা-বিস্তারের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃই তীব্র হয়ে উঠে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে **বেলজিয়ামের** রাজা **লিওপোল্ডের** (Leopold) অধীনে **আন্তর্জাতিক আফ্রিকা পরিষদ** (International African Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত **বার্লিন সম্মেলনে** (Berlin Conference) ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা এই পরিষদটি ভেঙ্গে দিলেও লিওপোল্ডকে আফ্রিকার **কঙ্গো ফ্রী স্টেটের** (Congo Free State) রাজা হিসাবে তারা স্বীকার করে নেয়। তা ছাড়া ভবিষ্যতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কোন নীতির ভিত্তিতে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করবে সে বিষয়েও এই সম্মেলন কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বার্লিন সম্মেলন (১৮৮৫)

১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে **জার্মানী টোগোল্যাণ্ড** (Togoland), **কামেরুন** (Cameroon) **ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায়** তার উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি করে জার্মানী পূর্ব আফ্রিকাতেও তার একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। **পোর্তুগীজরাও** আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে আগ্রহী ছিল, এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে **আঙ্গোলায়** (Angola) এবং পূর্ব উপকূলে **মোজাম্বিকে** (Mozambique) শীঘ্রই তাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু এরপর যখন তারা এই দুটি উপনিবেশকে একত্র যুক্ত করার চেষ্টা করে তখন ব্রিটিশ সরকার তাদের সে চেষ্টায় বাধা দেয় ও ঐ দুটি উপনিবেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল ব্রিটিশ সেনাপতি **সিসিল রোডস** (Cecil Rhodes) অধিকার করে নেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ব্রিটিশ উপনিবেশ **রোডেসিয়া** (Rhodesia) স্থাপিত হয়। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে **ফরাসীরা** দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কাছে **মাডাগাস্কার** (Madagascar) নামে বৃহৎ দ্বীপটি জয় করে নেয়।

জার্মান উপনিবেশ স্থাপন

পোর্তুগীজ উপনিবেশ বিস্তার

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজদের সঙ্গে বোয়ারদের সম্পর্ক বহুদিন ধরেই তিক্ত ছিল। হীরার খনির সন্ধানে বহু ইংরাজ ও অন্যান্য শ্বেতকায় জাতির লোকে বোয়ারদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে **ইংরাজদের সঙ্গে বোয়ারদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ** বাধে, এবং এই যুদ্ধের ফলে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ইংরাজদের হস্তগত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দুটি অধিকৃত রাজ্যের সঙ্গে কেপ কলোনী ও নাটালকে (Natal) যুক্ত করে **দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্য** (Union of South Africa) নামে বৃহৎ ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বোয়ার যুদ্ধ

সব শেষে **ইটালীও** আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে উদ্যোগী হয়। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে টিউনিস জয়ের বাসনা তার বহুদিন ধরে থাকলেও, ফরাসীরা ঐ রাজ্যটি অধিকার করে নিলে, ইটালী বাধ্য হয়ে পূর্ব আফ্রিকায় লোহিত সাগরের উপকূলে উপনিবেশ বিস্তারে মন দেয়। কিন্তু এই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র **আবিসিনিয়ার** (Abyssinia) উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে ইটালী বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে **অ্যাডোয়ার যুদ্ধে** (Battle of Adowa) আবিসিনীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে ইটালীয় সৈন্যেরা শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়। যাই হোক, লোহিত সাগরের উপকূলে **ইরিট্রিয়া** (Eritrea) ও ভারত মহাসাগরের উপকূলে **সোমালিল্যাণ্ড**

ইটালীর উপনিবেশ বিস্তার

(Somaliland) ইটালীর অধিকারে থেকে যায়। কয়েক বৎসর পরে, ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে, আফ্রিকার উত্তর উপকূলে মিশর ও টিউনিসের মধ্যবর্তী **ট্রিপলি** (Tripoli) বা **লিবিয়া** (Libya) রাজ্যটি ইটালী দখল করে।

ফ্রান্স ইতিমধ্যেই আফ্রিকার এক বিরাট অংশে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হওয়ার পর ফরাসীরা উত্তর আফ্রিকার **মরোক্কোতে** তাদের উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা করে এবং জার্মানীর প্রবল বাধা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সফল হয় (১৯০৫-১১)।

ফ্রান্সের মরোক্কো গ্রাস

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সারা আফ্রিকা মহাদেশ এই ভাবে ইউরোপের বৃহৎ শক্তি-গুলির মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। শুধু পূর্ব দিকে **আবিসিনিয়া** (বা ইথিওপিয়া) এবং পশ্চিম দিকে **লাইবেরিয়া** (Liberia) **কোন ক্রমে আপন স্বাধীনতা অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিল**। লাইবেরিয়া ছিল মুক্তিপ্রাপ্ত মার্কিন নিগ্রো ক্রীতদাসদের আশ্রয়স্থল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোষকতা-প্রাপ্ত। পরবর্তী কালে আবিসিনিয়া ইটালীর ফ্যাসিস্ট সরকারের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল।

আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাষ্ট্র

এশিয়ায় ইউরোপীয় জাতিদের সাম্রাজ্য বিস্তার

অনুন্নত আফ্রিকার মতো এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্র হয়েছিল। **এই সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স**।

রুশ অধিকারঃ উনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই এশিয়ার উত্তর ভাগে **সাইবেরিয়ার** (Siberia) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমিদাস প্রথা এখানে প্রচলিত না থাকায় বহু রুশ কৃষক এই অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আগ্রহী হয়। তাছাড়া আদালতের বিচারে দণ্ডিত বহু অপরাধীকেও রুশ সরকার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। এরাই প্রথম সাইবেরিয়ায় ছোট ছোট রুশ উপনিবেশ গড়ে তোলে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া **আমুর নদীর** (Amur) **উত্তরে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল** অধিকার করে এবং চীন সরকার এক সন্ধির দ্বারা তার এই অধিকার মেনে নেয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে **কোরিয়ার** (Korea) উপরও রাশিয়ার দৃষ্টি পড়ে। ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্য প্রসারিত হয় এবং জাপান সাগরের তীরে রাশিয়ার বিখ্যাত বন্দর ও নৌ-ঘাঁটি **ভ্লাডিভোসটক** (Vladivostok) স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলে রাশিয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয় জাপান।

দূর প্রাচ্য

মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় এবং তারই চূড়ান্ত পরিণতি হয় **রুশ-জাপান যুদ্ধে** (১৯০৪-০৫) **রাশিয়ার পরাজয়ে।**

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়া **মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে** অগ্রসর হয়। কালক্রমে সমস্ত **তুর্কীস্থান** রুশ অধিকারভুক্ত হয় (১৮৮১)। এর পূর্বেই **পারস্যে** রুশ প্রভাব স্থাপিত হয়েছিল, এবং **আফগানিস্তানেও** রাশিয়া তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যের এই অগ্রগতিতে ইংলণ্ড অত্যন্ত শঙ্কিত বোধ করে। এরই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে **দীর্ঘকালব্যাপী ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার** সূত্রপাত হয়। এই যুগের **দুটি ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ** এই প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পরিণতি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আফগান-সীমান্তে **পাঞ্জদে** (Panjdeh) অধিকার করলে ইংলণ্ডের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু দূরদর্শী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় **পামির (Pamir) উপত্যকা** অধিকার করে।

মধ্য এশিয়া

অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের **ইঙ্গ-রুশ চুক্তির** মাধ্যমে এশিয়ায় এই দুই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে। এই চুক্তির দ্বারা পারস্যের উত্তরাংশে রুশ প্রভাব এবং দক্ষিণাংশে ব্রিটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, আফগানিস্তান ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকা বলে স্বীকৃত হয়, এবং তিব্বতের ব্যাপারে দুটি রাষ্ট্রই হস্তক্ষেপ করা থেকে নিবৃত্ত হবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এই চুক্তির জন্যই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড ও রাশিয়া একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পেরেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে **ভারতবর্ষ** ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারকে ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ওলন্দাজ ও ফরাসীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে তিনটি যুদ্ধের ফলে (১৮২৬, ১৮৫২ ও ১৮৮৫) ব্রিটিশ সরকার সমস্ত **ব্রহ্মদেশও** জয় করে নেয়। ভারত মহাসাগরে **সিংহল** দ্বীপটি হল্যাণ্ডের কাছ থেকে এবং **মরিশাস** দ্বীপ ফ্রান্সের কাছ থেকে ইংলণ্ড হস্তগত করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় **সিঙ্গাপুরে** (Singapore) ইংলণ্ডের নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হয় এবং **মালয় দ্বীপপুঞ্জে** ও বোর্ণিওতে (Borneo) ব্রিটিশ আধিপত্য প্রসারিত হয়।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ফরাসী উপনিবেশ বিস্তার : ভারত ও ব্রহ্মদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক বৃহৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে **সাইগন** (Saigon) শহর সহ সমগ্র **কোচিন-চীন** (Cochin-China) ফরাসী অধিকারভুক্ত হয় এবং **কাম্বোডিয়াও** (Cambodia) ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় (১৮৬৮-৬৯)। তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের আমলে চীনের সঙ্গে এক স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের পর ফ্রান্স **আনাম** (Annam) ও **টংকিনেও** (Tonkin) তার অধিকার বিস্তার করে (১৮৮৫-৮৬)। কাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, আনাম ও টংকিন নিয়ে শেষ পর্যন্ত **ফরাসী ইন্দোচীন** উপনিবেশ (French Indo-China) গঠিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজদের দ্বারা বিতাড়িত হলেও ফ্রান্স এদেশের চারটি শহর—চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মাহে ও কারিকলে বহুদিন পর্যন্ত তার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে। এশিয়ায় ও আফ্রিকাতে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আয়তনে ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ডের চেয়েও অনেক বড় ছিল ; ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও একই কথা বলে চলে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স ছাড়াও আরো দুটি ইউরোপীয় জাতি এশিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। **ওলন্দাজরা** (Dutch) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **ইন্দোনেশিয়াতে** ও **পোর্তুগীজরা** (Portuguese) ভারতের **গোয়া, দমন** ও **দিউ** অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে, এবং বিংশ শতাব্দীতেও বহু কাল তাদের এই উপনিবেশগুলি অটুট ছিল।

ওলন্দাজ ও পোর্তুগীজ অধিকার

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত : চীনে সংস্কার ও বিপ্লবের কাহিনী

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় চীনদেশের সাম্রাজ্য ছিল **বিশ্বের প্রাচীনতম সাম্রাজ্য**। চীনারা তাদের এই সাম্রাজ্যকে 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্য' (Celestial Empire) ও তাদের দেশকে 'মধ্য দেশ' (Middle Kingdom) আখ্যায় অভিহিত করত, আর মাঞ্চু বংশের সম্রাটকে তারা বলত 'স্বর্গের সন্তান' (Son of Heaven)। চৈনিক সভ্যতা যে **পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সমুন্নত সভ্যতা** ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কাগজ, ছাপাখানা, বারুদ ও দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের (Compass) আবিষ্কার চীনাদেরই কীর্তি। চতুর্দিকে সাগর, পর্বত ও মরুভূমির দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় **চীনদেশ কার্যতঃ একটি স্বতন্ত্র জগতে** পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন সামরিক প্রথা ও প্রাচীন চিন্তাধারা বা আদর্শের প্রতি চীনাদের আকর্ষণ এত বেশি ছিল যে তারা নতুন কোন

চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

প্রথা বা ভাবধারাকে সহজে গ্রহণ করতে চাইত না। বিদেশীদের তারা বর্বর বলেই মনে করত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এসে তাদের এই সব বহুকাল-পোষিত সংস্কার ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

ইউরোপীয় বণিক ও ধর্মপ্রচারক

ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে **পোর্তুগীজ বণিকরাই প্রথম চীনের ক্যাণ্টন (Canton) বন্দরে পদার্পণ করে** ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। রুশ সরকার সাইবেরিয়ায় উপনিবেশ বিস্তার করতে আরম্ভ করলে চীন সরকারের সঙ্গে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাদের একটি চুক্তি হয়। **ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরাও** সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনে আসে এবং বণিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু **খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকও (Christian missionaries)** এই দেশে আসতে আরম্ভ করে। সহসা এত বিদেশীর আগমনে সন্ত্রস্ত হয়ে চীনারা তাদের দেশ থেকে সমস্ত বিদেশীদের বহিষ্কৃত করে দেয়, এবং একমাত্র ক্যাণ্টন বন্দর ছাড়া চীনের সব জায়গায় বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধ, ১৮৩৯-৪২

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ক্যাণ্টনের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশির ভাগই ছিল ইংরাজদের **ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর** (East India Company) নিয়ন্ত্রণে এবং এদের **প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল ভারত থেকে আনীত আফিম,** যা চীন সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইংরাজ বণিকেরা ঐ দেশে গোপনে নিয়ে যেত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর কোম্পানী ছাড়াও অন্যান্য ইংরাজ বণিক এই ব্যবসায়ে ভাগ বসায়। চীনা 'কমিশনার' লিন (Lin) ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করার চেষ্টা করলে ইংরাজদের সঙ্গে চীন সরকারের যুদ্ধ বাধে। এই তথাকথিত **অহিফেন যুদ্ধে (Opium War)** চীনারা পরাজিত হয় এবং **নানকিং-এর সন্ধির** (১৮৪২) দ্বারা চীন সরকার **হংকং** (Hongkong) বন্দরটি ইংরাজদের কাছে সমর্পণ করে ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ তাদের দিতে সম্মত হয়। এ ছাড়া চীনের পাঁচটি বন্দর বিদেশী বণিকদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, এবং চীন সরকার ঐ বণিকদের কাছ থেকে কতটা আমদানি শুল্ক নিতে পারবে তার মাত্রাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। চীন সরকারের দুর্বলতা এই সন্ধির দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হয়।

নানকিং-এর সন্ধির পর বিভিন্ন বিদেশী সরকার চীন দেশে নিজেদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা জোর করে আদায় করে নেয়। মার্কিন সরকারের সঙ্গে এক চুক্তির মাধ্যমে চীন সরকার তাদের দেশে মার্কিন বণিকদের বিচারের অধিকার ত্যাগ করে।

পাশ্চাত্য শক্তিদের অনুপ্রবেশ

মার্কিন বণিকেরা চীনে কোন অপরাধ করলে তাদের নিজের রাষ্ট্রের আদালতে তাদের বিচার হবে বলে ঠিক হয়। ফরাসী সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত অপর এক চুক্তির মাধ্যমে চীন সরকার তাদের দেশে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অবাধ ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় (১৮৪৫)। এই সব সন্ধির মাধ্যমে বিদেশীদের কাছে চীন দেশ বহু পরিমাণে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তাইপিং বিদ্রোহ

১৮৫১ থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন দেশে **তাইপিং বিদ্রোহ** (Taiping Rebellion) চলে। চীন সরকারের এই দুর্দিনে বিদেশী শক্তিরা নানা রকম চাপ দিয়ে নিজেদের জন্য কতকগুলি অন্যায় সুবিধা আদায় করে নেয়। যে পাঁচটি বন্দর বিদেশী বণিকদের কাছে ইতিপূর্বে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলির অংশ-বিশেষ কোন-না-কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে **পাঁচটি বন্দরেই চীনা শহরের পাশাপাশি বিদেশী শহর গড়ে ওঠে**। ইংরাজরা হ্যাংকাউতে (Hangkou) ও ফরাসীরা টিয়েনসিনে (Tientsin) এই সুযোগ লাভ করে। **সাংহাই** (Sanghai) বন্দরটি বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের যৌথ পরিচালনাধীন **আন্তর্জাতিক বন্দরের রূপ ধারণ করে**। এই সব বন্দরে শুল্ক আদায়ের ভারও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ (১৮৫৭-৬১)

বিদেশী রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব চীনাদের মধ্যে স্বভাবতই এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং দেশের নানা স্থানে 'বিদেশী শয়তানদের' বিরুদ্ধে চীনারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অপর দিকে বিদেশী বণিকেরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ইতিমধ্যে পেয়েছিল তাতে সন্তুষ্ট না থেকে নিত্য নতুন দাবী জানাতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদ্রীকে সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঐ বৎসরই আবার চোরাকারবারে জড়িত একটি ইংরাজ জাহাজও আটক করা হয়। চীন সরকারের এইসব কাজের প্রতিবাদে **ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার একযোগে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে** (১৮৫৭)। চীনারা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিদেশী রাষ্ট্রদের আরো সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে **টিয়েনসিনের সন্ধির** (Treaty of Tientsin) দ্বারা চীন সরকার আরো এগারোটি বন্দর বিদেশী বণিকদের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়, রাজধানী পিকিং-এ (Peking) বিদেশী রাষ্ট্রদূত গ্রহণ করতে সম্মত হয়, চীন দেশের ভিতরে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সম্পত্তি কেনবার অধিকার স্বীকার করে এবং আফিমের ব্যবসাকেও বৈধতার ছাড়পত্র দেয়। ইউরোপ ও আমেরিকার নাগরিকেরা চীনে

বসবাস কালে কোন অপরাধ করলে নিজের নিজের দেশে তাদের বিচার হবে বলে স্থির হয়।

১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রুশ সরকারও সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে চীনের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয় এবং মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার উপর তাদের শ্যেন-দৃষ্টি পড়ে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নবজাগ্রত **জাপান** চীনের **লুচু দ্বীপপুঞ্জ** (Loochoo Islands) আত্মসাৎ করে। **ফ্রান্স** ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনের আশ্রিত রাজ্য **ইন্দোচীন** গ্রাস করে, এবং প্রায় একই সময় **ইংলণ্ড** চীনের অপর এক আশ্রিত রাজ্য **উত্তর ব্রহ্ম** অধিকার করে। এইভাবে চীন সীমান্তের বাইরে যে সব দেশে চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হত, সেগুলি বিদেশী রাষ্ট্রের অধিকারে চলে যায়।

সীমান্ত রাজ্যগুলিতে ইউরোপীয় অধিকার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কোরিয়ার অধিকার নিয়ে **জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে**। কোরিয়া নামে চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও উনবিংশ শতাব্দীতে কোরিয়ায় চীনের শাসন শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং রাশিয়া সেখানে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিল। কোরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব স্থাপিত হলে জাপানের পক্ষে তা সমূহ বিপদের কারণ হত। রাশিয়া অতি সহজেই সেখান থেকে জলপথে জাপান আক্রমণ করতে পারত। জাপান তাই কোরিয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে ঐ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে ও তার ফলে চীনের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধে। এই চীন-জাপানের যুদ্ধে (Sino-Japanese War) (১৮৯৪-৯৫) চীন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। **শিমনোসেকির সন্ধির** (Treaty of Shimonoseki) দ্বারা চীন জাপানকে **ফর্মোসা** বা **তাইওয়ান দ্বীপ** এবং মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্ভুক্ত **লিয়াও টুং** (Liao Tung) **উপদ্বীপ** ছেড়ে দেয় ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে সম্মত হয়। ইউরোপীয় ও মার্কিন বণিকেরা চীনে যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত জাপানী বণিকদেরও সেগুলি দেওয়া হয় (এপ্রিল, ১৮৯৫)। এই যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন জাপানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, অপর দিকে তেমনি চীনের প্রচণ্ড মর্যাদাহানি হয়েছিল। এই পরাজয় চীনবাসীর মনে ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার করে এবং আভ্যন্তরীণ সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলে।

চীন-জাপানের যুদ্ধ, ১৮৯৪-৯৫

জাপান কিন্তু তার যুদ্ধজয়ের ফল পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে পারেনি। জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানী তাকে বাধা দিতে অগ্রসর হয় ও তাকে লিয়াও টুং উপদ্বীপের অধিকার চীনের অনুকূলে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। কিন্তু

এই সাহায্যের বিনিময়ে প্রতিটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রই চীনে তার কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। **চীনের এক একটি অঞ্চল এক একটি পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।** এইভাবে মাঞ্চুরিয়া **রাশিয়ার**, শান-টুং **জার্মানীর**, ইয়াং-সি নদীর (Yang-tse) উপত্যকা **ব্রিটেনের**, ফুকিয়েন (ফর্মোসার বিপরীত দিকে অবস্থিত) **জাপানের** ও কেয়ানটুং (ইন্দোচীন সীমান্তে) **ফ্রান্সের** একান্ত প্রভাবাধীন অঞ্চল (Special sphere of influence) বলে গণ্য লয়। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** তার নিজের জন্য এই ধরনের কোন অঞ্চল গড়ে তুলতে উৎসাহী ছিল না, তার আগ্রহ ছিল মূলতঃ চীনের সঙ্গে সকল রাষ্ট্রের অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব **হে** (Hay) এবং **নক্স** (Knox) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সুস্পষ্ট ভাষায় আমেরিকার এই **'খোলা দরজার নীতি'** (Open Door Policy) ঘোষণা করেন।

চীনে বিদেশী শক্তিদের প্রভাবাধীন অঞ্চল

বিদেশী প্রভাব বিস্তার রোধ করবার জন্য **চীনদেশে** ইতিমধ্যে **আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতি বৃদ্ধির চেষ্টা** দেখা দেয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সংস্কার প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি, কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিদের বিরুদ্ধে চীনাদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে **বক্সার বিদ্রোহের** (Boxer Rising) মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। চীনের মাঞ্চু রাজবংশের সম্রাজ্ঞী **সে সি** (Tse Hsi) স্বয়ং এই বিদ্রোহের ইন্ধন জোগান। বহু বিদেশী এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী চৈনিক এই বিদ্রোহে নিহত হলেও অল্পকালের মধ্যেই ইউরোপ থেকে আগত এক আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে, এবং চীনকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। মার্কিন সরকার এই ক্ষতিপূরণের অর্থ চীনে হাসপাতাল ও বিদ্যালয় নির্মাণের প্রকল্পে ব্যয় করে চীনাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়।

বক্সার বিদ্রোহ ১৯০০

বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর সম্রাজ্ঞী **সে সি** আভ্যন্তরীণ সংস্কারের দ্বারা মাঞ্চু রাজবংশকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর জরাগ্রস্ত চৈনিক রাজতন্ত্র বিপ্লবীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারল না। **১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের এই বিপ্লবের** সাফল্যের পর বিপ্লবী নায়ক **সান ইয়াৎ-সেনের** (Sun Yat-sen) নেতৃত্বে **চীনে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল।** কিন্তু চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এই বিপ্লবের ফলে দূর হয়নি। সান ইয়াৎ-সেন অল্প দিনের মধ্যেই প্রজাতন্ত্রের সভাপতির পদে ইস্তফা দিলে মাঞ্চু রাজবংশের প্রভাবশালী সেনাপতি **য়ুয়ান শি কাই** (Yuan Shi Kai)

চীনে বিপ্লব, ১৯১১

ক্ষমতা হস্তগত করেন, এবং তার ফলে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজ ব্যাহত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ** দেখা দিলে জাপান জার্মানীর কাছ থেকে চীনের শান টুং প্রদেশ কেড়ে নেয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন সরকারের কাছে **একুশ দফার এক দাবী-পত্র** (Twenty-One Demands) পেশ করে। এই দাবী মেনে নিলে চীন কার্যতঃ জাপানের আশ্রিত রাজ্যে (Vassal state) পরিণত হত। সৌভাগ্যবশতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে জাপান তার সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করতে পারেনি। কিন্তু **ভার্সাই সন্ধি** (১৯১৯) সম্পাদনের সময় শান টুং প্রদেশ জাপানের অধিকারে থেকে যায়।



সান ইয়াৎ-সেন

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত **ওয়াশিংটন সম্মেলনে** (Washington Conference) **জাপান চীনকে শান টুং প্রদেশ ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়।** ঐ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত **নয় শক্তির চুক্তিতে** চীনের স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলে চীনে আবার একটি সংস্কার আন্দোলন দেখা দেয় এবং সান ইয়াৎ-সেন ক্যাণ্টন শহরে বিপ্লবী **কুয়োমিনটাং** (Kuomintang) দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে, সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর (১৯২৫) পর, কুয়োমিনটাং দল চীনে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু দলের মধ্যে ক্রমশঃ **সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রবেশের** ফলে দলটি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করে **জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে** এবং 'লীগ অব নেশনস্'-এর (League of Nations) নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ঐ ভূখণ্ড অধিকার করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে **জাপান মূল চীনদেশকেই আক্রমণ করে বসে** এবং এই চীন-জাপানের যুদ্ধ পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিশে যায়।

কুয়োমিনটাং দলের প্রতিষ্ঠা

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ১৯৩১

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে জাপানের অভ্যুত্থান ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রাচীন **জাপানী সভ্যতা চীনের সভ্যতারই সগোত্র** ছিল, সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত **জাপানী রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক** (feudal)। বহুকাল ধরে জাপান **দুজন বংশানুক্রমিক শাসকের** দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। এঁদের একজন ছিলেন **মিকাডো** (Mikado) বা সম্রাট, অপর জন ছিলেন **শোগান** (Shogun) বা প্রধান মন্ত্রী। এঁরা উভয়েই ছিলেন সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ। অবশ্য, কার্যতঃ শোগানই রাজ্য চালাতেন, মিকাডো নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৫৪২) ইউরোপীয় বণিক ও ধর্মপ্রচারকেরা প্রথম জাপানে পদার্পণ করে, কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই জাপানে বিদেশী-বিরোধী মনোভাব এত প্রবল হয়ে ওঠে যে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সরকার তাদের দেশে বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। শুধু নাগাসাকি (Nagasaki) বন্দরে ওলন্দাজ বণিকদের প্রবেশাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে।

মধ্যযুগের জাপান

কিন্তু এই অস্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে জাপান বেশি দিন আত্মরক্ষা করতে পারেনি। চীনের মতো জাপানও বিদেশী শক্তিদের চাপে তার ঘরের দরজা খুলতে বাধ্য হয়, এবং জাপানের ক্ষেত্রে মার্কিন বণিকেরাই দরজা খোলার ব্যাপারে অগ্রণী হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি মাছ ধরতে গিয়ে মার্কিন নাবিকেরা সময়ে সময়ে জাপানের সমুদ্রোপকূলে এসে পড়লে জাপান সরকার তাদের কঠোর শাস্তি দিত। এর প্রতিকার বিধানের জন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে **পেরী** (Perry) নামে একজন মার্কিন নৌ-সেনাপতি (Commodore) কয়েকটি **যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে টোকিও উপসাগরে উপস্থিত হন** এবং জাপানের উপকূলবর্তী সাগরে মার্কিন বণিকদের নিরাপত্তা ও এক বা একাধিক জাপানী বন্দরে তাদের প্রবেশাধিকার দাবী করেন। পর বৎসর আরো সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পেরী আবার জাপানে উপস্থিত হলে **জাপান সরকার ভয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তি করে** (১৮৫৪)। এই চুক্তির দ্বারা জাপানের দুটি বন্দরে মার্কিন জাহাজ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে জাপানকে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করতে হয়। এইসব চুক্তির ফলে বিদেশী বণিকেরা জাপানে নির্দিষ্ট শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে, এবং তাদের

মার্কিন অনুপ্রবেশ—কমোডোর পেরী

বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে জাপানের চুক্তি

অপরাধের বিচার জাপানের কোন আদালতে না হয়ে তাদের নিজের দেশের আদালতে হবে বলে ঠিক হয়। জাপানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথও এই সময় উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত চীন ও জাপানের ভাগ্য মোটামুটি একই ধারায় চলেছিল। কিন্তু **১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এক রাষ্ট্র-বিপ্লবের** ফলে শুধু যে **মিকাডোর ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা** (Restoration) ও শোগানের ক্ষমতার বিলোপ হল তা নয়, **প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান** ঘটিয়ে জাপানে এক **আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হল**। এর পর দ্রুতগতিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণে **শিল্প, কৃষি ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি** ঘটিয়ে জাপান অল্প দিনের মধ্যে এক উন্নত ও সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত হল। জাপানী সৈন্যবাহিনীকেও ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে তোলা হল এবং **সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক** করা হল। জাপানের আইন-কানুন ও বিচারব্যবস্থা ইউরোপের অনুকরণে তৈরী করা ছাড়াও একটি লিখিত সংবিধান দেশে প্রবর্তন করা হল। এর পর **ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুসরণে জাপান শীঘ্রই একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হল**।

জাপানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

স্বভাবতই এই নতুন সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হল তার নিকটতম প্রতিবেশী চীনদেশ। আয়তনে ও জনসংখ্যায় জাপানের চেয়ে অনেক বড়ো হলেও রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে চীন ছিল অনেক দুর্বল। প্রথম প্রথম কোরিয়ার অধিকার নিয়েই দুই দেশের মধ্যে প্রায় সংঘর্ষ বাধত। এই ব্যাপারে প্রকাশ্য যুদ্ধ হল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। **চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫) জাপানের জয়লাভ ও শিমনোসেকির সন্ধির (১৮৫৯) সর্তগুলি** ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপান যে শুধু ফরমোসা ও মাঞ্চুরিয়ার অংশবিশেষ পেল তা নয়, চীনে পাশ্চাত্য শক্তিদের সঙ্গে সমান অধিকারে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগও তার আয়ত্বে এল। এছাড়া স্বীকৃত হল কোরিয়ার স্বাধীনতা, যার ফলে কার্যতঃ ঐ দেশে জাপানের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এল। জাপান ইতিপূর্বে বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের সাথে যে সব অপমানজনক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল, চীনের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সেগুলি সবই সে নাকচ করে দিল। ইউরোপীয় শক্তিদের জাপান এইভাবে বুঝিয়ে দিল যে এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় তাদের এখন জাপানকে সমগোত্রের রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে হবে, চীনের মতো জাপান পাশ্চাত্য

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রথম প্রকাশ : চীন-জাপান যুদ্ধ

শক্তিদের পদানত হবে না। বস্তুতঃ, চীন-জাপান যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে জাপানের আত্মপ্রকাশের প্রথম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি পর্ব। ইউরোপীয় শক্তিদের তথাকথিত 'পীতচর্ম-ভীতি'র (Yellow Peril) এটাই সূচনা।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রথম পর্বেই জাপানকে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছ থেকে বাধা পেতে হল। রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মিলিত হয়ে জাপানকে বাধ্য করল চীনকে মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও টুং উপদ্বীপ ফিরিয়ে দিতে। এটা যে তারা করেছিল চীনের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ নয়, নিজেদেরই স্বার্থে, তা অল্প দিনের মধ্যেই চীনের সঙ্গে তাদের আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠল। যাই হোক

ইঙ্গ-জাপ চুক্তি, ১৯০২

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে **ইংলণ্ডের সঙ্গে জাপানের চুক্তি** (Anglo-Japanese Alliance) আবার দূর প্রাচ্যে (Far East) জাপানের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলল। এই অঞ্চলে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারকে রোধ করবার জন্যই দুটি দেশের মধ্যে এই আত্মরক্ষামূলক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। **ইউরোপের একটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে এশিয়ার একটি রাষ্ট্র এই প্রথম সম-মর্যাদার ভিত্তিতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল।**

ব্রিটিশ বন্ধুত্বে বলীয়ান হয়ে জাপান এবার রাশিয়াকে চাপ দিল মাঞ্চুরিয়া থেকে তার সৈন্য অপসারণের জন্য। দীর্ঘকাল এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চললেও (১৯০৩-০৪) রাশিয়া শেষ পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়া থেকে তার সৈন্য সরাতে সম্মত হল না, বরং কোরিয়াতেও এখন রুশ সৈন্যদল প্রবেশ করল। বাধ্য হয়ে জাপান কোরিয়া আক্রমণ করলে **রুশ-জাপান যুদ্ধের** (Russo-Japanese War) (১৯০৫-০৪) **সূত্রপাত** হল। এই যুদ্ধেও জাপান প্রায় অবিশ্বাস্য ভাবে জয়ী হল; **এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কাছে ইউরোপের এক বৃহৎ শক্তির এই প্রথম পরাজয়।** এর মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগে জাপানীরা তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত, এ কথা মনে করলে তাদের এই সাফল্য সত্যই বিস্ময়কর বোধ হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ ১৯০৪-০৫

পোর্টসমাউথের সন্ধির (Treaty of Portsmouth) দ্বারা রাশিয়া জাপানকে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার (Port Arthur) বন্দর সমর্পণ করল, চীনকে মাঞ্চুরিয়া ফিরিয়ে দিল এবং কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব স্বীকার করে নিল। মাঞ্চুরিয়া নামে চীনের অধীন হলেও কার্যতঃ দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের প্রভাব প্রবল হল। এই যুদ্ধের ফলে দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেল ও ইউরোপের বলকান অঞ্চলে সে কিছুটা বাধ্য হয়েই তার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হল। তাছাড়া, রুশ জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের প্রকাশ ঘটল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ব্যর্থ বিপ্লবের

মধ্য দিয়ে। অন্য দিকে এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় জাপানের শুধু রাজ্যলাভ নয়, প্রচুর মর্যাদা বৃদ্ধিও ঘটল। দূর প্রাচ্যে জাপান এখন ইউরোপীয় শক্তিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নামল এবং প্রতিবেশী চীনের উপরেই তার প্রথম আঘাত হানল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র কোরিয়াও জাপানের অধিকারে চলে গেল।



জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার
(১৮৯৫—১৯৩৯)

১৯৩৯ সালে জাপানের প্রভাবাধীন অঞ্চল ~~~~~~

১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানী সাম্রাজ্যের বিস্তার ||||||

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) জাপান ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার দলে যোগ দেয়। চীনদেশে **জার্মান অধিকৃত শান টুং অঞ্চল দখল** করাই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং তারপরই সে চীন সরকারের কাছে **একুশ দফা দাবীপত্র** (Twenty-one Demands) পেশ করে। এই দাবীপত্র গৃহীত হলে চীন জাপানের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হত, কিন্তু মার্কিন সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য জাপান তার উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করতে পারেনি। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়াশিংটন সম্মেলনে** জাপান চীনকে শান টুং অঞ্চল ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের **ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী চুক্তির এখানেই অবসান হয়** এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ইংলণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান কত যুদ্ধজাহাজ রাখতে পারবে তার অনুপাতও (৫ : ৫ : ৩) এই সম্মেলনে ঠিক করে দেওয়া হয়। এর ফলে জাপান অল্পদিনের মধ্যে একটি শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলে, এবং প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় নতুন ঘাঁটি নির্মাণে উদ্যোগী হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান **মাঞ্চুরিয়া গ্রাস** করে এবং **১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ** করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ** দেখা দিলে চীন-জাপানের যুদ্ধ তার মধ্যে মিশে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান, জার্মানী ও ইটালীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং **ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা** করে (ডিসেম্বর, ১৯৪১)। এই যুদ্ধের প্রথম দিকে জাপান যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেও শেষ পর্যন্ত সে **ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত** হয় (১৯৪৫)। জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার জন্যই **আমেরিকা প্রথম তার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে**। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয় ; তবে বর্তমানে তার এই অবস্থা অনেকটা দূর হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তীকালে জাপানের ভূমিকা

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ভূমিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার পর বহুকাল পর্যন্ত মার্কিন সরকার **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার নীতি** (Policy of isolation) অনুসরণ করে চলেছিল। আভ্যন্তরীণ গঠনকার্যে পূর্ণ মনোযোগ দেবার জন্যই এই নীতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই নীতির একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় ১৮১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে, যখন নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অল্পকালের জন্য **ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে** নামতে হয়েছিল। আমেরিকার এই আত্মরক্ষামূলক নীতিই অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে

মার্কিন বিচ্ছিন্নতাবাদ

মনরো নীতি ঘোষণার মাধ্যমে। মেটারনিকের প্ররোচনায় ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ যখন দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত স্পেনের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠাতে উদ্যোগী হয়, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি **জেমস মনরো** (James Monroe) সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কোন রকম প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা মার্কিন সরকার সহ্য করবে না। অবশ্য এই নীতি ঘোষণার পশ্চাতে স্পেনের উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদই বিশেষভাবে কাজ করেছিল। স্পেন তার উপনিবেশগুলি দখল করে নিতে পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেত। মনরো নীতির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ এই দিক থেকে জড়িত ছিল।

মনরো নীতি (১৮২৩)

উনবিংশ শতাব্দীর **চল্লিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ঈষৎ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে**। মিসিসিপি নদীর (Mississippi) উপত্যকা ছাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে টেক্সাসের (Texas) অধিকার নিয়ে **মেক্সিকোর** (Mexico) **সঙ্গে তার যুদ্ধ** বাধে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে যুক্তরাষ্ট্র নিউ মেক্সিকো (New Mexico) ও উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া (North California) লাভ করে এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত তার সীমারেখা প্রসারিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে **অরিগন চুক্তির** (Oregon Treaty) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ-অধিকৃত ক্যানাডার (Canada) মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারিত হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি চুক্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত **পানামা খালের উপর ব্রিটেন** ও **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ নিয়ন্ত্রণ** প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (Civil War) সুযোগে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকো অধিকার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সম্প্রসারণ

গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) পর মার্কিন সরকার আবার তার বিচ্ছিন্নতার নীতিতে ফিরে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই সময় **শিল্প-বিপ্লবের দ্রুত অগ্রগতির** ফলে উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসে, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশরূপে আমেরিকা দেখা দেয়। ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রবণতা থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। তবে আমেরিকা মহাদেশেই (পশ্চিমাঞ্চলে) সাম্রাজ্য বিস্তারের যথেষ্ট অবকাশ থাকায় আমেরিকার বাইরে মার্কিন

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আমেরিকার অভ্যুদয়

যুক্তরাষ্ট্র রাজ্য জয়ের চেষ্টা বিশেষ করেনি। এশিয়া বা আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও তার কাম্য ছিল না। তার নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ এত অজস্র ছিল যে, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় নামতে মার্কিন সরকার কখনো পশ্চাৎপদ হয়নি। এ ব্যাপারে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। অনুন্নত দেশগুলির উপর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের চেয়েও অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারে মার্কিন সরকার বেশি মনোযোগ দেয়, এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই তার এই 'ডলার সাম্রাজ্যবাদে'র (Dollar Imperialism) জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সামরিক বা নৌ-ঘাঁটি স্থাপনও মার্কিন বৈদেশিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষাই এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য

যাই হোক, ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সরকার আফ্রিকার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য আহূত **বার্লিন সম্মেলনে** যোগ দেয়। আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের জন্য কোন উপনিবেশ চায়নি। তবে পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়ায় দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রোদের জন্য যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল মাকিন সরকার তার রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সরকার রাশিয়ার কাছ থেকে **আলাস্কা** (Alaska) লাভ করে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কিউবাতে (Cuba) স্পেনের কুশাসনের প্রশ্নে **স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ** বাধে। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্পেন আমেরিকাকে **কিউবা, পোর্টোরিকো** (Portorico) ও **ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ** (Philippine Islands) সমর্পণ করে। কিউবা আমেরিকার আশ্রিত রাজ্য, পোর্টোরিকো মার্কিন উপনিবেশ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সরকারের একটি বিরাট ঘাঁটিতে পরিণত হয়, যেখান থেকে চীন ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলির উপর সহজেই নজর রাখা চলত। আমেরিকা মহাদেশের বাইরে মার্কিন সরকার এই প্রথম রাজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে **গুয়াম** (Guam) ও **হাওয়াই** (Hawaii) দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে এবং দু বৎসর পরে **সামোয়া** (Samoa) দ্বীপপুঞ্জের উপরও মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের **সান ডোমিনগো** (San Domingo) দ্বীপেরও একই দশা হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের **হে-পন্সফোর্ট সন্ধির** (Hay-Ponceforte Treaty) দ্বারা পানামা খালের ওপর মার্কিন সরকারের একক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হল।

পশ্চিমী জগতের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার

চীন দেশের ব্যাপারে মার্কিন সরকার প্রথম দিকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিল। চীন দেশে সমস্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রের বণিকেরা যাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে সমান সুযোগ পায় মার্কিন সরকার সে বিষয়ে আগ্রহী ছিল। পররাষ্ট্রসচিব হে (Hay) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ও নক্স (Knox) তার দশ বৎসর পরে **যুক্তরাষ্ট্রের এই 'খোলা দরজার' (Open Door) নীতি** সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। বক্সার বিদ্রোহের পর মার্কিন সরকার চীনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে অর্থ পেয়েছিল ঐ দেশেই **বিদ্যালয় ও হাসপাতাল স্থাপন** করে সে অর্থের সদ্ব্যবহার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন সরকার **জাপানের 'একুশ দফা দাবী'র বিরোধিতা** করে তার চীন গ্রাসের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয় (১৯১৫)। যুদ্ধের পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের **ওয়াশিংটন সম্মেলনে** জাপান যে চীনকে শান টুং অঞ্চল ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়, তাও অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের চীন নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা বহু দিন নিজের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছিল, যদিও তার সহানুভূতি ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে। **১৯১৭** খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিন জাহাজের উপর বারবার জার্মান ডুবোজাহাজের আক্রমণের প্রতিবাদে **যুক্তরাষ্ট্র সরকার জার্মানী ও তার মিত্র দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে**। আবার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি **উইলসনের (Wilson) চৌদ্দ দফা সর্তের** (Fourteen Points) ভিত্তিতেই জার্মান সরকার ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আত্মসমর্পণ করে এবং শান্তি স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে। এই যুদ্ধের শেষে যে জাতিসঙ্ঘ বা **'লীগ অব নেশনস'** (League of Nations) স্থাপিত হয় তার প্রস্তাবও উইলসন প্রথম করেছিলেন এই চৌদ্দ দফা সর্তে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উইলসনের দলের পরাজয় হয় এবং তার ফলে জাতিসঙ্ঘ বা 'লীগ অব নেশনস' যখন গঠিত হল যুক্তরাষ্ট্র সরকার তখন তাতে যোগ দেয়নি। বিচ্ছিন্নতা-নীতির ঐতিহ্য যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধোত্তর কালেও যে কতটা প্রবল ছিল তা এ থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির আবার পরিবর্তন ঘটে, এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে মার্কিন সরকার বিশ্ব রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা

জাতিসঙ্ঘ ও আমেরিকা

একাদশ পরিচ্ছেদ

তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ
(Dismemberment of the Ottoman Empire)
(১৮৭৮-১৯১৩)

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের দ্বারা পূর্ব ইউরোপের সমস্যার স্থায়ী সমাধান যে সম্ভব ছিল না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তুরস্কের সম্রাট প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬) পর আপন সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও সংহতি বৃদ্ধির সুযোগ পেলেও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। রাশিয়াও এই সন্ধির সর্তগুলি বেশি দিন পালন করে চলতে রাজী ছিল না। সুযোগ পেলেই দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলে তুরস্কের সাম্রাজ্য গ্রাস করতে রাশিয়া উদ্‌গ্রীব ছিল এবং ঐ সুযোগও কয়েক বৎসর পরে এসে গেল। বলকান অঞ্চলে তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজারাও ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসনের ও কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার লাভের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠছিল। প্যারিসের সন্ধি তাদের আদৌ সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

প্যারিস সন্ধির ব্যর্থতা

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারিসের সন্ধির মাত্র পাঁচ বৎসর পরে, **ওয়ালেশিয়া ও মলডেভিয়া** নামে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দুটি স্বয়ংশাসিত রাজ্যখণ্ড (Principality) প্যারিস সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল, এবং এইভাবে **নতুন রুমানিয়া (Roumania) রাজ্যের সৃষ্টি** করল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আর একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য **সার্বিয়া** (Serbia) তুরস্কের সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করে কার্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। এর তিন বৎসর পরে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হলে **রুশ সরকার** প্রকাশ্যেই ঘোষণা করল যে তার পক্ষে আর প্যারিসের সন্ধির সর্ত মেনে চলতে রাজী হওয়া সম্ভব নয় (১৮৭০)। এর পরই রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) তীরে নৌ-ঘাঁটি নির্মাণে উদ্যোগী হয়।

রুমানিয়ার জন্মলাভ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুটি প্রদেশ **বসনিয়া** (Bosnia) **ও হার্জগোভিনায়** (Herzegovina) **বিদ্রোহ** দেখা দেয়। তুরস্ক সরকারের রাজস্ব-আদায়কারীদের অত্যাচারই এই বিদ্রোহের মুখ্য কারণ ছিল। বিদ্রোহ দেখা দিলে **সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রোর** (Montenegro) অধিবাসীরাও তাতে যোগ দেয়।

তুরস্কের সম্রাট বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে **অস্ট্রিয়ার সরকার বলকান অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়,** ও অষ্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী **কাউণ্ট অ্যাণ্ড্রাসি** (**Count Andrassy**) রুশ ও জার্মান সরকারের সম্মতিক্রমে তুরস্কের স্থলতানের কাছে একটি প্রস্তাব (**Andrassy Note**) পেশ করেন। এই প্রস্তাবে তুরস্ক সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য নানারকম সংস্কারের কথা বলা হয়। সম্রাট এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও তিনি যে প্রতিশ্রুতি রাখবেন তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই বিদ্রোহী প্রজারা অ্যাণ্ড্রাসি প্রস্তাবের কোন গুরুত্ব দিল না। এর পর বার্লিন শহর থেকে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিত ভাবে আর একটি প্রস্তাব (Berlin Memorandum) বিদ্রোহীদের শান্ত করবার জন্য রচনা করলেন। আগের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি তুরস্কের স্থলতান যাতে কাজে পরিণত করেন সেজন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা এতে ছিল। ফ্রান্স এবং ইটালীর সরকারও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের সম্রাটের উপর চাপ দেওয়ার এই ব্যবস্থা কিছুতেই মানতে চাইল না। **ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে তুরস্কের সম্রাট বার্লিন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।**

বসনিয়া ও হার্জগোভিনায় বিদ্রোহ

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক-শাসিত **বুলগেরিয়াতেও** (Bulgaria) **বিদ্রোহ** দেখা দিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারের নির্দেশে **তুর্কী সৈন্যদল নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করল।** কয়েক দিনের মধ্যে তুর্কী সেনাদল বুলগেরিয়ার ষাটটি গ্রামে অগ্নি-সংযোগ করল ও বারো হাজার লোক তাদের হাতে প্রাণ হারাল। তুর্কী সেনাদের এই অকথ্য অত্যাচারের (Bulgarian Atrocities) কাহিনী সারা ইউরোপে এক উত্তেজনার সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের পক্ষ ত্যাগ না করলেও উদারনৈতিক দলের নেতা **গ্ল্যাডস্টোন** প্রচারকার্যের দ্বারা ব্রিটিশ জনমতকে বহুলাংশে তুরস্কের প্রতি বিরূপ করে তুললেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই **সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা** করল এবং পরের বৎসর রাশিয়াও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে নিজের প্রভাব বাড়াবার জন্য নির্যাতিত বলকান জাতিদের পক্ষ অবলম্বন করে স্থলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল (১৮৭৮)। এই **রুশ-তুর্কী যুদ্ধে** (**Russo-Turkish War**) তুর্কী সেনারা সহজেই পরাস্ত হল এবং স্থলতান **সান-স্টিফানোর সন্ধি** (Treaty of San-Stephano) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন (১৮৭৮)। এই সন্ধির সর্তে বলা হল ঃ (১) সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও রুমানিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করবে ; (২) ডানিয়ুব নদীর তীর থেকে

রুশ-তুর্কীর যুদ্ধ ও সান-ষ্টিফানোর সন্ধি

ইজিয়ান সাগর (Aegean Sea) পর্যন্ত অঞ্চলে বুলগেরিয়া নামে একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য (নামে মাত্র তুরস্কের অধীনে) স্থাপিত হবে; (৩) বসনিয়া ও হার্জগোভিনার প্রজাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য তুরস্ক সরকার কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং (৪) রাশিয়া রুমানিয়ার কাছ থেকে বেসারাবিয়া অঞ্চলটি লাভ করবে ও তার বিনিময়ে রুমানিয়াকে ডোব্রুৎজা (Dobrutza) অঞ্চল সমর্পণ করবে।

সান-স্টিফানোর **সন্ধির সর্তগুলি পালিত হলে ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কার্যতঃ বিলুপ্ত হত** এবং বুলগেরিয়া রাজ্যের মাধ্যমে বলকান উপদ্বীপে রাশিয়ার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু ইংলণ্ডের বিরোধিতার জন্য সান-স্টিফানোর সন্ধি কার্যকরী করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রক্ষণশীল দলনেতা **ডিসরেলির** (Disraeli) ধারণা হল যে, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তুরস্কের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে রুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ও মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটিশ স্বার্থ বিপন্ন হবে। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে সমগ্র পূর্ব ইউরোপীয় সমস্যাটি ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলির একটি সম্মেলনে আলোচনা করা হোক। সান-স্টিফানোর সন্ধিতে অষ্ট্রিয়ার সরকারেরও কোন লাভ হয়নি। তাই তারাও এই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করল। প্রস্তাবটি রাশিয়ার স্বার্থ ও মর্যাদা বিরোধী হলেও ব্রিটিশ সরকারের চাপে রাশিয়া তা মানতে বাধ্য হল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের **বার্লিন সম্মেলনে** (Congress of Berlin) সান-স্টিফানোর সন্ধির আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করে নতুন **বার্লিন সন্ধি** (Treaty of Berlin) রচিত হল।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা

বার্লিন সম্মেলনে একদিকে ছিল ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া, অপরদিকে রাশিয়া। সম্মেলনের সভাপতি বিসমার্কও প্রথমোক্ত দলের প্রতিই বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই **বার্লিন সন্ধিতে** রাশিয়ার স্বার্থ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এই সন্ধির দ্বারা (১) বসনিয়া ও হার্জগোভিনাকে নামে মাত্র তুরস্কের অধীনে রেখে কার্যতঃ অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীন করা হল; (২) নতুন বুলগেরিয়া রাজ্যের আয়তন আগের তুলনায় অনেক ছোট করা হল, ম্যাসিডোনিয়া (Macedonia) ও পূর্ব রুমেলিয়াকে (Eastern Roumelia) তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে; (৩) সার্বিয়া, রুমানিয়া ও মণ্টেনিগ্রো পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল, যদিও রুমানিয়াকে বেসারাবিয়া অঞ্চল রাশিয়ার অনুকূলে ত্যাগ করতে হল; এবং (৪) ব্রিটিশ সরকার তুরস্ক সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা হিসাবে অবতীর্ণ হলেও তার সাহায্যের বিনিময়ে সাইপ্রাস দ্বীপটি (Cyprus) অধিকার করল। বিসমার্ক বার্লিন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেও

বার্লিন সন্ধির সর্ত (১৮৭৮)

জার্মানী বার্লিন সন্ধিতে কোন অঞ্চল পায়নি বা তার জন্য দাবী জানায়নি। এইজন্য কেউ কেউ এই সম্মেলনে বিসমার্কের ভুমিকাকে পরিহাস করে 'সৎ দালালের' (honest broker) ভূমিকা বলেছেন।



তুরস্ক সাম্রাজ্য ও বলকান রাষ্ট্রসমূহ
১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ
তুরস্ক সাম্রাজ্য ১৮৭৮ বার্লিন-কংগ্রেসে নির্ধারিতসীমারেখা — সান স্টিফানোর চুক্তি অনুসারে বৃহত্তর বুলগেরিয়া রাজ্য

বার্লিন সন্ধির সর্তগুলির বহু বিরূপ সমালোচনা করা হয়। **ডিসরেলি অবশ্য বার্লিন থেকে ফিরে সদর্পে ঘোষণা করেন যে, তিনি বার্লিন থেকে 'শান্তি ও সম্মান' (Peace with Honour) নিয়ে ফিরেছেন।** তাঁর উক্তির তাৎপর্য ছিল বোধহয় এই যে পূর্বদেশে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে এর জন্য যুদ্ধ করতে হয়নি। কিন্তু **বার্লিন সন্ধি** যে **পূর্ব ইউরোপীয় সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি** পরবর্তী কালের ঘটনাগুলি তা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে। **বলকান জা তিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বার্লিন সন্ধি আদৌ সুবিচার করেনি।** বুলগেরিয়া থেকে ম্যাসিডোনিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে তুরস্কের উৎপীড়নমূলক শাসনের অধীনে আনা হয়। রুমানিয়াকে বেসারাবিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য করাও ঘোরতর অন্যায় হয়েছিল। পূর্ব রুমেলিয়াকে একজন খ্রীষ্টান শাসনকর্তার প্রত্যক্ষ শাসনে আনা হলেও সেখানকার অধিবাসীরা তাতে আদৌ সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ তারা জাতিতে ছিল বুলগার (Bulgar) এবং বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়াই ছিল তাদের মনোগত বাসনা। বসনিয়া ও হার্জগোভিনাকে অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীনে আনা একই কারণে সার্বিয়ার অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল; জাতিগত ও ভাষাগত ভাবে এই দুই অঞ্চলের লোকেরা সার্বদেরই সমগোত্র (অর্থাৎ স্লাভ) ছিল। **অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে এইভাবে যে বিবাদের সূত্রপাত হল তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যেও বিরোধের কোন স্থায়ী নিষ্পত্তি বার্লিন সন্ধিতে হয়নি।** শুধু ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে তাদের সংঘর্ষের ক্ষেত্রটি দূর প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় স্থানান্তরিত হল। তবে বার্লিন চুক্তির সমর্থনে একথাও বলা চলে যে, পূর্ব ইউরোপের সমস্যা এত জটিল ছিল, এবং এখানে এত বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর বাস ছিল যে কোন একটি সন্ধিতে সকলের জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাছাড়া, ১৮৭৮ সালে **তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ব্রিটেন রক্ষা করার চেষ্টা না করলে মধ্য প্রাচ্যে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিও যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তাও বলা বাহুল্য।**

বার্লিন সন্ধির সমালোচনা

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর **পূর্ব ইউরোপীয় সমস্যা ক্রমশঃ আরো জটিল হয়ে ওঠে।** ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করে **বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমেলিয়া রাজ্য দুটি মিলিত হয়** এবং তুরস্কের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে। **রুশ সরকারও নতুন বুলগেরিয়া রাজ্যে প্রভাব স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।** ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে **আর্মেনিয়ার** (Armenia) **প্রজারা বিদ্রোহী**

হলে তুরস্ক সরকার কঠোর হস্তে তা দমন করেন। ছ' হাজার আর্মেনীয় প্রজাকে একদিনে কনস্ট্যান্টিনোপল (Constantinople) শহরে হত্যা করা হয়। এই **আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ডও** (Armenian Massacres) **ইউরোপে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে,** কিন্তু বৃহৎ শক্তিদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকায় তারা একজোটে তুরস্কের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। শুধু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব সলসবেরী (Salisbury) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখার চেষ্টা করে ইংলণ্ড ভুল ঘোড়ায় বাজী ধরেছে ("put her money on the wrong horse")। ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দে **ক্রীট দ্বীপের** (Crete) **প্রজারাও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে** এবং গ্রীস তাদের পক্ষ নিয়ে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই **গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধে** (১৮৯৭) গ্রীস পরাস্ত হলেও ক্রীটের অধিবাসীরা তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভিতরে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। গ্রীস ও ক্রীটের রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয় ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্দে।

আর্মেনিয়ায় হত্যাকাণ্ড

গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধ

বার্লিন সন্ধিতে অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হার্জগোভিনার শাসনের অধিকার পেলেও ঐ দুটি অঞ্চলে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু **১৯০৮** গ্রীষ্টাব্দে বার্লিন সন্ধিকে অগ্রাহ্য করে অস্ট্রিয়া **ঐ দুটি** অঞ্চলকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে। জার্মান সরকার এ ব্যাপারে অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করেছিল বলেই অস্ট্রিয়া এ কাজ করতে সাহসী হয়। কিন্তু সার্বিয়া কোন মতেই অস্ট্রিয়ার এ কাজ বরদাস্ত করতে পারেনি, কারণ ঐ অঞ্চল দুটিতে সার্বজাতির লোকেরাই বসবাস করত।

অস্ট্রিয়ার বসনিয়া গ্রাস

১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দে **তুরস্কের ভিতরে এক নতুন সংস্কারকামী আন্দোলন** দেখা দেয়। এর নাম **'নব্য তুরস্ক আন্দোলন'** (Young Turk Movement)। সেনাপতি **এনভার বে** (Enver Bey)-পরিচালিত **'মিলন ও প্রগতি সমিতি'** (Committee of Union and Progress) এই নব্য তুরস্ক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। তুরস্কের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা, ইউরোপীয় শক্তিদের প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য জাতির উপর তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই আন্দোলনের পরিণামে ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দে অত্যাচারী **সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সিংহাসনচ্যুত হন,** এবং তাঁর ছোট ভাইকে রাজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯০৯ থেকে ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যতঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যের শাসনভার নব্য তুরস্ক আন্দোলনের নেতাদের ওপরই দেওয়া ছিল। নব্য

নব্য তুরস্ক আন্দোলন (১৯০৮)

তুরস্ক আন্দোলনের এই সাফল্যের ফলে কিন্তু **সাম্রাজ্যের মধ্যে নানারকম সমস্যা** দেখা দেয়। বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যে তুর্কীরাই ছিল সংখ্যালঘু জাতি। **এশিয়ায় আরবেরা ও ইউরোপে খ্রীষ্টান প্রজারা নব্য তুরস্ক দলের তুর্কীকরণ আন্দোলনের** (Turkification) **বিরোধিতা করে।** এই আন্দোলনের ফলে তুর্কী ভাষা সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হয় এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে ও শিক্ষাক্ষেত্রে তুর্কী জাতির লোকেদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। সংখ্যাগুরু আরব ও খ্রীষ্টানেরা স্বভাবতঃই এই নীতি মানতে চায়নি। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকেদের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষির' ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ঐক্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এবং তুরস্কের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে **ইটালী উত্তর আফ্রিকায় তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ট্রিপলি** (Tripoli) **অধিকার করে (১৯১১)।**

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসিডোনিয়ায় তুর্কীদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে চারটি বলকান রাষ্ট্র, **সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস ও মন্টেনিগ্রো একজোটে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।** এই **প্রথম বলকান যুদ্ধে** (১৯১২-১৩) **তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাস্ত** হয়। বুলগেরিয়ার সৈন্যবাহিনী অ্যাড্রিয়ানোপল অবরোধ করে ও কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। গ্রীস ও সার্বিয়ার সেনারা ম্যাসিডোনিয়া অধিকার করে। পশ্চিমী শক্তিদের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয় ও শান্তির জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আবার যুদ্ধ লেগে যায় এবং এবারেও তুর্কীরা পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের **লণ্ডন চুক্তির** (Treaty of London) দ্বারা তুরস্ক সরকার বিজয়ী বলকান রাষ্ট্রগুলির কাছে তার ইউরোপীয় প্রদেশগুলি প্রায় সবই সমর্পণ করে। শুধু কনস্ট্যান্টি-নোপল ও ডার্ডানেলস্ (Dardanelles) প্রণালীর তীরবর্তী একখণ্ড অঞ্চল তুরস্কের অধিকারে রয়ে যায়।

প্রথম বলকান যুদ্ধ (১৯১২-১৩)

বিজয়ী বলকান শক্তিগুলির মধ্যে কিন্তু এবার রাজ্য বণ্টন নিয়ে ঘোরতর বিবাদ বাধে। স্কুটারি (Scutari) অঞ্চল মণ্টেনিগ্রোর অধিকারে থাকা অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মনঃপূত হয়নি, তাই **আলবানিয়া** (Albania) **নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি** প্রয়োজন হল। ম্যাসিডোনিয়ার কোন অঞ্চল কার অধিকারে যাবে তাই নিয়ে সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিল এবং বুলগেরিয়া হঠাৎ সার্বিয়াকে আক্রমণ করে বসল। এর ফলে একদিকে সার্বিয়া, গ্রীস ও রুমানিয়া এবং অপরদিকে

বুলগেরিয়ার মধ্যে **দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের (১৯১৩) সূচনা** হল। পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তুরস্কও বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। তিন মাসের মধ্যে বুলগেরিয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হল। **বুখারেস্টের সন্ধির** (Treaty of Bucharest) দ্বারা বুলগেরিয়া তার সব কটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকেই কিছু কিছু এলাকা ছেড়ে দিল। সার্বিয়া পেল ম্যাসিডোনিয়ার অধিকাংশ; গ্রীস পেল সালোনিকা বন্দরসহ দক্ষিণ ম্যাসিডোনিয়া, ক্রীট দ্বীপ ও পশ্চিম থ্রেস (Thrace); আর তুরস্ক পেল অ্যাড্রিয়ানোপল। বুলগেরিয়াকে পূর্ব ম্যাসিডোনিয়া ও থ্রেসের অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ (১৯১৩)

১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের দুই বলকান যুদ্ধের ফলে **ইউরোপে তুরস্কের সাম্রাজ্য কার্যতঃ লোপ পেল**। এর দ্বারা **সবচেয়ে বেশি লাভবান হল সার্বিয়া ও গ্রীস** এবং **সবচেয়ে কম অঞ্চল পেল বুলগেরিয়া**। কিন্তু **বলকান জাতিগুলির পারস্পরিক বিবাদের কোন নিষ্পত্তি এই দুই যুদ্ধে হল না**। প্রত্যেকটি বলকান রাষ্ট্রই আপন অধিকার বাড়াবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল। বিশেষতঃ **বুলগেরিয়া সার্বিয়ার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে বিভেদ আরো প্রবলভাবে দেখা দিল,** কারণ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে যে সব স্লাভ জাতির লোকের বসবাস ছিল তারা সার্বিয়াকেই তাদের ভবিষ্যৎ ত্রাণকর্তা বলে মনে করত। সার্বিয়ার পরাক্রান্ত হয়ে ওঠা তাই অষ্ট্রিয়ার আদৌ মনঃপূত ছিল না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকে উপলক্ষ করে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিরোধ লাগল তা থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি হয়। **তুরস্কও দুই বলকান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জার্মানীর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল**। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা তুরস্ককে জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্র হিসাবেই অবতীর্ণ হতে দেখি। বুলগেরিয়াও সার্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য এই যুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে হাত মেলায়। দুই বলকান যুদ্ধে তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

দুই বলকান যুদ্ধের পরিণাম

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরিণাম
(The First World War and Its Aftermath)

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (First World War) ভয়াবহতা ইউরোপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এত ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী, ব্যয়বহুল ও লোকক্ষয়কারী সংগ্রাম এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি। পৃথিবীর সব কটি প্রধান শক্তি এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল, এবং পাঁচটি বিভিন্ন মহাদেশে এই যুদ্ধের রণাঙ্গন প্রসারিত হয়েছিল। শুধু ইউরোপ নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই যুদ্ধের প্রভাব অল্প-বিস্তর দেখা যায়, তবে ইউরোপের ইতিহাসে এই যুদ্ধ সত্যই এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate Causes of World War I): ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বসনিয়া প্রদেশের রাজধানী **সারাজেভো** (Sarajevo) **শহরে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাণ্ড** (Archduke Francis Ferdinand) **ও তাঁর পত্নী এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।** ধৃত আততায়ী অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রজা হলেও জাতিতে ছিল স্লাভ (Slav), এবং **অস্ট্রিয়া সরকার সন্দেহ করে যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সার্বিয়া সরকার জড়িত,** কারণ, সার্বিয়ার অধিবাসীরাও ছিল স্লাভ জাতির লোক এবং স্লাভ-অধ্যুষিত বসনিয়ার সঙ্গে মিলন-প্রয়াসী।

অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড

এই সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অমূলক নয়, তা পরবর্তী কালে জানা যায়, কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এটা প্রমাণ করার মতো তথ্য অষ্ট্রিয়া সরকারের হাতে ছিল না। যাই হোক, **সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই অস্ট্রিয়া সরকার সার্বিয়াকে এক অত্যন্ত অপমানজনক চরমপত্র** (Ultimatum) **পাঠায়।** সার্বিয়ার পক্ষে এই চরমপত্রের সমস্ত সর্তগুলি মেনে নেওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না। তবু **সার্বিয়া সরকার অস্ট্রিয়ার অধিকাংশ দাবী মেনে নেয় এবং বাকীগুলি হেগের** (Hague) **আন্তর্জাতিক আদালতে সালিশীর জন্য পাঠাতে রাজী হয়।** কিন্তু অস্ট্রিয়া এই প্রস্তাব

সার্বিয়াকে অষ্ট্রিয়ার চরমপত্র দান

মানতে সম্মত না হয়ে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও বেলগ্রেড (Belgrade) আক্রমণ করে (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)।

সার্বিয়াকে রাশিয়ার সমর্থন

অষ্ট্রিয়ার সার্বিয়া-বিরোধী নীতিতে জার্মানীর **পূর্ণ সমর্থন** ছিল, **কিন্তু জার্মান সরকার ভেবেছিল যে এই যুদ্ধ** অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং এর দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু **রুশ সরকার** বলকান অঞ্চলে নিজ প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং **প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য সার্বিয়াকে দৃঢ় সমর্থন জানায় ও তার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতির আদেশ দেয়। জার্মানী রুশ** সরকারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও **রাশিয়াকে যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করতে বলে। রুশ সরকার তার এই দাবীতে কর্ণপাত না করলে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স রাশিয়ার বহু দিনের মিত্র হিসাবে এই যুদ্ধে রুশেদের পক্ষে যোগ দেয়;** কিন্তু ইটালী জার্মানীর মিত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে নিরপেক্ষ থাকে এবং এক বৎসর পরে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিপরীত পক্ষেই যোগ দেয় (১৯১৫)।

ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা

ইংলণ্ড প্রথমে এই যুদ্ধে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব স্যার এডওয়ার্ড গ্রে (Sir Edward Grey) বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু **ফ্রান্স ও রাশিয়াকে সামরিক সাহায্য দিতে চুক্তিবদ্ধ না হলেও ইংলণ্ডের সহানুভূতি সম্পূর্ণ ভাবে এই দুই বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি ছিল। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, যখন জার্মানী** ইংলণ্ডের অনুরোধ ও দীর্ঘকালের লণ্ডন চুক্তি (১৮৩৯) অগ্রাহ্য করে **বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করল।** বেলজিয়াম জার্মানীর দ্বারা অধিকৃত হলে ইংলণ্ডের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হত। তাই, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট জার্মান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেলজিয়ামের সীমান্ত লঙ্ঘন করা মাত্র ব্রিটিশ সরকার জার্মানীকে এক চরমপত্র পাঠাল, এবং জার্মানী তাতে কর্ণপাত না করলে **ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল** (৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৪)। ইউরোপের সব কটি বৃহৎ শক্তিই এই ভাবে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ল।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণা

বিশ্বের অন্যান্য প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে **জাপান** ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট এবং **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে **জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে**

অবতীর্ণ হয়। এতগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে **জার্মানী শুধু, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া, এই দুটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করে।** ইউরোপের মাত্র ছয়টি দেশ, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, স্পেন ও সুইজারল্যাণ্ড, এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে।

অন্যান্য রাষ্ট্রের মনোভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণ (Fundamental or Underlying Causes of World War I): **সারাজেভো হত্যাকাণ্ড** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও এটাই ঐ **যুদ্ধের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মূলগত কারণ ছিল না।** ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কেরা এই ধরনের যুদ্ধের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সারাজেভো হত্যাকাণ্ড না ঘটলেও অন্য কোন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন আগে বা পরে যুদ্ধ বাধা খুবই সম্ভব ছিল। কেন এই যুদ্ধ সম্ভব ছিল তার উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের যুদ্ধের মূলগত কারণগুলি আলোচনা করতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান মূলগত কারণ হল **ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে জোট বাঁধার প্রবণতা।** আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা বিসমার্ক প্রায় বিশ বৎসর ফ্রান্সকে ইউরোপের অন্যান্য প্রধান শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে প্রথমে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে (১৮৭২) এবং পরে অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সঙ্গে (১৮৮২) জোট বাঁধতে হয়। কিন্তু বলকান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান বিবাদের জন্য জার্মানীর পক্ষে এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গেই সমান মিত্রতা বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। যতদিন বিসমার্ক ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন রাশিয়াকে জার্মানীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে দেননি, কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির পর জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশই বেড়ে যায় ও রাশিয়া ফ্রান্সের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে কাগজে-কলমে একটি মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। **এই ভাবে ইউরোপের পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্র দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে যায়;** একদিকে থাকে **জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর ত্রিশক্তি মৈত্রী** (Triple Alliance), অন্যদিকে **রাশিয়া ও ফ্রান্সের দ্বিশক্তি মৈত্রী** (Dual Alliance)।

বৃহৎ শক্তিগুলির জোট বাঁধার চেষ্টা

ইংলণ্ড প্রথমে দুটি দলের কোনটিতে যোগ দেবে তা স্থির করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইংলণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতির জটিল আবর্ত এড়িয়ে চলছিল। তার এই **চমকপ্রদ বিচ্ছিন্নতার** (Splendid Isolation) মূল কারণ

ছিল এই যে, ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্র ইউরোপের বাইরেই প্রসারিত ছিল। এই ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও রাশিয়াই তার প্রধান শত্রু ছিল; ফ্রান্সের সঙ্গে আফ্রিকায় এবং রাশিয়ার সঙ্গে এশিয়ায় ইংলণ্ডের বহু দিন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে নবগঠিত জার্মান সাম্রাজ্যও বাণিজ্য, উপনিবেশ ও নৌ-শক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, এবং জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাম্রাজ্যবাদী আস্ফালন ইংলণ্ডের ভীতির কারণ হয়। অনেক দ্বিধার পর ইংলণ্ড শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গেই মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং **১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে নিয়ে জার্মান-বিরোধী আর একটি ত্রিশক্তি মৈত্রী** (Triple Entente) **গড়ে ওঠে।** এশিয়ার নতুন সাম্রাজ্যবাদী দেশ **জাপানও এই দলে যোগ দেয়।**

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত

এই দুই শক্তিজোট গঠনের পশ্চাতে অবশ্য ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত কাজ করছিল। জার্মানীর কাছ থেকে ফ্রান্সের আলসাস ও লোরেন প্রদেশ উদ্ধারের ইচ্ছা (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধিতে ফ্রান্স যা হারিয়েছিল), দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া উভয় দেশের ক্ষমতা-বিস্তারের দ্বন্দ্ব, তুরস্ক সাম্রাজ্যে জার্মানীর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, ইংলণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা,—এই সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্যই ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলি দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

অসহিষ্ণু ও উগ্র জাতীয়তাবাদ

একবার এই ভাবে দুটি শিবিরের সৃষ্টি হবার পর এ যুগের **অসহিষ্ণু ও উগ্র জাতীয়তাবাদ উভয় শিবিরের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততার ভাব বাড়িয়ে তোলে।** ফ্রান্স ও জার্মানী, ইংলণ্ড ও জার্মানী, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা পরস্পরকে ঘোর শত্রু হিসাবে দেখতে আরম্ভ করে এবং সকলেই আপন জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় সম্মান সম্বন্ধে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। তাছাড়া **দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলেও এই উগ্র জাতীয়তাবাদ নানা সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।** অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়া বা সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্ব অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সার্বিয়াকে রাশিয়ার সমর্থনও অনেকটা জাতিগত ঐক্যের খাতিরে; উভয় দেশের অধিবাসীই ছিল স্লাভ (Slav) জাতির লোক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে **ইউরোপে**

সামরিক মনোবৃত্তিরও (Militarism) **বিশেষ প্রসার ঘটে।** ফরাসী বিপ্লবের যুগে বিপ্লবী বাহিনী এবং নেপোলিয়নের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী সারা ইউরোপে সামরিক মনোভাবের প্রচার করে। **বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিটি নাগরিকের নির্দিষ্ট কালের জন্য সৈন্যদলে যোগদানের প্রথাও** (Conscription) ফ্রান্সে প্রথম প্রবর্তিত হয়। প্রাশিয়াতে বিসমার্ক নেপোলিয়নের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই তিনি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর **জার্মানীতে বিরাট, স্থায়ী ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়,** এবং অল্পকালের মধ্যেই জার্মানীর দৃষ্টান্ত ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যও অনুসরণ করে। **ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির এক প্রতিযোগিতা** আরম্ভ হয়ে যায় ও উভয় দেশেই বৈজ্ঞানিকেরা **নতুন নতুন মারণাস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা** করতে থাকেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পর **ইংলণ্ড এবং জার্মানীর মধ্যে বিশাল যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণের এক প্রতিযোগিতা** দেখা যায় এবং দুই দেশই এর জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতে থাকে। এই সামরিক মনোভাবের প্রসার এবং অস্ত্র-প্রতিযোগিতাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

সামরিক মনোভাবের প্রসার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপের **বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রগুলিও রণোন্মাদনা সৃষ্টির কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল,** সন্দেহ নেই। প্রায় প্রতিটি তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রই নিজের রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন ও শত্রু রাষ্ট্রের মনোভাব বিকৃত করে দেখাবার চেষ্টা করে। শান্তি-প্রচেষ্টার প্রতি মৌখিক সমর্থন দেখালেও অনেকে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেশবাসীর মনোভাব যুদ্ধের প্রতি অনুকূল করে তোলার চেষ্টা করে। আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাণ্ডের হত্যার পর অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার সংবাদপত্রগুলি পরস্পরের প্রতি যে বিষোদ্গার করতে থাকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে তা অবশ্যই ত্বরান্বিত করেছিল।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

উপসংহারে বলা যায় যে **ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিগুলির স্বার্থের সংঘাত, জাতীয় শত্রুতা এবং জোটবাঁধার প্রবণতার পশ্চাতে যে মূলগত কারণটি কাজ করছিল তা হচ্ছে অর্থনৈতিক (বা ধনতান্ত্রিক) সাম্রাজ্যবাদ** (Economic Imperialism)। শিল্পোন্নত বিভিন্ন দেশ ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবণতার জন্যই বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, এবং তারই অনিবার্য পরিণাম হিসাবে আন্তর্জাতিক সংঘাত ও যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। সেইজন্যই **প্রথম**

অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ

বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্র বা জাতিকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা যায় না। এর জন্য প্রকৃত দোষী হল ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, যা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে বাধ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি ঃ বিশ্বযুদ্ধের **প্রথম দুই বৎসর** (১৯১৪-১৫) **জার্মানীই ছিল আক্রমণকারীর ভূমিকায়** এবং তার বিরোধী মিত্রপক্ষকে (Allied Powers) প্রধানতঃ আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহের যুদ্ধে **জার্মান সৈন্যবাহিনী বেলজিয়াম অধিকার করে ফ্রান্সের ভিতরে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়।** ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে **মার্নের যুদ্ধে** (Battle of the Marne) প্রথম পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ সৈন্যবাহিনী **পূর্ব প্রাশিয়া আক্রমণ করে জার্মান সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গের (Paul Von Hindenburg) হাতে ট্যানেনবার্গের (Tannenberg) যুদ্ধে (আগস্ট ১৯২৪) শোচনীয়ভাবে পরাস্ত ও** জার্মানী হতে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। **জার্মান সৈন্য-বাহিনী** ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যে **সমস্ত পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার বৃহত্তর অংশ অধিকার করে** রুশ সাম্রাজ্যের ভিতরে তাদের শক্ত ঘাঁটি নির্মাণ করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দেই অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও বুলগেরিয়ার সৈন্যবাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে সার্বিয়া পরাভূত ও আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তুরস্কের সৈন্যেরা সাফল্যের সঙ্গে ডার্ডানেল্‌স্ প্রণালী রক্ষা করতে থাকায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়াকে সৈন্য বা অস্ত্র দিয়ে বিশেষ সাহায্য করতে পারে নি। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে **মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী তুর্কীদের কাছে গ্যালিপলির যুদ্ধে (Battle of Gallipoli) পরাস্ত হয়** ও ব্রিটিশ সেনাপতি টাউনশেণ্ড (Townshend) মেসোপটেমিয়ায় **কুট-এল-আমারার** (Kut-el-Amara) যুদ্ধে তুর্কীদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করায় ব্রিটিশ সম্মান বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

১৯১৪-১৫ সালে জার্মান সাফল্য

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রণাঙ্গনে **ভার্দুনের যুদ্ধে** জার্মান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযান মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা ব্যর্থ করে দেয়। পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ ও ইটালীয় সৈন্যবাহিনী কিন্তু জার্মানদের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। **রুমানিয়া** রাশিয়ার প্ররোচনায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে **জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে,** কিন্তু **অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সম্মিলিত সৈন্য-বাহিনী রুমানিয়ানদের যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের রাজধানী বুখারেস্ট** (Bucharest) **দখল করে নেয়।** সমুদ্রবক্ষে কিন্তু **জার্মান**

ব্রিটিশ নৌবহরের জয় (১৯১৬)

নৌবাহিনী উত্তর সাগরে ব্রিটিশ নৌবহরের সঙ্গে জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধে (Battle of Jutland) চূড়ান্তভাবে **পরাজিত হয়**। এই বৎসর জার্মানীতে খাদ্যাভাবও দেখা যায়, কারণ সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অপ্রতিহত প্রাধান্য থাকায় জার্মানী বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে গিয়ে বাধা পায়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের গতি পালটাতে আরম্ভ করে। দীর্ঘকাল একাধিক রণাঙ্গনে যুদ্ধের ফলে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। **পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী এই বৎসর পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। ডুবোজাহাজের** (Submarine) **যথেচ্ছ ব্যবহার** করেও জার্মানী ব্রিটিশ নৌবল ও বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি।

যুদ্ধের গতি পরিবর্তন (১৯১৭)

পূর্ব রণাঙ্গনে **রাশিয়া বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্ট-লিটভস্কের অপমানজনক সন্ধি** (Treaty of Brest-Litovsk) **স্বাক্ষর করে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে** (মার্চ, ১৯১৮)। কিন্তু জার্মান ডুবোজাহাজের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সালে মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় তাদের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।** মার্কিন সৈন্য, অস্ত্র ও রণসম্ভারই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের দিকে নিশ্চিতভাবে ফিরিয়ে দেয়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানরা পশ্চিম রণাঙ্গনে বার বার মিত্রপক্ষের উপর আক্রমণ করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ঐ বৎসর মার্চ মাসে ফরাসী **সেনাপতি ফশকে** (Marshal Foch) **মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক** নিযুক্ত করা হয়। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় **মিত্রপক্ষীয় সেনারা জার্মানদের উপর প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে তাদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে। তুর্কীরা মেসোপটেমিয়ায় ও সিরিয়ায় পরাস্ত হয়, বুলগেরিয়া আত্ম-সমর্পণ করে** এবং **অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে।** জার্মানীতে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব ও গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়, জার্মান নৌবহর বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং **সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম সিংহাসন ত্যাগ করে হল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।** মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন যুদ্ধবিরতির জন্য **চৌদ্দ দফা প্রস্তাব** (Fourteen Points) ঘোষণা করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর **নিরুপায় জার্মানী বিনাসর্তে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে।**

জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়, ১৯১৮

প্যারিস শান্তি বৈঠক (Paris Peace Conference) : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, **প্যারিসে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা সন্ধির সর্ত**

আলোচনা করবার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন। রাশিয়া, জার্মানী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি **পরাজিত দেশগুলির প্রতিনিধিদের এই বৈঠকে ডাকা হয়নি।** ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই পাঁচটি রাষ্ট্রের দশজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি সমিতির উপর সন্ধির সর্তগুলি রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

শান্তি বৈঠকে প্রধান চার শক্তির ভূমিকা

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে **এই বৈঠকের কর্ণধার ছিলেন চারজন: ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমঁসো (Clemenceau), ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ (Lloyd George), ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্ল্যাণ্ডো (Orlando) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন।** জার্মানী অস্ত্রত্যাগ করার পরেও মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির অধিকাংশ লোক, এমন কি সেখানকার রাষ্ট্রনায়কেরাও অনেকে, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী করছিল। **জার্মানীর উপর এই প্রতিহিংসা গ্রহণের দাবী যে প্যারিস বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।** বিশেষতঃ, **জার্মানী যাতে ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয় করে আবার যুদ্ধে নামতে না পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ফরাসী সরকার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল,** এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জও ফ্রান্সের এই নীতি সমর্থন করেন। ফলে, **প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তির নীতি,** যা তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাবে ঘোষণা করেছিলেন, তা আর **সব ক্ষেত্রে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।**

জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী



উইলসন

ভার্সাই শান্তির সর্তাবলী (Versailles Settlement): বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি বিজিত রাষ্ট্রদের উপর শেষ পর্যন্ত যে সব শান্তির সর্ত আরোপ করে, সেগুলি **পাঁচটি বিভিন্ন সন্ধিতে** গ্রথিত হয়েছিল। মূল চুক্তিটি, যা জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়, তার নাম **ভার্সাই সন্ধি** (Treaty of Versailles—জুন, ১৯১৯)। এর পর ক্রমান্বয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে **সেণ্ট জার্মেনের সন্ধি** (Treaty of St. Germain—

সেপ্টেম্বর, ১৯১৯), বুলগেরিয়ার সঙ্গে **নইলীর সন্ধি** (Treaty of Neuilly—নভেম্বর, ১৯১৯), হাঙ্গেরীর সঙ্গে **ট্রিয়াননের সন্ধি** (Treaty of Trianon—জুন, ১৯২০) ও তুরস্কের সঙ্গে **সেভার্সের সন্ধি** (Treaty of Sevres—আগস্ট, ১৯২০) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তুরস্কের জাতীয়তাবাদী দলের বাধাদানের ফলে সেভার্সের চুক্তি কার্যকরী করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তুরস্কের নতুন সরকারের সঙ্গে **লসানের সন্ধি** (Treaty of Lausanne) স্বাক্ষরিত হয়। এই পাঁচটি সন্ধির সর্তকে সম্মিলিতভাবে **ভার্সাই শান্তির ব্যবস্থা** (Versailles Settlement) বলেও কখনো কখনো অভিহিত করা হয়।

পাঁচটি প্রধান সন্ধি (১৯১৯-২৩)

পাঁচটি স্বতন্ত্র সন্ধির মধ্যে বলা বাহুল্য জার্মানীর সঙ্গে সম্পাদিত **ভার্সাই সন্ধিটিই** ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সন্ধির দ্বারা জার্মানী **ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন** অঞ্চল, **বেলজিয়ামকে ইউপেন** (Eupen) **ও মালমেডী** (Malmedy) শহর, **লিথুয়ানিয়াকে মেমেল** (Memel) শহর এবং **পোল্যাণ্ডকে পোজেন প্রদেশ ও পশ্চিম প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল** সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া ভিশ্চুলা (Vistula) নদীর মোহানায় অবস্থিত **ডানজিগ** (Danzig) বন্দরটি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে **একটি মুক্ত শহরে** (Free City) **পরিণত হয়,** যাতে পোল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বাণিজ্য এই বন্দরটির মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ **সার** (Sar) **অঞ্চলটিকে ১৫ বৎসরের জন্য ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক তত্ত্বাবধানে আনা হয়।** এইভাবে **ইউরোপে প্রায় ২৫ হাজার বর্গমাইল রাজ্য হারানো** ছাড়াও **জার্মানীকে আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল ও চীনদেশে তার যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলি সবই মিত্রশক্তিদের কাছে** সমর্পণ করতে হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম ও জাপানের মধ্যে এই উপনিবেশগুলি ভাগাভাগি হয়ে যায়। এছাড়া, ব্রেস্ট-লিটভস্ক ও বুখারেস্টের সন্ধির মাধ্যমে জার্মানী সদ্য-পরাজিত রাশিয়া ও রুমানিয়ার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিল তাও তাকে ত্যাগ করতে হয়। বাল্টিক সাগর ও রাশিয়ার মধ্যে চারটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র—লিথুয়ানিয়া (Lithuania), ল্যাটভিয়া (Latvia), এস্টোনিয়া (Estonia) ও ফিনল্যাণ্ডের (Finland) সৃষ্টি করা হয়; এবং নতুন রুশ সরকার স্বতন্ত্র চুক্তির দ্বারা এদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় (১৯২০)।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির ২৩১ সংখ্যক ধারায় (Article 231) **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্পূর্ণ**

দায়িত্ব জার্মানীর উপরই আরোপ করা হয়েছিল। এই কারণেই তার বিরুদ্ধে ঐ সন্ধিতে **কতকগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও** গ্রহণ করা হয়। **জার্মান সৈন্যবাহিনীতে এক লক্ষের বেশি সৈন্য ও কর্মচারী রাখা নিষিদ্ধ হয়, বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের ব্যবস্থা (Conscription) তুলে দেওয়া হয়,** রাইন নদীর পূর্ব দিকে ত্রিশ মাইল প্রশস্ত অঞ্চলে কোন সমরায়োজন করা নিষিদ্ধ হয় (demilitarisation of the Rhineland), **জার্মানীকে বড় যুদ্ধজাহাজ ও অধিকাংশ বাণিজ্য-জাহাজও মিত্রপক্ষকে সমর্পণ করতে হয় ;** এবং ফ্রান্স, ইটালী ও বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। সর্বোপরি, **যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ মিত্রপক্ষকে দিতে জার্মানী স্বীকৃত হয়,** এবং এই ঋণ পরিশোধের জামিন হিসাবে **রাইন নদীর পূর্বদিক পনের বৎসরের জন্য মিত্রপক্ষের অধিকারে ছেড়ে দিতে হয়।** ভার্সাই সন্ধির ২২৭ ও ২২৮ সংখ্যক ধারায় **সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম** ও **অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যুদ্ধাপরাধে বিচারের ব্যবস্থাও** করা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় উইলিয়াম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল্যাণ্ডে আশ্রয় নেওয়ায় তাঁর বিচারের আয়োজন করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অবশ্য জার্মান জাতির আত্মমর্যাদায় এর ফলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

জার্মানীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

সেণ্ট জার্মেনের সন্ধির দ্বারা **অস্ট্রিয়ার সুপ্রাচীন হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের পতন** ঘটল। হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে **অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য শুধু জার্মান-ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত,** এবং **পোর্তুগালের চেয়েও আয়তনে ক্ষুদ্র একটি রাজ্যে পরিণত হল।** এই **প্রজাতান্ত্রিক অস্ট্রিয়া যাতে ভবিষ্যতে জার্মানীর সঙ্গে মিলিত না হতে পারে সেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হল।** পুরানো সার্বিয়া রাজ্যের সঙ্গে বসনিয়া, হার্জগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া (Croatia), শ্লাভোনিয়া (Slavonia) ও মণ্টেনিগ্রো অঞ্চল যোগ করে **নতুন স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়া রাজ্যের সৃষ্টি** হল। অনুরূপভাবে **বোহেমিয়া** (Bohemia) **ও মোরাভিয়ার** (Moravia) **সংযুক্তির ফলে স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার উৎপত্তি** হল। পুনরুজ্জীবিত **পোল্যাণ্ড** অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে পেল **গ্যালিসিয়া** (Galicia) এবং জার্মানীর কাছ থেকে **ডানজিগ বন্দর ব্যবহারের অধিকার।** ক্ষুদ্র রাজ্য **রুমানিয়াও** অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে **বুকোভিনা**

সেণ্ট জার্মেনের সন্ধি (১৯১৯)

(Bukovina) অঞ্চল লাভ করল। অষ্ট্রিয়ার চতুর্দিকে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমুদ্রের সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ট্রিয়াননের সন্ধি (১৯২০)

ট্রিয়ানন্নের সন্ধির দ্বারা **হাঙ্গেরীকে অস্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হল।** অষ্ট্রিয়ার মতো **হাঙ্গেরীও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল,** এবং তাকেও **কয়েকটি অঞ্চল রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছেড়ে দিতে হল।** অষ্ট্রিয়ার মতো হাঙ্গেরীরও কোন সামুদ্রিক বন্দর রইল না। এছাড়া অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী দুই রাজ্যেরই সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দুটি রাষ্ট্রকেই জার্মানীর মতো স্থায়ীভাবে দুর্বল করে রাখবার বন্দোবস্ত করা হল।

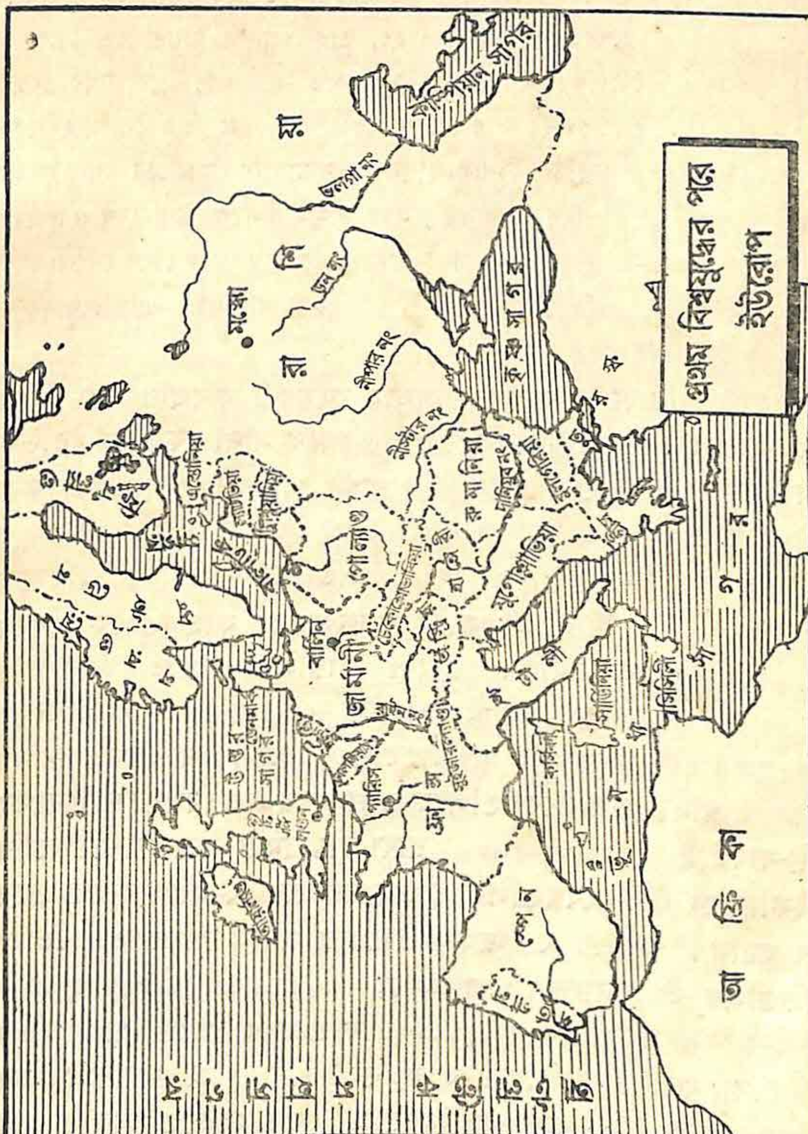
নইলীর সন্ধি (১৯১৯)

নইলীর সন্ধির দ্বারা জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র বুলগেরিয়া অন্যান্য পরাজিত শক্তির মতোই ক্ষতিগ্রস্ত হল। **বুলগেরিয়ার কিছু অংশ গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হল,** এবং তার সৈন্যসংখ্যা কমাবার ব্যবস্থাও করা হল।

লসানের সন্ধির ফলে **তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল,** এবং **মিশরের উপর তুরস্কের আইনগত প্রভুত্বের (Suzerainty) অবসান হল।** সিরিয়াকে ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে এবং প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়াকে ইংলণ্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হল, যদিও এদের সুশাসনের জন্য বিজয়ী শক্তিদ্বয় নবগঠিত জাতিসঙ্ঘের কাছে দায়ী থাকল। **অ্যানাটোলিয়া, পূর্ব থেস (Thrace), স্মার্না (Smyrna), আর্মেনিয়া ও কনস্ট্যান্টিনোপল শহর নতুন সন্ধিতে তুরস্কের অধীনে রইল।** এর ফলে কার্যতঃ তুরস্ক পশ্চিম এশিয়ার একটি শক্তিতে পরিণত হল। **মুস্তাফা কামাল পাশার** নেতৃত্বে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী দল দেশের অভ্যন্তরেও বিরাট পরিবর্তন আনল। বহু শতাব্দী ধরে **তুরস্কের সুলতান সমস্ত মুসলমান জগতের ধর্মগুরু বা 'খলিফা' (Caliph) বলে পরিচিত ছিলেন। সুলতানকে পদচ্যুত করে জাতীয়তাবাদী দল খিলাফৎ (Caliphate) ব্যবস্থাটিও তুলে দিল, এবং তুরস্ককে একটি আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করল।**

লসানের সন্ধি (১৯২৩)

ভার্সাই শান্তির সমালোচনা ঃ ভার্সাই সন্ধিতে যে বিজিত রাষ্ট্র **জার্মানীর প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়েছিল** সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে জার্মানী অস্ত্র সংবরণ করেছিল;


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে
ইউরোপ

কিন্তু কার্যকালে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ ঐ চৌদ্দ দফা প্রস্তাবকে বহু ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিগুলিতে জার্মান সাম্রাজ্যের আয়তন বিশেষভাবে হ্রাস করা হয়, তার শিল্প ও বাণিজ্যের, বিশেষতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের, সমূহ ক্ষতি করা হয়, তার উপর বিরাট ক্ষতিপূরণের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তার সৈন্যবাহিনীকেও পঙ্গু করে দেওয়া হয়; অষ্ট্রিয়ার বিশাল হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যকে আয়তনে পোর্তুগালের চেয়েও ক্ষুদ্র একটি রাজ্যে পরিণত করা হয়; এবং জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশ ও তুরস্কের অধীনস্থ তুর্কী ভাষা-ভাষী নয় এমন সমস্ত অঞ্চল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই সব ব্যবস্থার মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টার চেয়ে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তিই বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল।

স্থায়ী শান্তি না প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা?

।বজয়ী শক্তিবর্গের সদিচ্ছার অভাব কয়েকটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে। জার্মানী বিজয়ী শক্তিবর্গকে নানা রকম অর্থ নৈতিক সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। তার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সার অঞ্চল পরবর্তী পনের বৎসরের জন্য ফ্রান্সের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হয় এবং বেলজিয়াম ও ইটালীকেও প্রচুর পরিমাণ কয়লা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। কিন্তু, বিনিময়ে জার্মানী বিজয়ী শক্তিবর্গের কাছ থেকে কোন অর্থ নৈতিক সুবিধা পায়নি। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কীনস (Keynes) জার্মানীর সমস্ত শিল্প-সম্পদ ধ্বংস করে দেবার কুফল সম্বন্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। জার্মানীর উপনিবেশগুলিকে সুশাসনের জন্য বিজয়ী শক্তিবর্গের অছি-ব্যবস্থায় (mandate system) রাখা হয়, কিন্তু বিজয়ী শক্তিবর্গের অধিকারভুক্ত উপনিবেশগুলির সুশাসনের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অর্থাৎ প্রত্যেকটি জাতির স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অধিকার, যুদ্ধোত্তর সন্ধিগুলিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ বা ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এই সব সন্ধিতে স্বীকার করা হয়নি। এমন কি, জার্মান ভাষা-ভাষী অষ্ট্রিয়াকেও জার্মানীর সঙ্গে মিলিত হতে দেওয়া হয়নি, কারণ তার ফলে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি হত। চৌদ্দ দফা প্রস্তাবে বিজয়ী ও বিজিত সব রাষ্ট্রগুলিরই সৈন্য ও অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করার কথা বলা

বিজয়ী শক্তিবর্গের সদিচ্ছার অভাব

হয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা শুধু জার্মানী ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়। জার্মানীর উপর যে বিরাট ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা শুধু জার্মানীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়, **অর্থনীতির বিচারেও সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল।**

এই সব কারণেই ভার্সাই শান্তির সর্তগুলিকে জার্মানী কোন দিন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, **ভার্সাই সন্ধিকে সে বরাবর 'জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সন্ধি' (Dictated Peace) বলে অভিহিত করত।** জার্মানীর মতো সুসভ্য ও শক্তিশালী দেশকে স্থায়ীভাবে দুর্বল রাখার এ চেষ্টা স্বভাবতই সফল হয়নি। **অল্প দিনের মধ্যেই** হিটলার ও তাঁর নাৎসী দলের নেতৃত্বে **জার্মানী ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি অগ্রাহ্য করে ও নিজের পূর্ব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করে।** এই কারণেই বলা হয় যে **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই শান্তির মধ্যেই নিহিত ছিল।**

জার্মানী কর্তৃক সন্ধি অস্বীকার

জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা (League of Nations)**ঃ** পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়েছে যে কোন একটি বড় লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের পরই স্থায়ী শান্তি স্থাপনের বাসনা যুদ্ধরত দেশগুলিতে প্রবল হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নের সময়কার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের (Concert of Europe) সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই, হেগ (The Hague) শহরে দুটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের (১৮৯৯ ও ১৯০৭) ফলে একটি স্থায়ী জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবীমহলে উত্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবার জন্য **১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন যে চৌদ্দ দফা প্রস্তাব এনেছিলেন তার মধ্যে চতুর্দশ দফাটি ছিল জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব।** প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে উইলসন এই প্রস্তাবটির উপর বিশেষ জোর দেন এবং **ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলির মধ্যেই জাতিসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ করা হয়।**

চৌদ্দ দফা প্রস্তাবে জাতিসঙ্ঘের সূচনা

জাতিসঙ্ঘের প্রধান অঙ্গ ছিল তিনটিঃ **সাধারণ সভা** (Assembly), **কার্যনির্বাহক পরিষৎ** (Council) **ও সদর দপ্তর** (Secretariat)। পৃথিবীর প্রায় সব স্বাধীন রাষ্ট্রই সাধারণ সভার সদস্য হয়, কিন্তু **কার্যনির্বাহক পরিষদে বৃহৎ শক্তিগুলির প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল।** ছোট দেশগুলি কয়েকটি দলে (bloc) বিভক্ত হয়ে কার্যনির্বাহক পরিষদে তাদের প্রতিনিধি পাঠাত, **কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলি প্রত্যেকে এই পরিষদের স্থায়ী সদস্য ছিল।**

প্রধান তিন অঙ্গ

প্রথমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান স্থায়ী সদস্য বলে বিবেচিত হত ; পরে জার্মানী ও রাশিয়াকেও এই অধিকার দেওয়া হয়। জাতিসঙ্ঘের **সদর দপ্তর স্থাপিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে।** একটি **স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়** (Permanent Court of International Justice) এবং **আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাও** (International Labour Organization) জাতিসঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত হয়।

জাতিসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য

জাতিসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর **বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা** করা, এবং **তাদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমবায়ের ভাব বৃদ্ধি** করা। নিজেদের কোন বিবাদের সৃষ্টি হলে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করাই ছিল সদস্যদের কর্তব্য। তা না করে কোন দেশ অপরকে আক্রমণ করলে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক, এই তিন রকম চাপই জাতিসঙ্ঘ সৃষ্টি করতে পারত।

জাতিসঙ্ঘের প্রধান দুর্বলতা

দুর্ভাগ্যের বিষয়, **জাতিসঙ্ঘ কোনদিনই বিশেষ শক্তিশালী সংস্থা রূপে গড়ে ওঠেনি।** ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে উইলসন ও তাঁর 'ডেমোক্র্যাটিক' দল পরাজিত হয়, এবং 'রিপাবলিক্যান' দলের দ্বারা পরিচালিত **মার্কিন সরকার জাতিসঙ্ঘে যোগ দিতে অস্বীকার করে।** রাশিয়া ও জার্মানীকেও প্রথম দিকে সঙ্ঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়নি, পরে অবশ্য তারা অল্পকালের জন্য জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্য রূপে গৃহীত হয়। ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গোড়া থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব করে।

মুস্তাফা কামাল ও তুরস্কের আধুনিকীকরণ

মুস্তাফা কামালের অভ্যুদয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর 'নব্য তুরস্ক' দলের (Young Turks) নেতারা শাসনকার্যের দায়িত্ব ত্যাগ করে রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে পলায়ন করেন। বিজয়ী মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর অত্যন্ত অপমানজনক সেভার্সের চুক্তি চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু তুরস্কে **মুস্তাফা কামাল পাশার** (১৮৮০-১৯৩৮) নেতৃত্বে নতুন **জাতীয়তাবাদী দলের** (Nationalist Party) অভ্যুদয়ের ফলে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুস্তাফা কামাল কনস্ট্যান্টিনোপলের সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে গণিতে পারদর্শিতার পরিচয় দেন এবং সুলতানের অধীনে তুরস্কের **সামরিক**

বাহিনীতে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। যৌবনে ফরাসী সাহিত্য পাঠ করে তিনি বিপ্লবের প্রেরণা পান এবং সুলতানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নব্য তুরস্ক আন্দোলনেও কামাল অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর পর কিছুদিন ফ্রান্সে বসবাস করে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। স্বদেশে ফিরে এসে কামাল ইটালীর সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধে (১৯১১-১২) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) বিশেষ সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর



মুস্তাফা কামাল পাশা

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা

তার অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে কামাল তাঁর জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দল পশ্চিম এশিয়ার অ্যানাটোলিয়া প্রদেশের অ্যাঙ্গোরা (Angora) শহরে এক অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) গঠন করে, এবং কামাল স্বয়ং এই সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সেনানায়ক হন (১৯২০)। পর বৎসরই জাতীয়তাবাদী দল তুরস্কের জন্য এক নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার ছিল এই সংবিধানের ভিত্তি।

ইতিমধ্যে কনস্ট্যান্টিনোপলে তুরস্কের সুলতান বিজয়ী মিত্রশক্তিদের চাপে বাধ্য হয়ে সেভার্সের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন (১৯২০)। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল এই সন্ধি মানতে অস্বীকার করে এবং ঐ সন্ধির দ্বারা সব চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল যে গ্রীস দেশ, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও গ্রীস এই যুদ্ধে তুরস্কের কাছে পরাজিত হয়।

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ ও লসানের সন্ধি

গ্রীসের পরাজয়ের পর সেভার্সের চুক্তি পরিত্যক্ত হয় এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত লসানের চুক্তির দ্বারা তুরস্ককে বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপে তার যা অধিকার ছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই মুস্তাফা কামাল ও তাঁর দলের প্রাপ্য। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে

তুরস্কের সুলতান পদচ্যুত হন ও তুরস্কে এক আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। মুসলমান জগতের ধর্মগুরু বা 'খলিফা'র (Caliph) যে পদটি তুরস্কের সুলতান বংশানুক্রমিকভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে অলঙ্কৃত করে এসেছিলেন, তাও তুলে দেওয়া হয়।

মুস্তাফা কামাল যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের তিনিই ছিলেন প্রকৃত কর্ণধার। কার্যতঃ স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি কখনো তুরস্কের গণতান্ত্রিক কাঠামো নষ্ট করেননি, এবং তাঁর সমস্ত শক্তি দেশবাসীর উন্নতির জন্যই প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি তুরস্কের মধ্যযুগীয় সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে পাশ্চাত্য রীতিনীতি এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। স্ত্রীলোকের পর্দা ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা রোধ করা হয়, আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান হরফে তুর্কী ভাষা লেখার ব্যবস্থা হয়, শিক্ষাকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয় এবং নতুন তুর্কী রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করে। শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নীতিও গৃহীত হয়। এই আধুনিকীকরণের (Modernization) ফলে তুরস্কের দ্রুত উন্নতি ঘটে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কামালের মৃত্যুর পর ইসমেত ইনোনু (Ismet Inonu) তুরস্কের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সরকার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে (১৯৩৯-৪৫)।

তুরস্কের আধুনিকীকরণ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রুশ-বিপ্লব—নতুন দিগন্ত
(Russian Revolution—Its Impact)

রুশ বিপ্লবের কারণঃ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের **রুশ বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা।** ফরাসী বিপ্লবের পর এত বড় যুগান্তকারী ঘটনা ইউরোপের ইতিহাসে আর ঘটেনি। পৃথিবীতে কোন বিপ্লবই আকস্মিকভাবে বা একক প্রচেষ্টায় ঘটে না। রুশ বিপ্লবের পশ্চাতেও বহুলোকের বহুদিনের পরিশ্রম ও পরিকল্পনা কাজ করেছিল। এই বিপ্লবের সাফল্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী দল **"সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'**র (Social Democratic Party)। কার্ল মার্ক্সের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই দলটি **১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) দ্বারা রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত** হয়েছিল। কল-কারখানায় ও খনিতে কর্মরত শ্রমিক এবং নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই প্রধানতঃ এই দলে যোগ দিয়েছিল। তবে জার নিকোলাসের (Nicholas II) নিপীড়নমূলক নীতির জন্য দলটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ অংশ নিতে পারেনি। **১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের** পশ্চাতে এই দলের অনুপ্রেরণাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ঐ বিপ্লবের সাফল্য খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়।

সমাজতন্ত্রী দলের ভূমিকা

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দেই বিপ্লবের পন্থা নিয়ে মতভেদের ফলে 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র মধ্যে দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়। লেনিনের নেতৃত্বে সংখ্যাগুরু উপদলটির নাম হয় **'বলশেভিক'** (Bolshevik) ও প্লেখানভের (Plekhanov) নেতৃত্বে সংখ্যালঘু উপদলটির নাম হয় **'মেনশেভিক'** (Menshevik)। কিন্তু এই বিভেদের ফলে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কার্যকলাপে কিছু নিস্তেজ ভাব দেখা দেয়নি। রাশিয়ায় এই সময় 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' ছাড়াও 'সোস্যালিস্ট রেভল্যুশনারি পার্টি' (Socialist Revolutionary Party), 'অ্যানার্কিস্ট' (Anarchist) দল, 'নিহিলিস্ট' (Nihilist) দল প্রভৃতি আরো কয়েকটি বিপ্লবী দল সক্রিয় ছিল। কিন্তু এদের মধ্যে বিশেষ ঐক্য ছিল না এবং এরা কেউই 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র মতো শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ হতে পারেনি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বলশেভিক দল মেনশেভিকদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা দিন দিন বিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার জনগণের দুরবস্থা প্রচণ্ড অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে ভূমিদাস প্রথার (Serfdom) অবসান ঘটায় (১৮৬১) কৃষকেরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জমির মালিকানা পায়, কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। ইউরোপের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় রাশিয়ায় কৃষি-পদ্ধতি অনুন্নত ছিল। কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির তখনো প্রচলন হয়নি এবং অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র ছিল আকারে ক্ষুদ্র। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে রাশিয়াতেই কৃষি-উৎপাদনের হার ছিল সবচেয়ে কম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে (১৮৮১-৯৪), রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও মূলধন ও যন্ত্রপাতির অভাবে আশানুরূপ শিল্পোন্নতি হয়নি। কারখানাগুলির অধিকাংশই ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র, এবং রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র দুজন এইসব কারখানায় কাজ করত। **শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিও স্বৈরাচারী রুশ সরকার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন**। শিল্পোন্নতির জন্য রাশিয়ায় **ব্যাপক রেলপথ নির্মাণের** কাজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরম্ভ করা হয়, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়া এ ব্যাপারে আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারেনি।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

রাশিয়ার সমাজব্যবস্থাও রুশ জনসাধারণের বিশেষ প্রতিকূল ছিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা সামাজিক সাম্যের ভাব রাশিয়াতে আদৌ ছিল না। ভূস্বামীরাই সমাজে সব কিছু সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল। রাশিয়ার 'চার্চ'ও ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল, অসহিষ্ণু এবং উৎপীড়ক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনসাধারণের মানবিক অধিকারের ব্যাপারে রাশিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিল। দেশের **জনসংখ্যার শতকরা ৭৩ জন ছিল নিরক্ষর**। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে অবাধ আলোচনা বা চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না। স্বভাবতই পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের তুলনায় রুশ সমাজ ছিল অনেক প্রাচীনপন্থী। ইহুদীরা রুশ সমাজে বিশেষ ভাবে উৎপীড়িত ছিল। লক্ষ লক্ষ ইহুদী জার-শাসনের আমলে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

সামাজিক বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রাশিয়ার জনসাধারণ বিশেষ কোন অধিকার পায়নি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭) **ডুমা** (Duma) নামে এক জাতীয় প্রতিনিধি সভা স্থাপন করে তাঁর প্রজাদের কিছুটা রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এই সভার গঠনে জনসাধারণের ভূমিকা ছিল অতি সামান্য।

এই সভায় যেখানে জমিদারদের প্রতিনিধি ছিল দু' হাজারে একজন, সেখানে কৃষকদের প্রতিনিধি ছিল ত্রিশ হাজারে একজন এবং শ্রমিকদের নব্বই হাজারে একজন। তাছাড়া এই সভার ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কার্যতঃ, জারের মন্ত্রীরা তাঁরই নির্দেশে রাজকর্মচারীদের সহায়তায় দেশ শাসন করত। ডুমার কাছে তাদের কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে তারা বাধ্য ছিল না। এদের মধ্যে কেউ কেউ জনহিতৈষী ছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল রাজনীতির বিচারে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। দেশের সংবাদপত্রগুলির স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ছিল না। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের, বিশেষতঃ যারা বিপ্লবের বাণী প্রচার করত, তাদের প্রকাশ্যে সভা-সমিতি আহ্বান করার বা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার অধিকার ছিল না।

রাজনৈতিক অধিকারের অভাব ও উৎপীড়ন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার শাসনযন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে। জার্মান সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গের কাছে রুশ সৈন্যেরা বারবার পরাজয় বরণ করে। রাশিয়ার শিল্পসম্পদ এবং যানবাহন ব্যবস্থা আধুনিক যুদ্ধের ভারবহনের উপযোগী ছিল না, এবং লক্ষ লক্ষ কৃষকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের ফলে কৃষিকার্যও অত্যন্ত অবহেলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নিকোলাস ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই-এর মতো দুর্বল প্রকৃতির রাজা ছিলেন। দেশের সঙ্কটকালে নেতৃত্ব দেবার মতো শক্তি বা আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে রাশিয়ায় সামরিক ও অসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়। জারের প্রধান পরামর্শদাতা ক্ষমতালোভী রাসপুটিন (Rasputin) ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে জনৈক আততায়ীর হাতে নিহত হন। রাজতন্ত্রের এই সঙ্কটের সুযোগে বিপ্লবীরা নতুন উৎসাহে কাজে লাগে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রমিকদের ধর্মঘট উপলক্ষ করেই শেষ পর্যন্ত রুশ বিপ্লবের সূচনা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

মার্চ ও নভেম্বর বিপ্লব, ১৯১৭ঃ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে **কল-কারখানায় ঘন ঘন ধর্মঘট** আরম্ভ হলে রুশ সরকার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করে, কিন্তু সৈন্যেরা ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে অস্বীকার করে। ক্রমশঃ দেশের অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ন হয়। রণক্লান্তি, খাদ্যাভাব, গণবিক্ষোভ এবং ঘন ঘন ধর্মঘটের ফলে রুশ শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। **১৫ই মার্চ** তারিখে জার দ্বিতীয় নিকোলাস বাধ্য হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁর ছোট ভাই রাজমুকুট ধারণ করতে অস্বীকার করলে স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের অবিলম্বে বিলোপ ঘটে। ডুমা বা জাতীয় প্রতিনিধিসভা একটি **অস্থায়ী সরকার (Provisional**

Government) গঠন করে। উদারপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত এই সরকার বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয় এবং যারা দেশের বাইরে নির্বাসিত হয়েছিল, তাদের দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সংবাদপত্রের, সভা-সমিতির এবং নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। ফিনল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সর্বোপরি, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য **প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি সংবিধানসভা গঠনের আশ্বাসও** দেওয়া হয়। কিন্তু এই উদারপন্থী সরকারের জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় এবং এর পরিণামে তারা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে কোন কোনটি সর্তসাপেক্ষে সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়, কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে **বলশেভিক দল সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধের বিরোধিতা করে।** বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে লেনিন রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করছিলেন ও সেখান থেকে গোপনে রাশিয়ায় যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য চালাতেন। কিন্তু রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর তিনি জার্মানীর মধ্য দিয়ে গোপনে স্বদেশে ফিরে আসেন (এপ্রিল, ১৯১৭) এবং বলশেভিক দলকে নেতৃত্ব দেন। লেনিন বিশ্বাস করতেন যে, এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কোন স্বার্থ নেই, এবং দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে দেশের ভিতরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনও আনা যাবে না।

মার্চ বিপ্লবে (১৯১৬) উদারপন্থীদের জয়

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে উদারপন্থী সরকারের পতনের পর 'সোস্যালিস্ট রেভল্যুশনারি' নেতা **আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কি** (Alexander Kerensky) অস্থায়ী সরকারের নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এই সরকার যে সব সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণা করে, সেগুলি বিপ্লবীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কেরেনস্কির সঙ্গে সেনাপতি কর্নিলভের (Kornilov) প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এই সরকারকে দুর্বল করে ফেলে। দেশের সর্বত্র অরাজকতা বাড়তে থাকে। বলশেভিক দলের প্রভাবে রাশিয়ার নানা স্থানে **শ্রমিক ও সৈন্যদের সমিতি বা সোভিয়েট** (Soviet) গড়ে ওঠে। **ধনতন্ত্রের অবসান ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারাদের একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠার দাবী** সর্বত্র সোচ্চার হয়। সৈন্যদলে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে ও যুদ্ধে রাশিয়ার ক্রমাগত পরাজয় হতে থাকে। পরিশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেনিন ও তাঁর সহযোগী ট্রট্স্কির (Trotsky) নেতৃত্বে বলশেভিক দলের পরিচালনায় সশস্ত্র শ্রমিকেরা ক্ষমতা অধিকার করে, কেরেনস্কি

নভেম্বর বিপ্লবে সমাজতন্ত্রীদের সাফল্য

সরকারের পতন হয় এবং এই সরকারের প্রধান দেশত্যাগী হন। এই ঘটনাই রাশিয়ার ইতিহাসে **বলশেভিক বিপ্লব** নামে পরিচিত—**এরই ফলে পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী সরকার** রুশ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় (৭ই নভেম্বর, ১৯১৭)।

বলশেভিক দলের শাসনঃ বলশেভিক দলের অবিসংবাদী নেতা **লেনিন** [প্রকৃত নাম—ভ্লাডিমির ইলিয়িচ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyich Ulyanov) **১৯১৭ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রকৃত শাসক** ছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর বলশেভিক দল যে সমিতির হাতে সমস্ত দেশের শাসনভার অর্পণ করে তারই (Soviet of People's Commissars) সভাপতি হন লেনিন। তাঁরই নেতৃত্বে রাশিয়ায় নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। মার্ক্সবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী হয়েও তিনি প্রখর বাস্তববোধ-



লেনিন

সম্পন্ন ছিলেন, এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে কি ভাবে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ-পদ্ধতি পাল্টাতে হয়, তা তিনি ভাল ভাবেই জানতেন। রাশিয়ায় নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলায় লেনিনের প্রধান সহযোগী ছিলেন দুজন, ট্রট্‌স্কি ও স্ট্যালিন। ট্রট্‌স্কি [প্রকৃত নাম লেভি ব্রনস্টাইন (Levi Bronstein)] জাতিতে ইহুদী ও প্রথম জীবনে মেনশেভিক দলভুক্ত ছিলেন। লেনিনের মতো তিনিও জারের আমলে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্যানাডায় এসে বসবাস করছিলেন। বিপ্লব আরম্ভ হলে তিনি ক্যানাডা থেকে রাশিয়ায় চলে এসে লেনিনের প্রধান সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিপ্লবের সাফল্য লাভের পর তিনি রুশ সরকারের পররাষ্ট্রসচিব এবং রুশ সৈন্যবাহিনী বা 'লাল ফৌজের' (Red Army) সংগঠকের দায়িত্ব নেন। লেনিনের অপর সহযোগী স্ট্যালিন [প্রকৃত নাম—জোসেফ ঝুগাশভিলি (Joseph Dzhugashvili)] জর্জিয়ার (Georgia) এক কৃষক চর্মকারের পরিবারে জন্মেছিলেন। জারতন্ত্রের বিরোধিতা করে তিনি বহুবার কারাদণ্ড ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন। বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের পর তিনি রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা 'কমিসার' (Commis-sar) হন এবং লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁরই উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়।

লেনিনের সহযোগীরা

ক্ষমতা লাভের পর বলশেভিক দলের প্রথম কাজ হয় মার্চ বিপ্লবের পর রুশ জন-

সাধারণের সামনে রাখা লেনিনের **চারদফা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ**। এই কর্মসূচীর অনুসরণে রুশ সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি চাষীদের কাছে হস্তান্তরিত করে, এবং রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির লোকেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, (এমন কি ইচ্ছা করলে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ত্যাগ করার অধিকারও) স্বীকার করে নেয় (নভেম্বর, ১৯১৭)। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয় এবং কয়েক মাস পরে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ, জার্মানীর সঙ্গে তার স্থায়ী সন্ধি,—**ব্রেস্ট-লিটভস্কের চুক্তি** স্বাক্ষরিত হয়। এই অপমানকর চুক্তির ফলে রাশিয়া তার রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ মাইল অঞ্চল হারায় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে প্রচুর অর্থও দিতে হয়। কিন্তু শান্তি স্থাপন না করে রুশ সরকারের পক্ষে দেশের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। রাশিয়ায় অবিলম্বে ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব ছিল না, কিন্তু রুশ সরকার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। কারখানায় **শ্রমিকদের সর্বোচ্চ কর্মকাল** (Working hours) বেঁধে দেওয়া হয়, সমস্ত **উৎপাদন ব্যবস্থার উপর শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ** স্থাপিত হয়, কিছু **বৃহৎ শিল্প ও সমস্ত 'ব্যাঙ্ক' জাতীয়করণ** করা হয় এবং **বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার** ঘোষিত হয়। **রুশ চার্চের অধিকারও বলশেভিক সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত** হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রচলিত ধর্মশিক্ষা দান বন্ধ হয়ে যায়, রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, এবং ধর্মানুষ্ঠানবর্জিত 'রেজিষ্ট্রি' বিবাহের প্রচলন হয়।

সামন্ত প্রথার অবসান

ব্রেষ্ট-লিটভস্কের চুক্তি

সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিন বৎসর বলশেভিক সরকারকে **বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের** সম্মুখীন হতে হয়। বহু সোভিয়েট-বিরোধী গোপন সমিতি এই সময় রাশিয়ায় গড়ে ওঠে। প্রাক্তন সামন্ত, যাজক, উদারপন্থী নেতা, সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যকামীরা এই সব সমিতিতে যোগ দেয়। প্রথমে কিছুদিন জার্মান সৈন্যেরা এই সব প্রতিবিপ্লবী সংস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিল। পরে রাশিয়ার প্রাক্তন মিত্ররাষ্ট্রগুলিই এদের প্রচুর অর্থ, লোক ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। রাশিয়ার সহসা যুদ্ধত্যাগে মিত্ররাষ্ট্রগুলি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ এতে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। তা ছাড়া রুশ সরকার জারের বৈদেশিক ঋণ

বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ

শোধ করতে অস্বীকার করায় এবং পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের (**World Revolution**) আদর্শ ঘোষণা করায় তারা আরো শঙ্কিত হয়। যাই হোক্, কোন-না-কোন অজুহাতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত রাশিয়ার সমস্ত প্রাক্তন মিত্ররাষ্ট্রই রাশিয়ায় সৈন্য ও অস্ত্র পাঠায়, এবং তাদের স্ব স্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। রুশ সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশও জারের আমলের কয়েকজন সেনাপতির নেতৃত্বে বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তরাঞ্চলে সেনাপতি **য়ুডেনিচ** (Yudenitch), দক্ষিণে **ডেনিকিন** (Denikin) ও **র‍্যাঙ্গেল** (Wrangel) এবং পূর্বে **কোলচাক** (Kolchak) এই ভাবে বিদ্রোহী হন এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট হয়ে কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকারও গঠন করেন। কিন্তু রুশ কৃষক ও সৈন্যদের অধিকাংশই এই সঙ্কটে বলশেভিক সরকারকে সমর্থন করে, এবং **১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের** মধ্যে লাল ফৌজ দেশের সর্বত্র শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়। যুদ্ধক্লান্ত মিত্ররাষ্ট্রগুলি রাশিয়া থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নেয়, এবং তাদের সমর্থন হারিয়ে বিদ্রোহী রুশ নেতারাও নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের ফলে দেশে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার সম্মুখীন হতে গিয়ে বলশেভিক সরকারকে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। এই গৃহযুদ্ধ চলার সময়েই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, **জার দ্বিতীয় নিকোলাস সপরিবারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।** বিপ্লব-বিরোধী লোকেদের দমনের ভার বলশেভিক সরকার **'চেকা'** (Cheka) নামে একটি সমিতির উপর অর্পণ করে। এই সমিতি যে কোন প্রতিবিপ্লবীকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন বা হত্যা করতে পারত, এবং অনেক সময়ে নিছক সন্দেহের বশেও এই কাজ করা হত। সোভিয়েট সরকারের স্বীকৃতি অনুসারেই ১৯১৮ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৩,০০০ রুশ নাগরিক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

প্রতিবিপ্লবীদের নির্যাতন

জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে রুশ সরকার কতকগুলি কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। সমস্ত প্রয়োজনীয় শিল্পের জাতীয়করণ করা হয়, 'রেশনিং' (Ration) ব্যবস্থার কড়াকড়ি করা হয় এবং কৃষকদের সব উদ্বৃত্ত শস্য নির্ধারিত মূল্যে সরকারকে বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের সুব্যবস্থা করার জন্য নাগরিকদের উদ্বৃত্ত বাসস্থানও সরকার দখল করে নেয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়। এই ব্যবস্থাগুলি **যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ** (War Communism) নামে রাশিয়ার ইতিহাসে পরিচিত। কিন্তু এর ফলে রুশ সরকার জনসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের, অত্যন্ত অপ্রীতিভাজন হয়,

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ

দেশে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পায়, ও বেকারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। কৃষকদের অসহযোগিতার জন্য শস্যের ফলনও কম হয় এবং তার ফলে দেশের প্রায় চার কোটি লোক প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয় ও পঞ্চাশ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ হারায় (১৯২১-২২)।

দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য লেনিন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গোঁড়া সাম্যবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তে **নতুন অর্থনৈতিক নীতি** (New Economic Policy) চালু করেন। কৃষকেরা উদ্বৃত্ত শস্যের পরিবর্তে সরকারকে নির্দিষ্ট কর দেবার অধিকার পায়, ছোট দোকানে এবং কারখানায় ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয়, শ্রমিকদের শ্রমিক-সঙ্ঘে (Trade Union) যোগদান ইচ্ছামূলক করা হয়, পূর্ণ 'রেশনিং' ব্যবস্থার পরিবর্তন করে কিছু খাদ্যশস্য খোলা বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। বৃহৎ শিল্প এবং বৈদেশিক বাণিজ্য অবশ্য এখনও রাষ্ট্রায়ত্ত থেকে যায়। এই নতুন অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য অল্প দিনের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়। শিল্প এবং কৃষি, উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, এবং রুশ শিল্পে কিছু পরিমাণ বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগও এই সময় দেখা যায়। সাম্যবাদী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যে অবিচলিত থেকেও লেনিন এই ভাবে অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নতুন অর্থনৈতিক নীতি

লেনিনের আমলেই, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, **সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের** (Union of Soviet Socialist Republics) **সংবিধান রচিত হয়। সাতটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** (পরে এগারোটি) মিলিত হয়ে এই যুক্তরাষ্ট্রটি গঠন করে। নতুন সংবিধানে প্রত্যেকটি রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য, এমন কি যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করার অধিকারও স্বীকৃত হয়। প্রতিটি প্রজাতন্ত্রে একটি 'কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সঙ্ঘ' (Central Congress of Soviets) ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সোভিয়েট সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা আবার সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্য একটি 'বৃহত্তর কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সঙ্ঘ' (All Union Congress of Soviets) নির্বাচন করত। কিন্তু এই সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা ছিল দেড় হাজারেরও বেশি। ফলে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় প্রকৃত পক্ষে একটি **কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি** (Central Executive Committee) ও **মন্ত্রিপরিষৎ**-এর (Union Council of Commissars) উপর। কেন্দ্রীয় প্রধান বিচারালয়টিও (Union Supreme Court) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির অধীনে ছিল। নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার প্রথম দিকে কেবল শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদেরই দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানে এই অধিকার প্রায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই দেওয়া হয়।

সোভিয়েট সংবিধান

লেনিনের সময়কার সংবিধানেই **সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাম্যবাদী চরিত্র সুপরিস্ফুট ছিল**। দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার এবং উৎপাদন, বণ্টন ও পরিবহণ ব্যবস্থার কর্তৃত্ব এই সংবিধানে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয়।

সোভিয়েট সংবিধানে শাসনক্ষমতার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলেও কেন্দ্র এবং সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনযন্ত্রের উপর একটিমাত্র দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা লাভের পরই লেনিনের নির্দেশে 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র নতুন নামকরণ হয় **'কমিউনিস্ট পার্টি'**। এই কমিউনিস্ট পার্টি-ই ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার একমাত্র আইনসম্মত রাজনৈতিক দল। এই দলের অনুমোদন ভিন্ন কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কারো পক্ষে সম্ভপর ছিল না। দেশের সমস্ত সংবাদপত্রও ছিল এই দলের বা তার শাখা-প্রশাখার প্রভাবাধীন। পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতির মানদণ্ডে, এই কারণে, রুশ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র আখ্যা দিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সমস্ত শাসনযন্ত্রের উপর একটিমাত্র দলের কর্তৃত্ব থাকায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের ঐক্য সুদৃঢ় হয়, এবং সেখানকার জনগণের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজও অনেক সহজ হয়।

একদলীয় শাসন

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লেনিনের মৃত্যু হয়। এরপর রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এক তীব্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, এবং সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত **স্ট্যালিন ট্রট্স্কিকে পরাজিত করে ক্ষমতা অধিকার করেন**। ট্রট্স্কি সমস্ত বিশ্বে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্ট্যালিন এই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বিবেচনা করতেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র রাশিয়াতেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়মূল করা। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ট্রট্স্কিপন্থীরা রুশ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত হন ও প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের অপরাধে তাঁদের বিচার ও নির্বাসন বা কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল (১৯৫৩) পর্যন্ত স্ট্যালিন রাশিয়ায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার গঠনের ইতিহাসে লেনিনের পরেই তাঁর স্থান।

স্ট্যালিন ও ট্রট্স্কির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব



স্ট্যালিন

স্ট্যালিনের আমলের দুটি প্রধান কীর্তির কথা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত। প্রথমতঃ তাঁর সময়েই (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ক্রমিক রূপায়ণের** মধ্য দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্যই এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার (Economic Depression) ভাব রাশিয়াকে স্পর্শ করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার **নতুন সংবিধানে** প্রায় সমস্ত রুশ নাগরিককে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়, এবং গোপনে ভোটদানের প্রথাও (Secret Ballot) ঐ সঙ্গে প্রবর্তিত হয়। তবে স্ট্যালিন তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রভাব বিস্তারের কোন সুযোগ দেননি। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে **মস্কো বিচারগুলির** মাধ্যমে দলের শোধন (purges) এবং বহু প্রাক্তন 'কমিউনিস্ট' বিপ্লবীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। রুশ সরকারের গুপ্ত পুলিশবাহিনী দেশের সর্বত্র সরকারের বিরোধীভাবাপন্ন লোকেদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। স্ট্যালিনের এই সব কাজ পরবর্তী কালে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করেছে।

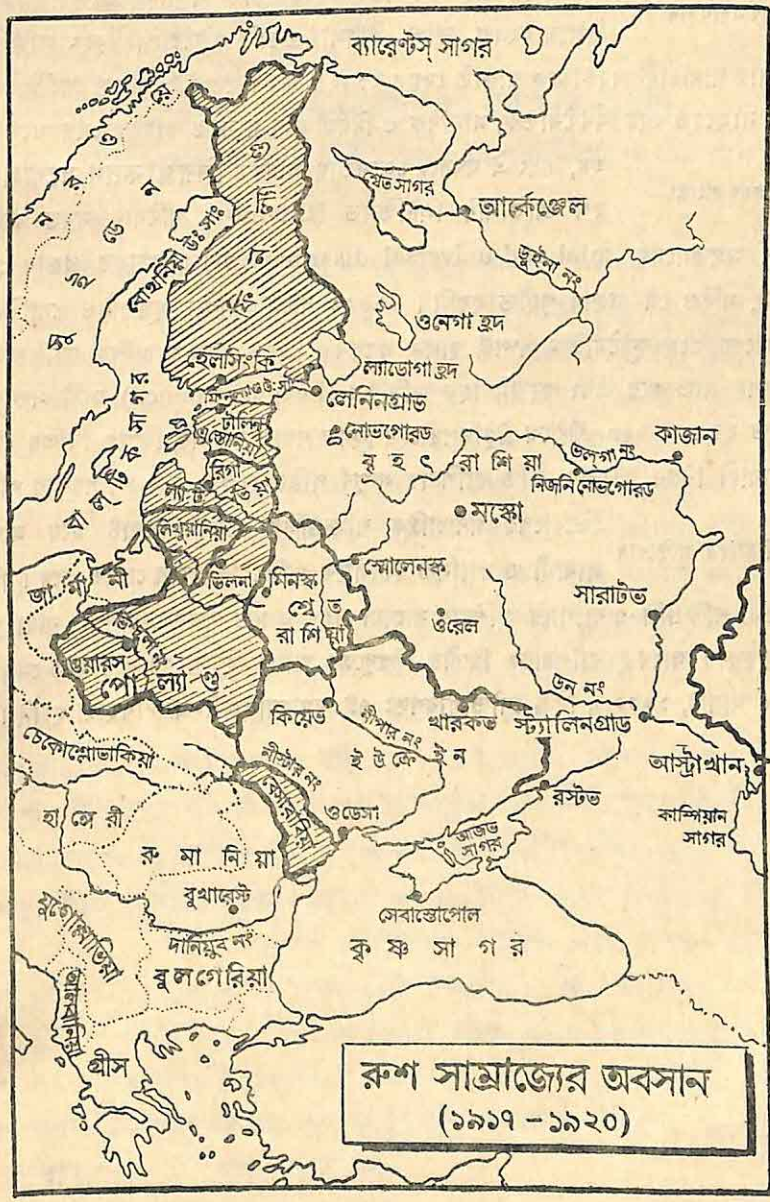
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মস্কো বিচার

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি : আগেই বলা হয়েছে যে ক্ষমতা লাভ করেই লেনিন রাশিয়াকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনেন, এবং তার কয়েক মাস পরে জার্মানীর সঙ্গে অত্যন্ত অপমানজনক সর্তে **ব্রেস্ট-লিটভস্কের সন্ধি** স্বাক্ষর করেন (মার্চ, ১৯১৮)। এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক প্রদেশের তীরবর্তী দেশগুলির (লিথুয়ানিয়া, এস্টোনিয়া, লিভোনিয়া প্রভৃতি) উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করে। রুশ বিপ্লবের সাফল্যের চিন্তাই তখন লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের মনে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এর পরেও ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে রাশিয়ায় বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটে এবং ফ্রান্সের ইঙ্গিতে পোল্যাণ্ড রাশিয়া আক্রমণ করে। রুশ সরকার বৈদেশিক শক্তিগুলিকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে এবং পোল্যাণ্ডকেও পশ্চিম রাশিয়ার কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করে। (রিগার সন্ধি, অক্টোবর, ১৯২০)।

অপমানজনক সন্ধি

লেনিন অতঃপর এশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের **জেনোয়া বৈঠকে** তাঁরই নির্দেশে রুশ প্রতিনিধি চিচেরিন (Chicherin) ঘোষণা করেন যে সোভিয়েট রাশিয়া সকল দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে (Peaceful Co-existence)



রুশ সাম্রাজ্যের অবসান
(১৯১৭ – ১৯২০)

বিশ্বাসী। ১৯২১ সালে আফগানিস্তান, পারস্য ও তুরস্কের সঙ্গে এবং পরের বৎসর জার্মানীর সঙ্গে রুশ সরকার মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্য না হয়েও তার অর্থনৈতিক, মানবিক ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত কার্যকলাপের অংশীদার হয়, এবং ঐ বৎসরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত **নিরস্ত্রীকরণ সন্মেলনে** রুশ প্রতিনিধি লিটভিনভ (Litvinov) পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অস্ত্রত্যাগের (total and universal disarmament) চাঞ্চল্যকর প্রস্তাব পেশ করেন, যদিও সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং কার্যনির্বাহক সমিতির (League Council) স্থায়ী সভ্যরূপে গৃহীত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কিপন্থীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটাবার নীতি রাশিয়ায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, এবং রুশ সরকার পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে একজোট হয়ে নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইটালীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিগুলি এ ব্যাপারে রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার স্বার্থেই রাশিয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে হিটলারের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় (আগস্ট, ১৯৩৯), কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই অস্বাভাবিক মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা

নাৎসীবাদের প্রতিরোধ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

একনায়কত্বের অভ্যুদয় ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা

(Rise of Dictatorship and Failure of Collective Security)

(১৯২৫-৩৯)

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ইউরোপের সব রাষ্ট্রগুলি আপন নিরাপত্তার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘের উপর নির্ভর করতে পারেনি। এই ব্যাপারে ফ্রান্সই সব চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল, কারণ অদূর ভবিষ্যতে জার্মানী আবার সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারে, এই সম্ভাবনা ফরাসী জাতি কখনো ভুলতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘে যোগ না দেওয়ায় এবং আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ থাকায় ফ্রান্স তার নিরাপত্তার প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘের উপর ভরসা করে থাকেনি। নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ফ্রান্স ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড এবং ভার্সাই সন্ধির দ্বারা সৃষ্ট তিনটি নতুন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। এই সন্ধিগুলির ফলে ইউরোপে ফ্রান্সের নেতৃত্বে একটি **ক্ষুদ্র রাষ্ট্রজোটের (Little Entente) সৃষ্টি হয়**। এই জোটের রাষ্ট্রগুলি ভার্সাই সন্ধির সর্তাবলী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরস্পরকে সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল।

ফ্রান্সের নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা

রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ার সঙ্গে তার প্রাক্তন মিত্ররাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। আবার জার্মানী বা অষ্ট্রিয়াও নতুন সাম্যবাদী রুশ সরকারকে প্রথম দিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেনি। জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করতেও রাশিয়ার বেশ কয়েক বৎসর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু লেনিনের ঐকান্তিক আগ্রহে রাশিয়া ১৯২১ সালে পারস্য, আফগানিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে এবং ১৯২২ সালে জার্মানীর সঙ্গে আবার মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইটালীও অনুরূপ ভাবে পশ্চিম ইউরোপে স্পেন এবং এবং পূর্ব ইউরোপে রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপন করে।

অন্যান্য রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি

লোকার্নো চুক্তি ঃ এই ভাবে ইউরোপে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রজোট গড়ে উঠছিল, তখন জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমেও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার

ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই জাতিসঙ্ঘের সামনে এ বিষয়ে নানা পরিকল্পনা পেশ করা হয়, কিন্তু সেগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের আপত্তির ফলে নাকচ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য প্রথম যে পরিকল্পনাটি বহু সংখ্যক রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে, তা হচ্ছে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের **লোকার্নো চুক্তি** (Locarno Pact)। ইউরোপে সাতটি বিভিন্ন রাষ্ট্র—জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড—সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো শহরে সাতটি পৃথক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই সাতটি চুক্তির সম্মিলিত নাম লোকার্নো চুক্তি। লোকার্নো চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মানী ও ফ্রান্স এবং জার্মানী ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী সীমান্ত সম্বন্ধে স্থায়িত্বের আশ্বাস দেওয়া। তা ছাড়া জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া বা পোল্যাণ্ডের কোন বিবাদ উপস্থিত হলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আন্তর্জাতিক সালিশীর মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করা, এবং ফ্রান্সের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করাও এই লোকার্নো চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপের তিন প্রধান রাষ্ট্রনায়ক,—জার্মানীর **স্ট্রেসম্যান** (Stresemann), ফ্রান্সের **ব্রিয়ঁা** (Briand) ও ব্রিটেনের **চেম্বারলেন** (Chamberlain) এই লোকার্নো চুক্তির স্রষ্টা ছিলেন, এবং এই চুক্তির ফলে অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোকার্নো চুক্তির পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবেই ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ দেওয়া হয়, এবং ঐ সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতিতেও জার্মানী বৃহৎ শক্তি হিসাবে স্থায়ী সভ্যের আসন লাভ করে।

লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫)

লোকার্নো চুক্তির দুর্বলতাও অবশ্য সহজেই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। এই চুক্তির দ্বারা জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তের দেশগুলি (ফ্রান্স ও বেলজিয়াম) তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস পেলেও পূর্ব সীমান্তের দেশগুলি (পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি) অনুরূপ কোন আশ্বাস পায়নি, যদিও জার্মানী এ ব্যাপারে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবে না বলেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিল। পরবর্তী কালে জার্মানী প্রথমে পূর্ব দিকেই তার সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তা ছাড়া লোকার্নো চুক্তি ইউরোপে এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি করে যে ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি যথেষ্ট জোরদার নয়, যদি না সেগুলি পরবর্তী কালে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির দ্বারা আবার স্বেচ্ছায় অনুমোদিত হয়। তার কারণ, লোকার্নো চুক্তিতে এমন কিছু আশ্বাস ছিল না, যা এর আগেই ভার্সাই সন্ধিতে দেওয়া হয়নি। ভার্সাই সন্ধির কোন কোন অংশ আবার নতুন করে অনুমোদন করার কি প্রয়োজন এখন ঘটল,—এ প্রশ্ন স্বভাবতই অনেকের মনে সেই সময় জেগেছিল।

লোকার্নো চুক্তির দুর্বলতা

প্যারিস চুক্তি ঃ ফ্রান্স অবশ্য লোকার্নো চুক্তিতেও সম্পূর্ণ আশ্বস্ত বোধ করেনি। এই চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেও সে তার আগেকার মৈত্রীচুক্তিগুলি নাকচ করতে, অথবা তার অস্ত্র-সজ্জা হ্রাস করার কোন প্রস্তাবে সম্মত হতে ঘোরতর অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবার জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করবার চেষ্টা চলে। এই চেষ্টারই পরিণাম ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের **প্যারিস চুক্তি** (Pact of Paris) বা **কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি** (Kellogg-Briand Pact)। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব **কেলগ** ও ফ্রান্সের বৈদেশিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী **ব্রিয়াঁ** এই চুক্তির উদ্ভাবক ছিলেন। ছয়টি বৃহৎ শক্তি,—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ও জাপান, লোকার্নো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী অপর তিনটি রাষ্ট্র—চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম ও পোল্যাণ্ড এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি (ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি) প্রথম এই প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, এবং বিশ্বের সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রকেই এতে যোগ দেবার আহ্বান জানানো হয়। অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ৬৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র এই চুক্তিটি অনুমোদন করে (জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল তখন মাত্র ৫৮)। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুদ্ধকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে (Outlawry of War)। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য, আগেকার কোন সন্ধির সর্ত পালনের জন্য অথবা জাতিসঙ্ঘের সদস্যরূপে তার নির্দেশ পালনের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আইনসঙ্গত বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্র ভবিষ্যতে এই চুক্তি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সে সম্বন্ধে প্যারিস চুক্তিতে কোন কথাই বলা হয়নি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উপর জাপানের নগ্ন আক্রমণ প্রমাণ করে দিল যে প্যারিস চুক্তি বিশ্বে শান্তি রক্ষার কাজে কোন সহায়তা করবে না,—এ শুধু আশার ছলনা।

প্যারিস চুক্তি (১৯২৮)

ঐ চুক্তির ব্যর্থতা

নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ঃ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের **চৌদ্দ দফা প্রস্তাবেই** বিজয়ী ও বিজিত উভয় গোষ্ঠীর রাষ্ট্রদের অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের পরিকল্পনা স্থান পেয়েছিল। কিন্তু **ভার্সাই সন্ধিতে** শুধু পরাজিত জার্মানী ও তার মিত্রদের সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার হ্রাসের ব্যবস্থা করা হয়। **জাতি-সঙ্ঘের সনদের** (Charter of the League of Nations) অষ্টম ধারায় (Article 8) অবশ্য নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু এখানেও জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ না করে যতদূর সম্ভব অস্ত্রসজ্জা কমাবার কথা বলা হয়েছিল। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের **ওয়াশিংটন**

নিরস্ত্রীকরণের নানা পরিকল্পনা

সম্মেলনে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইটালীর যুদ্ধজাহাজের মোট পরিমাণের (tonnage) একটি আনুপাতিক হার (ratio) বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের এ ব্যাপারে কোন অবদান ছিল না, এবং নৌযুদ্ধে ব্যবহৃত সব রকম জাহাজকে (ক্রুজার, সাবমেরিন প্রভৃতি) এই চুক্তির আওতায় আনা হয়নি। ১৯২৭ এবং ১৯৩০ সালে **জেনেভা ও লণ্ডনে** এ বিষয়ে **আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান** হয়, কিন্তু তাতে সমস্ত বৃহৎ শক্তির পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন সূত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। কেবল জাপান, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নৌবহর সীমিত করার বিষয়ে একমত হয়।

জাতিসঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে **জাতিসঙ্ঘ** নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাটি আলোচনা করার জন্য একটি বিশেষ **'কমিশন'** গঠন করে। কিন্তু একদিকে ফ্রান্সের জার্মান-ভীতি এবং অপরদিকে জার্মানী ও ইটালীর উচ্চাশার জন্য এই 'কমিশনের' কাজ অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল হয়ে ওঠে। পাঁচ বৎসর আলাপ-আলোচনার পর 'কমিশন' একটি খসড়া চুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করে। এতে সৈন্য, অস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় সীমাবদ্ধ করার একটি পরিকল্পনা নীতিগতভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রয়োজন হলে যাতে এই সীমা লঙ্ঘন করা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জন্যও একটি ধারা এই প্রস্তাবের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (১৯৩২)

অবশেষে **১৯৩২** খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনেভা শহরে **আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন** বসে। জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকেও এই সম্মেলনে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়। দীর্ঘকাল ধরে সম্মেলনের অধিবেশন চলে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হার্বার্ট হুভার (Hoover) প্রস্তাব করেন যে সমস্ত রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্রাস করা হোক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড (Macdonald) অনুরোধ জানান যেন সমস্ত বৃহৎ শক্তিই তাদের সৈন্যসংখ্যাকে দু' লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। কোন কোন বিশেষ ধরনের আক্রমণ, যেমন সমুদ্রে ডুবো জাহাজের (submarine) আক্রমণ বা বিমানপোত থেকে বোমা-বর্ষণ অথবা যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রের ('গ্যাস' প্রভৃতি) ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও কোন কোন মহল থেকে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন প্রস্তাবেই সকলের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। বৃহৎ শক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসই এ ব্যাপারে সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত নেবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। কয়েক মাস চলার পর সম্মেলন

নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

এক বৎসরের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার সম্মেলনের অধিবেশন বসলে জার্মানী নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সমতা দাবী করে, এবং শেষ পর্যন্ত **হিটলারের** (Adolf Hitler) নেতৃত্বে জার্মানী শুধু নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন নয়, জাতিসঙ্ঘও ত্যাগ করে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আর বসেনি, এবং এর পর ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি আবার তাদের অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়।

জাতিসঙ্ঘের কার্যকলাপ ঃ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলেও জাতিসঙ্ঘ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বৎসরে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ রোধ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানে জাতিসঙ্ঘের প্রয়াস সাফল্যলাভ করে। ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনের মধ্যে অ্যালাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ (Aaland Islands) সংক্রান্ত বিরোধ, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর মধ্যে সাইলেশিয়া (Silesia) সংক্রান্ত বিরোধ, গ্রীস এবং বুলগেরিয়ার সীমানা নিয়ে বিরোধ, এবং ইংল্যাণ্ড ও ইরাকের মধ্যে মোসুলের (Mosul) তৈলখনি সংক্রান্ত বিরোধ জাতিসঙ্ঘের চেষ্টায় শান্তিপূর্ণভাবে মিটে যায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দেয় এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বের মোট ৬২টি রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সদস্য হয় (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৪২)। সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হেগের **আন্তর্জাতিক আদালত** (P. C. I. J.) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত **৪৩টি আন্তর্জাতিক বিরোধের আইনগত নিষ্পত্তি** করতে সমর্থ হয়। **আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাটিও** (I. L. O.) বিভিন্ন অনগ্রসর দেশের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য ৬৭টি পরিকল্পনা (Convention) রচনা করে, যদিও সেগুলি সব রাষ্ট্রের অনুমোদন পায়নি। জাতিসঙ্ঘের অধীনস্থ **অছি পরিষদের** (Mandates Commission) তত্ত্বাবধানে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি অনগ্রসর দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক অগ্রগতির পথও প্রশস্ত হয়। এ ছাড়া **দাস ব্যবসায়** ও **বিপজ্জনক মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ করার ব্যাপারে**, এবং **স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত, মানবিক ও অর্থনৈতিক কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে** জাতিসঙ্ঘ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে।

জাতিসঙ্ঘের সাময়িক সাফল্য

কিন্তু জাতিসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ নিরোধের ব্যাপারে সঙ্ঘের সাফল্য খুবই সীমিত হয়েছিল। **বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থান্বেষী মনোভাব** সংযত করতে জাতিসঙ্ঘ একেবারেই ব্যর্থ হয়। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার চেয়েও আপন

স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে এদের আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। এদের সংযত করার মতো সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা জাতিসজ্ঘকে কখনোই দেওয়া হয়নি। নৈতিক প্রতিবাদ বা আক্রমণাত্মক কাজের নিন্দার দ্বারা বৃহৎ শক্তিবর্গের আগ্রাসী মনোভাব দূর করা সম্ভব ছিল না।

জাতিসজ্ঘের দুর্বলতা

প্রথম দিকেও যে সব বিরোধের মধ্যে কোন বৃহৎ শক্তির স্বার্থ জড়িত ছিল, জাতিসজ্ঘ সেখানে বিরোধের ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি করতে পারেনি। ফ্রান্সের সমর্থনপুষ্ট পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়ার ভিলনা শহর (Vilna) দখল করলে বা ইটালী গ্রীসের কর্ফু (Corfu) দ্বীপের উপর গোলাবর্ষণ করলে জাতিসজ্ঘ তার প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। **১৯৩১** খ্রীষ্টাব্দে **জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে** চীনের অভিযোগে জাতিসজ্ঘ এ ব্যাপারে একটি তদন্ত "কমিশন" নিয়োগ করে। কিন্তু ঐ "কমিশনের" বক্তব্য জাপানের অনুকূল না হওয়ায় জাপান তার প্রতিবাদে জাতিসজ্ঘ ত্যাগ করে (১৯৩৩)। এর কয়েক বৎসর পরে (১৯৩৫) মুসোলিনীর (Mussolini) নেতৃত্বে **ইটালী আফ্রিকার আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া রাজ্য আক্রমণ** করলে, আক্রান্ত রাজ্যের অনুরোধে জাতিসজ্ঘ ইটালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Economic Sanctions) প্রয়োগের নির্দেশ দেয়, কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বৃহৎ শক্তির শৈথিল্যে এই নির্দেশ সম্পূর্ণ কার্যকরী হয়নি। **ইটালী জাতিসজ্ঘ পরিত্যাগ করে** (**১৯৩৬**) আবিসিনিয়াকে গ্রাস করে। হিটলারের পরিচালনাধীনে **নাৎসী জার্মানী** আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে **জাতিসজ্ঘ ত্যাগ করে** (**১৯৩৩**) ও পরে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে অধিকার করে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে **স্পেনে গৃহযুদ্ধ** দেখা দিলে জাতিসজ্ঘ তা নিবারণ করতে পারেনি। এখানেও বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ তার পক্ষে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে **রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ** করলে অবশ্য জাতিসজ্ঘ তাকে সদস্যপদ থেকে বিতাড়িত করে, কিন্তু তাতে জাতিসজ্ঘের দুর্বলতা দূর হয়নি। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার আগেই জাতিসজ্ঘ কার্যতঃ নিষ্ক্রিয়** হয়ে পড়েছিল। ঐ বিশ্বযুদ্ধের অবসানে **১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার বিলোপ ঘোষণা** করা হয়।

জাতিসজ্ঘের অন্তিম ব্যর্থতা

জার্মানীতে নাৎসী দলের অভ্যুত্থান ঃ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম সিংহাসন ত্যাগ করে হল্যাণ্ডে পলায়ন করলে **জার্মানীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত** হয়, এবং সমাজতন্ত্রী দলের (সোস্থাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি)

নেতা **এবার্ট (Ebert) রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন**। জার্মানীর দুর্বলতা ও রণক্লান্তির সুযোগ নিয়ে সেখানকার নবগঠিত **সাম্যবাদী দল** (কমিউনিষ্ট পার্টি) রাশিয়ার অনুকরণে ঐ দেশেও সমাজ-বিপ্লব আনার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি (১৯১৯)। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জার্মান জাতীয় পরিষৎ (National Assembly) ওয়াইমার (Weimar) শহরে মিলিত হয়ে একটি সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানের ভিত্তিতে জার্মানীতে যে **গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র** স্থাপিত হয় ইতিহাসে তা **ওয়াইমার সাধারণতন্ত্র** নামে পরিচিত।

জার্মানীতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পনের বৎসর ওয়াইমার সাধারণতন্ত্র স্থায়ী হয়েছিল। নানা বিষয়ে এই সাধারণতন্ত্র সাফল্য অর্জন করেছিল, সন্দেহ নেই। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দলের অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ করা, শিল্প-বাণিজ্য নতুন করে গড়ে তোলা, শ্রমিকদের জন্য নানারকম সামাজিক বীমা প্রকল্প রূপায়িত করা এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে আবার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করা ওয়াইমার সাধারণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য কীর্তি বলে বিবেচিত হয়।

ওয়াইমার সাধারণতন্ত্রের কৃতিত্ব

কিন্তু নানা কারণে ওয়াইমার সাধারণতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। প্রথমতঃ, ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি জার্মান জাতির মনে নিদারুন ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল। জার্মানীর সাধারণতন্ত্রী সরকার এই অবিচারের কোন প্রতিকার করতে না পারায় জার্মানীর জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল। শিল্প-বাণিজ্য নাশ, ও যুদ্ধের জন্য বিজয়ী রাষ্ট্রদের প্রচুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণে **জার্মানীতে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি** দেখা দেয়। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্ত, চাকুরীজীবী শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং গণতান্ত্রিক সরকারের উপর তাদের আস্থা কমে যায়। তৃতীয়তঃ, **সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী দলের বিসদৃশ প্রতিযোগিতায়** উভয় দলেরই শক্তি ক্ষয় হয়, এবং পরে যখন হিটলারের নেতৃত্বে সামরিক মনোভাবাপন্ন **জাতীয় সমাজতন্ত্রী বা নাৎসী দলের আবির্ভাব** ঘটে তখন জার্মানীতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ, **জার্মানীতে কোন দিনই গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়নি**। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সময় থেকেই

জার্মানীতে সামরিক মনোভাবের প্রসার এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় উচ্চপদস্থ সৈনিক ও রাজ-কর্মচারীদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মান সমাজে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি, এবং গণতন্ত্রের আদর্শও ঐ সমাজে দৃঢ়মূল হয়নি। নাৎসী দল জার্মানীর সামরিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পঞ্চমতঃ, বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় তার ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ে, উৎপাদন হ্রাস পায় এবং বেকার সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। দেশের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থাও রাজনৈতিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় নাৎসী দল তার সুযোগ গ্রহণ করে।

ঐ সাধারণতন্ত্রের দুর্বলতা

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে জার্মান রাষ্ট্রনায়কদের সামনে সবচেয়ে কঠিন যে সমস্যাটির উদয় হয়েছিল, তা হচ্ছে **যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা** (Problem of Reparations)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ ধার্য করা হয় ৬৬০ কোটি পাউণ্ড, এবং ৬৬টি বাৎসরিক কিস্তিতে তাকে এই অর্থ দিতে বলা হয়। জার্মানী ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি দেবার আগে দু বৎসর সময় চায়, কিন্তু **ফ্রান্স** তার এই অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করে এবং তার উপর চাপ সৃষ্টির জন্য জার্মানীর প্রধান শিল্পাঞ্চল রূঢ় (Ruhr) দখল করে নেয়। অল্পদিনের মধ্যেই মিত্রশক্তিবর্গ বুঝতে পারে যে বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য না পেলে জার্মানীর পক্ষে এই বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেওয়া কখনোই সম্ভবপর হবে না। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন সেনাপতি ডসের (Dawes) সভাপতিত্বে একটি আন্তর্জাতিক 'কমিটি' নিয়োগ করা হয়। এই 'কমিটির' পরিকল্পনা (Dawes Plan) অনুসারে জার্মানীর ক্ষতিপূরণের ভার কিছুটা লাঘব করা হয়, এবং তাকে বৈদেশিক ঋণ দানের ব্যবস্থাও করা হয়। ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে রূঢ় থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এতেও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের **ইয়ং পরিকল্পনা** (Young Plan) অনুসারে জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে আরো কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু এর দু বৎসরের মধ্যেই জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তার অর্থনৈতিক অবস্থা আদৌ ক্ষতিপূরণ দেবার অনুকূল ছিল না।

ক্ষতিপূরণের সমস্যা

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এবার্টের মৃত্যু হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খ্যাতনামা জার্মান সেনাপতি **হিণ্ডেনবার্গ** (Hindenburg) রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন। প্রথম জীবনে রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হবার পর তিনি আমৃত্যু (১৯৩৪) সাধারণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মান

পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন **গুস্টাভ স্ট্রেসম্যান** (Gustav Stresemann)। তাঁর আমলেই জার্মানী লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯২৫) ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রতিকূলতা অনেকটা জয় করে, এবং জাতিসঙ্ঘের সদস্য হিসাবে গৃহীত হয় (১৯২৬)। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সূচনা হয় তারই আঘাতে ওয়াইমার সাধারণতন্ত্র ধরাশায়ী হয়।

স্ট্রেসম্যানের আমল

যে রাজনৈতিক দলটির উত্থানের ফলে জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র বিপন্ন হয় তার নাম **জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল, বা সংক্ষেপে, নাৎসী দল** (National Socialist Party or Nazi Party)। এই দলের সর্বাধিনায়ক অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার জাতিতে জার্মান হলেও প্রথম জীবনে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রজা ছিলেন। কিছুদিন রাজমিস্ত্রীর কাজ করার পর তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকরূপে যোগ দেন, এবং যুদ্ধাবসানে (১৯১৯) জার্মান শ্রমিকদের একটি ক্ষুদ্র দলে যোগ দিয়ে ক্রমশঃ তার নেতৃপদ লাভ করেন। তাঁর পরিচালিত এই জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলটি আন্তর্জাতিকতা, সমাজতন্ত্র ও শান্তিবাদের (Pacifism) বিরোধী ছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা, অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করে জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করা, জার্মানী থেকে **ইহুদী বিতাড়ন** এবং শিল্প-বাণিজ্যের উপর কিছুটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে **মিউনিকে** (Munich) ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে হিটলার ব্যর্থ হন এবং তাঁর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কারাবাসকালেই হিটলার তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী **'মেইন কাম্‌ফ্‌'** (Mein Kampf) বা 'আমার সংগ্রাম' রচনা করেন।

হিটলারের অভ্যুদয়



হিটলার

কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হবার পর হিটলার আবার তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করেন এবং ঐ প্রচারকার্যের সঙ্গে ভীতিপ্রদর্শন, গুণ্ডামি, নরহত্যা প্রভৃতিও চলে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর নাৎসী দলের জনপ্রিয়তা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সাম্যবাদী দলকে তারা সমর্থন করেনি। হিটলার তাদের আশার বাণী শোনান এবং জাতীয় আত্মশ্লাঘার ভাবকে

জাগিয়ে তোলেন। হতাশাপীড়িত জার্মান জাতি,—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী, ঋণগ্রস্ত কৃষক, ইহুদী-বিদ্বেষী ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদার, প্রাক্তন সৈনিক ও সামরিক গৌরব-পিপাসু যুবকের দল— নাৎসী দলের পতাকাতলে মিলিত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে জার্মান প্রতিনিধি সভায় (Reichstag) নাৎসী দলের সংখ্যা ১২ হতে বেড়ে ১০৭-এ দাঁড়ায় এবং দু বৎসর পরে তারা প্রতিনিধি সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। জার্মান সাম্যবাদী দল তাদের অদূরদর্শী নীতির জন্য এখনো হিটলারের চেয়েও সমাজতন্ত্রীদের বেশি বিরোধিতা করতে থাকে। **১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের** জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী বা 'চ্যান্সেলারের' (Chancellor) পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই নাৎসী দল তাদের 'ঝটিকা বাহিনী'র (Storm Trooper) সাহায্যে বলপ্রয়োগের দ্বারা সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের দমন করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে করায়ত্ত করে। **১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের** আগস্ট মাসে হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যু হলে হিটলার একাধারে **রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হন,** এবং জার্মান সৈন্যদলও সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর তিনি 'ফুয়েরার' (Fuhrer) বা মহান নেতা নামে পরিচিত হন। এইভাবে জার্মানীতে ওয়াইমার সাধারণতন্ত্রের পতন ও নাৎসী দলের নেতৃত্বে একনায়কত্বের (Dictatorship) প্রতিষ্ঠা হয়।

নাৎসী দলের ক্ষমতালাভ

হিটলারের শাসনে (১৯৩৪-৪৫) জার্মান রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় নীতিরই আমূল পরিবর্তন হয়। নাৎসী দলের বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী এবং **ইহুদীদের উপর প্রচণ্ড উৎপীড়ন** চালানো হয়। লক্ষ লক্ষ ইহুদী এই সময় নিহত বা জার্মানী হতে বহিষ্কৃত হয়। বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও (Einstein) ইহুদী হবার অপরাধে জার্মানী হতে বিতাড়িত হন। নাৎসীরা জার্মানদের আর্যবংশসম্ভূত এবং **আর্যদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে ঘোষণা করে।** রাষ্ট্রের স্বার্থে ধর্মশিক্ষাও নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট উভয় 'চার্চই' নাৎসী আক্রমণের লক্ষ্য হয়। নাৎসীরা কিন্তু জার্মানীর **অর্থ নৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি** সাধন করে। সরকারী প্রচেষ্টার ফলে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির দ্রুত অগ্রগতি ঘটে, এবং **১৯৩৬** খ্রীষ্টাব্দে একটি **চতুর্বার্ষিকী অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাও** প্রবর্তন করা হয়। কল-কারখানায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হলেও শ্রমিকদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। দেশের সমস্ত আর্থিক সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়।

হিটলারের শাসনে জার্মানী

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে হিটলার ক্রমশই আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ

করেন। ভার্সাই সন্ধির অপমানকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়াই তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। **জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ** করার পর (১৯৩৩) জার্মানী ভার্সাই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সর্ত অগ্রাহ্য করে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করে ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানীর সংযুক্তির দাবী এবং জার্মানীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বর্ধিত বাসস্থানের (living space) দাবীও ঐ সঙ্গে জানানো হয়। হিটলার মধ্যে মধ্যে ব্রিটেনের কাছে জার্মানীর প্রাক্তন উপনিবেশগুলি প্রত্যর্পণ করার দাবীও জানান। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অষ্ট্রিয়া গ্রাসের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার লোকার্নো চুক্তি বাতিল করে দিয়ে রাইন নদীর পশ্চিম তীরে সৈন্য-সমাবেশ করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে ইটালী ও জাপান জার্মানীর সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে রোম-বার্লিন-টোকিও চক্রের (Rome-Berlin-Tokyo Axis) সৃষ্টি করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধেও (১৯৩৬-৩৯) হিটলার ফ্যাসিস্ট নেতা ফ্র্যাঙ্কোকে সাহায্য করেন। হিটলারের এই সব কার্যকলাপের ফলে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা সৃষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, এবং ইউরোপ আবার যুদ্ধের সম্মুখীন হয়।

হিটলারের বৈদেশিক নীতি

ইটালীতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানীর মতো ইটালীতেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতন ও একনায়কত্বের অভ্যুদয় হয়। প্যারিস শান্তি বৈঠকে ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্ল্যাণ্ডো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও ভার্সাই সন্ধিতে ইটালী আদৌ সন্তোষ লাভ করেনি। রাজ্য-বিস্তারের দিক থেকে ইটালী অন্যান্য মিত্রশক্তির মতো লাভবান হয়নি। দক্ষিণ ইউরোপের **ডালমেশিয়া** (Dalmatia) অঞ্চলে বা ফিউম (Fiume) বন্দরে ইটালীর অধিকার এই চুক্তিতে স্বীকৃত হয়নি। জার্মানী বা তুরস্কের কাছ থেকে পাওয়া কোন রাজ্যখণ্ডও ইটালীর শাসনাধীন করা হয়নি। ইটালীর ভিতরেও এ সময় খাদ্যাভাব এবং করবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের নানা অভিযোগের প্রতিকার করতেও সরকার অসমর্থ হয়। সাম্যবাদী দলের প্রচারকার্যের ফলে কল-কারখানায় ধর্মঘট ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দেশব্যাপী এই অসন্তোষের সুযোগে মুসোলিনীর পরিচালিত ফ্যাসিস্ট দল ইটালীতে ক্ষমতা অধিকার করে (১৯২২)।

যুদ্ধোত্তর ইটালীর অবস্থা

কর্মকার-পুত্র **বেনিটো মুসোলিনী** (Benito Mussolini) প্রথম জীবনে একজন শ্রমিক ছিলেন, এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের অপরাধে স্বদেশ হতে সুইজারল্যাণ্ডে

নির্বাসিত হন। সেখানেও তিনি একটি সমাজতন্ত্রী দলের পত্রিকা সম্পাদনা করে সরকারের কোপে পড়েন। তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, জার্মান সমাজতন্ত্রী দল এতকাল যুদ্ধের বিরোধিতা করলেও যুদ্ধ বাধার পর তারা সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। **সমাজতন্ত্রের চেয়েও জাতীয়তাবাদ যে প্রবলতর শক্তি,** সহসা তাঁর এই উপলব্ধি হয়, এবং তিনিও ইটালীর এই যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে প্রচারকার্যে রত হন। ১৯১৫ সালে ইটালী যুদ্ধে যোগ দিলে মুসোলিনী সৈনিকের পেশা গ্রহণ করেন, এবং যুদ্ধের পর ইটালীর শাসককুলের অপদার্থতায় মর্মাহত হয়ে জাতীয় সম্মান ও শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি এক নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন।

মুসোলিনীর অভ্যুদয়



মুসোলিনী

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিলান শহরে মুসোলিনী **ফ্যাসিস্ট** (Fascist) দলের প্রতিষ্ঠা করেন। **কঠোর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম এই দলের মূলমন্ত্র হয়।** ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রের পূজারী ছিল, রাষ্ট্রকেই সে সমস্ত জাতির এবং সমাজের স্রষ্টা ও নিয়ামক বলে মনে করত। ব্যক্তির বা শ্রেণীর স্বার্থকে প্রয়োজন হলেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কাছে বলি দিতে হবে, এই ছিল তার বক্তব্য। **গণতন্ত্র বা সাম্যবাদ**ও ফ্যাসিস্টদের কাছে **অবজ্ঞার বস্তু ছিল**। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তারা **যুদ্ধের সমর্থক ও আন্তর্জাতিকতার ঘোর শত্রু** ছিল। রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী আন্তর্জাতিক চুক্তির কোন মূল্যই তারা দিত না। **অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে** নাৎসীদের মতোই ফ্যাসিস্টরাও সমস্ত **উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের** পক্ষে ছিল। তবে এই নিয়ন্ত্রণের ভার নির্বাচিত আইনসভার উপর না দিয়ে ফ্যাসিস্ট দল ও তার মহান নেতার উপরেই তারা ন্যস্ত করতে চাইত। রাষ্ট্রপূজার মতো **'মহান নেতার'** পূজাও ফ্যাসিস্ট আদর্শের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং মুসোলিনীই ছিলেন তাদের 'মহান নেতা'। ফ্যাসিবাদ ইটালীর বাইরেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আর কোথাও এমন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র অধিকার করতে পারেনি।

ফ্যাসিবাদের মূলতত্ত্ব

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্যাসিস্ট দলের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং সাম্যবাদী দল সম্পর্কে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভীতির মনোভাব এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল। তা ছাড়া ফ্যাসিস্টদের উগ্র, মারমুখী আচরণও তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারে সহায়তা করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট দল ইটালীর আইন সভায় ২৯টি আসন দখল করে, কিন্তু মুসোলিনীর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোনো আস্থা ছিল না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি দলীয় আধা-সামরিক বাহিনী 'কালো কোর্তার দল'কে (Black Shirts) নিয়ে রোম অভিযান করেন এবং রাজা **তৃতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলের** (Victor Emmanuel III) কাছে শাসন-ক্ষমতা দাবী করেন। গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ না দেখে রাজা মুসোলিনীর হাতেই শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করেন। এর পর দেশের নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ও সমস্ত ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলকে বলপ্রয়োগে দমন করে কয়েক বৎসরের মধ্যে ফ্যাসিস্ট দল ইটালীতে পূর্ণ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ডুচে (Duce) উপাধিতে ভূষিত মুসোলিনী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইটালীর পরাজয় পর্যন্ত দেশের সর্বময় কর্তা থাকেন।

ফ্যাসিষ্ট দলের ক্ষমতা লাভ

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মুসোলিনী **উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের প্রবর্তন করেন**। কল-কারখানায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ হলেও শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয় ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা (বীমা ব্যবস্থা, শিক্ষার সুযোগ প্রভৃতি) সরকার গ্রহণ করে। সরকারী কর্মচারীদের কাজে অনিয়ম ও শৈথিল্য দূর হয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সফল অভিযান গড়ে ওঠে, পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়, বিরাট বিরাট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হয়, কৃষি-উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং জনশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগী হয়। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে ইটালীয় সরকারের বহুদিনব্যাপী কলহের অবসান ঘটে। রোমে পোপের প্রাসাদের (Vatican) সন্নিহিত অঞ্চলকে পোপের অধীনে একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য হিসাবে ইটালীয় সরকার স্বীকার করে নেয়। বিনিময়ে পোপও ইটালীয় সরকারকে স্বীকৃতি দেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবে তার নিবৃত্তি হয়।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মুসোলিনী ভার্সাই সন্ধিতে ইটালীর প্রতি যে অবিচার হয়েছিল তার প্রতিকার দাবী করেন। ক্ষমতা লাভের পরেই তিনি ভূমধ্যসাগরের

পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি দ্বীপের অধিকার তুরস্কের কাছ থেকে পান। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়া ফিউম বন্দরটি ইটালীকে সমর্পণ করে, তবে ঐ বন্দরের মধ্য দিয়ে যুগোশ্লাভিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবার অধিকার স্বীকৃত হয়। দু বৎসরের মধ্যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির মাধ্যমে ইটালী উত্তর আফ্রিকার ট্রিপলি সংলগ্ন বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করে (১৯২৪-২৬)। তবে মুসোলিনী যে ইটালীর রাজ্যবিস্তারের জন্য কোন বড় যুদ্ধে নামবেন, তা প্রথমে মনে হয়নি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী প্যারিস চুক্তিতেও স্বাক্ষর করে। নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ইটালীর কিছুদিনের জন্য মনোমালিন্য চলে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী অষ্ট্রিয়া গ্রাস করবার চেষ্টা করলে ইটালী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাতে বাধা দেয়, এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই তিনটি রাষ্ট্রের একটি জোটও গড়ে ওঠে।

বৈদেশিক নীতির প্রাথমিক সাফল্য

কিন্তু ১৯৩৫ সাল থেকেই ইটালীর বৈদেশিক নীতির আগ্রাসী ভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুটা আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ফেরাবার জন্য এবং কিছুটা সামরিক গৌরব অর্জন করে ইটালীয়দের জাতীয় শ্লাঘার বোধকে তৃপ্ত করার জন্য মুসোলিনী উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টায় রত হন, এবং আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র **আবিসিনিয়া** তাঁর প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য হয়। আবিসিনিয়ার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সোমালিল্যাণ্ড ইটালীর অধিকারভুক্ত ছিল। সোমালিল্যাণ্ডের উপর আবিসিনিয়ার উপজাতীয়দের আক্রমণ উপলক্ষ করে ইটালী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯৩৫)। বলা বাহুল্য, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানী আক্রমণের সাফল্য এবং এ ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘের নিষ্ক্রিয়তা মুসোলিনীকে উৎসাহিত করেছিল। যাই হোক, ইটালীর এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিসিনিয়া ইটালীর অধিকারভুক্ত হয়। পরাজিত সম্রাট হাইলে সেলাসি (Haile Selassie) জাতিসঙ্ঘের কাছে আবেদন করেও কোন প্রতিকার পাননি। জাতিসঙ্ঘ ইটালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের নির্দেশ দিলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শৈথিল্যে ইটালীর প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ পেতে কোন অসুবিধাই হয় নি। আবিসিনিয়া জয়ের পর ইটালী জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করে (১৯৩৬) ও পরের বৎসর **জার্মানীর সঙ্গে সাম্যবাদ-বিরোধী চুক্তিতে** (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করে। ইটালী এই সময় **স্পেনের গৃহযুদ্ধেও হস্তক্ষেপ করে** এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে **আলবানিয়া** (Albania) গ্রাস করে। নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ইটালীর সংযোগ ইউরোপে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

আবিসিনিয়া অধিকার

স্পেনে গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)ঃ ইটালীর বাইরে ফ্যাসিবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে স্পেনে। **প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষ** ছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সরকারের দুর্বলতার জন্য **১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে কার্যতঃ সামরিক** একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসন কিন্তু দেশে জনপ্রিয় হয়নি, ফলে **১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত** হয়। এর পাঁচ বৎসর পরে ফ্যাসিস্ট মতাবলম্বী সেনাপতি ফ্র্যাঙ্কো (General Franco) সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (১৯৩৬)। জার্মানী ও ইটালীর সরকার তাঁকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। অন্যদিকে রাশিয়া সাধারণতন্ত্রী সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসে। দুটি দলেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে যোগ দেয়, কিন্তু ব্রিটেন এই গৃহযুদ্ধে (Spanish Civil War) হস্তক্ষেপ করেনি। তিন বৎসর গৃহযুদ্ধ চলার পর ফ্র্যাঙ্কো রাজধানী ম্যাড্রিড (Madrid) অধিকার করে স্পেনে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৩৯)। পোর্তুগালেও বার বার আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অরাজকতার ফলে অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্পেনে ফ্যাসিস্ট দলের সাফল্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা (১৯৩৬-৩৯)ঃ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা হতে থাকে বলা যেতে পারে। ঐ বৎসরের শেষ দিকে জাপান ও জার্মানী একটি রুশ-বিরোধী চুক্তিতে (অ্যান্টি-কমিণ্টার্ণ প্যাক্ট) স্বাক্ষর করে, এবং এর কয়েক মাস পরেই দূর প্রাচ্যে **জাপান চীনের উপর প্রকাশ্য আক্রমণ চালায়** (জুলাই, ১৯৩৭)। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে **ইটালী 'অ্যান্টি-কমিণ্টার্ণ প্যাক্টে' যোগ দিলে রোম-বার্লিন-টোকিও চক্র সম্পূর্ণ হয়,** এবং এরই পরিণামে ইটালীও তার দুটি মিত্ররাষ্ট্রের মতো জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করে। জাতিসঙ্ঘের প্রধান দুটি সদস্য, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর এই মিলনের তাৎপর্য প্রথমদিকে বুঝতে পারেনি, অথবা বুঝেও নিষ্ক্রিয় ছিল। ফ্রান্স ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করলেও ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযানের সময় (১৯৩৫-৩৬) তার বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় প্রতিবাদ জানাল না। বরং ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী লাভাল (Laval) ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব হোরের (Samuel Hoare) সঙ্গে মিলিত হয়ে আবিসিনিয়ার একটি বড় অংশ ইটালীর হাতে বিনাযুদ্ধে তুলে দিতে উদ্যোগী হলেন। হোর-লাভাল পরিকল্পনা ব্রিটিশ জনমতের চাপে কার্যকরী না হলেও ব্রিটেন ইটালীর

রোম-বার্লিন-টোকিও চক্র

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অনিশ্চিত মনোভাব

আবিসিনিয়া অভিযানে কোন বাধা দেয়নি, এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট ফ্র্যাঙ্কোর সাফল্য দেখেও ঐ দেশের সাধারণতন্ত্রী সরকারকে কোন সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেনি।

হিটলারের অষ্ট্রিয়া গ্রাস

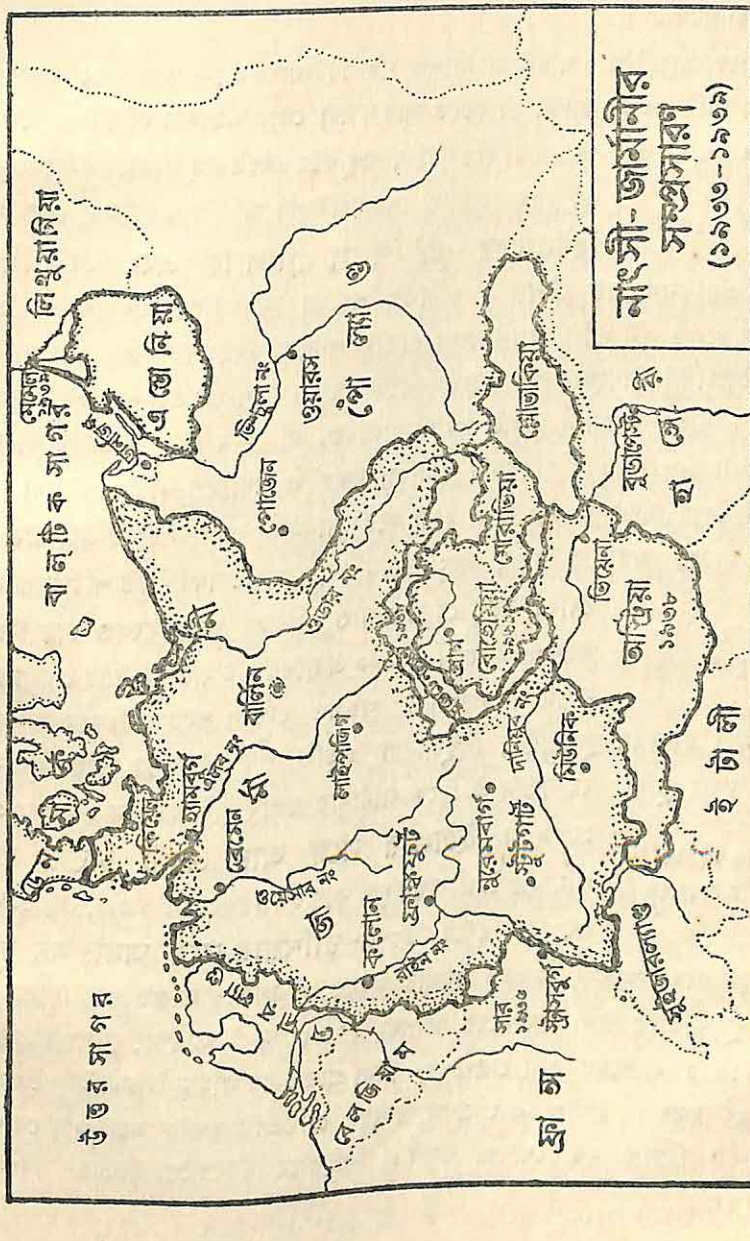
১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাইন নদীর পশ্চিম তীরে সৈন্যসমাবেশ করার সময় হিটলার ঘোষণা করেছিলেন যে পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে তিনি ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করবেন না, এই মর্মে আশ্বাস দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জার্মান সৈন্যবাহিনী অকস্মাৎ অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে রাজধানী ভিয়েনা দখল করল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু এখন সে তার মিত্ররাষ্ট্রকে কোন বাধাই দিল না। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সও এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি নিয়ে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিল হিটলারকেই।

স্থডেটেনল্যাণ্ড অধিকার

এর পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত স্থডেটেনল্যাণ্ডের (Sudetenland) জার্মান অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার ছলে ঐ রাজ্যটিকে গ্রাস করতে অগ্রসর হলেন। ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ড প্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও স্থডেটেন জার্মানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ক্রমশঃ সোচ্চার হতে থাকলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **নেভিল চেম্বারলেন** (Neville Chamberlain) জার্মানীর প্রতি **তোষণ নীতি** (Policy of Appeasement) অবলম্বন করে আবার দুর্বলতার পরিচয় দিলেন। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিকে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে তিনি ফরাসী প্রধান মন্ত্রী **দালাদিয়েরের** (**Daladier**) সহযোগে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভাজনের এক পরিকল্পনা তৈরী করলেন। শেষ পর্যন্ত

মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮)

মিউনিক চুক্তির (১৯৩৮) দ্বারা জার্মানী স্থডেটেনল্যাণ্ড লাভ করল, তবে হিটলার এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার আর কোন অংশ দাবী করবেন না। অসহায় চেক সরকার বিনা রক্তপাতে তার এই রাজ্যহানি মেনে নিল। চেক রাষ্ট্রপতি বেনেস (Benes) পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীও ঐ দেশের অঞ্চলবিশেষ নিজেদের জন্য দাবী করে বসল। **স্থডেটেনল্যাণ্ড অধিকার** করেও হিটলারের লোভ তৃপ্ত হয়নি। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মিউনিক চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার আরো দুটি বৃহৎ অঞ্চল **বোহেমিয়া** (Bohemia) ও **মোরাভিয়া** (Moravia) দখল করলেন। শুধু শ্লোভাকিয়া অঞ্চলটুকু নামেমাত্র স্বাধীন রইল। **স্কোডার** (Skoda) বৃহৎ অস্ত্র-নির্মাণের কারখানা হিটলারের হস্তগত হল এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ চেক তাদের স্বাধীনতা হারাল। ইংলণ্ড ও


নাৎসী-জার্মানীর সম্প্রসারণ
(১৯৩৩-১৯৩৯)
বাল্‌টিক সাগর
লিথুয়ানিয়া
মেমেল
পূর্ব প্রাশিয়া
ডানজিগ
ওয়ারস
ভিশ্চুলা নং
পোল্যান্ড
পোজেন
বার্লিন
ওডার নং
হামবুর্গ
এলব নং
ব্রেমেন
জার্মানী
কোলোন
ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাইন নং
মিউনিক
দানিয়ুব নং
বোহেমিয়া
মোরাভিয়া
স্লোভাকিয়া
অস্ট্রিয়া ১৯৩৮
ভিয়েনা
হাঙ্গেরী
ইটালী
সার ১৯৩৫
ফ্রান্স
উত্তর সাগর

ফ্রান্স তাদের তোষণ নীতির ব্যর্থতা এত দিনে উপলব্ধি করে আপন সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করল, কিন্তু তার ফলে হিটলারের আপাততঃ কোন অসুবিধা ঘটল না।

চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা নাশের পর হিটলারের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ইউরোপে জার্মান জাতির প্রভুত্ব স্থাপন, তা বুঝতে আর কারো কোন অসুবিধা রইল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এর পর প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল, শুধু কবে এবং কোন্ ঘটনাকে উপলক্ষ করে এই যুদ্ধ বাধবে, সেটাই কিছুটা অনিশ্চিত রইল। **এর পর হিটলারের দৃষ্টি পড়ল পোল্যাণ্ড এবং ডানজিগ (Danzig) বন্দরের উপর।** ডানজিগ শহরের অধিকাংশ আধিবাসী জাতিতে জার্মান হলেও এটি ছিল জাতিসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ শাসনে, এবং পোল্যাণ্ডও এই বন্দরটিকে তার বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারত। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এই বন্দরটির সংযোগ সাধন করেছিল একটি সঙ্কীর্ণ রাজ্যখণ্ড, যার নাম ছিল 'পোলিশ করিডর' (Polish corridor)। হিটলার ডানজিগ বন্দর ও 'পোলিশ করিডরের' মধ্য দিয়ে জার্মান সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তা দাবী করে বসলেন। পোল সরকার জার্মানীর এই দাবী মানতে অস্বীকার করল, এবং ব্রিটেন এবার তার তোষণ নীতি পরিত্যাগ করে ঘোষণা করল যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলণ্ড তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হিটলার পোল্যাণ্ডের সংলগ্ন লিথুয়ানিয়ার অন্তর্গত মেমেল শহর অধিকার করলেন। রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নানা রকম চুক্তি করে তিনি ঐ দিকে জার্মানীর প্রভাব বৃদ্ধি করলেন (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৩৯)। **ইটালীর সঙ্গে আর একটি চুক্তির দ্বারা** জার্মানীর মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করা হল (Pact of Steel, মে, ১৯৩৯), এবং সব শেষে চিরশত্রু **রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি** সম্পাদন করে (আগস্ট, ১৯৩৯) হিটলার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে স্তম্ভিত করে দিলেন এবং তাঁর পূর্ব সীমান্তে রুশ আক্রমণের আশঙ্কা দূর করলেন। তারপর, যুদ্ধায়োজন সমাপ্ত হলে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর, বিনা প্ররোচনায় জার্মান সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল।

ডানজিগ বন্দর দাবী

হিটলারের বিভিন্ন চুক্তি

পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচন

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)
(The Second World War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের **প্রত্যক্ষ কারণ** যে জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতি ও হিটলারের সাম্রাজ্যলিপ্সা, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতালাভের পরই হিটলার ঘোষণা করেন যে তিনি পরাজিত জার্মানীকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে দৃঢ়সংকল্প। এর জন্য তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করবেন, জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবেন, এবং শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার প্রাক্তন উপনিবেশগুলি এবং ইউরোপে যে সব রাজ্যাঞ্চল সে হারিয়েছিল সেগুলি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবেন। তিনি অবশ্য ঐ সঙ্গে বারবার ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ সৃষ্টি করার কোন অভিপ্রায় তাঁর নেই। হিটলার তাঁর কথামতোই কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া তিনি বন্ধ করে দেন। সৈন্যবাহিনীতে নির্দিষ্ট কালের জন্য যোগদান জার্মান নাগরিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক (Conscription) করা হয় (১৯৩৫), ও হিটলার অল্প কালের মধ্যেই আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ও সুশৃঙ্খল একটি বিরাট জার্মান সৈন্যদল গড়ে তোলেন। জার্মান নৌ-বাহিনী ও বিমান-বহরেরও প্রভূত উন্নতি করা হয়। এর পর জার্মানী ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করে একের পর এক আক্রমণাত্মক কাজ করে চলে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে **রাইন নদীর পশ্চিম তীরে সৈন্যসমাবেশ**, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে **রোম-বার্লিন-টোকিও চক্র গঠন**, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে **অস্ট্রিয়া ও সুডেটেনল্যাণ্ড অধিকার**, ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে **চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা হরণ** ও সব শেষে ঐ বৎসরের ১লা সেপ্টেম্বর **পোল্যাণ্ড আক্রমণ**,—এ সবই ঠিক পূর্ব-পরিকল্পিত না হলেও হিটলারের ঘোষিত বৈদেশিক নীতির যুক্তিসম্মত অনুসিদ্ধান্ত। হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগমন সুনিশ্চিত হয়, শুধু কবে ও কোন ঘটনা উপলক্ষ করে এই যুদ্ধ আরম্ভ হবে সে বিষয়েই যেটুকু সন্দেহ ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হুমকি অগ্রাহ্য করে জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করা মাত্র সেই সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল। ব্রিটিশ

প্রত্যক্ষ কারণঃ হিটলারের সাম্রাজ্যলিপ্সা

প্রধানমন্ত্রী পোল্যাণ্ডকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য জার্মানীকে অবিলম্বে সৈন্যাপসরণের নির্দেশ দেন, এবং জার্মানী তাতে কর্ণপাত না করলে ব্রিটেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)।

কিন্তু একমাত্র হিটলারের উপরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব আরোপ করা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অসঙ্গত হবে। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থান যে ঘটনা-পরম্পরার ফলে সম্ভব হয়েছিল তার দিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কর্তব্য। **১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত।** ভার্সাই সন্ধিতে ইউরোপে জার্মানীর কয়েকটি রাজ্য ও তার এশিয়া ও আফ্রিকাস্থিত সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হয়, তার সামরিক ও নৌবল খর্ব করা হয়, তার উপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বিরাট ভার চাপানো হয়, তার বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যতঃ নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং জার্মান সম্রাট ও তাঁর প্রধান অনুচরদের যুদ্ধাপরাধে বিচারের নির্দেশও দেওয়া হয়। শক্তি ও সভ্যতায় ইউরোপের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জাতিকে এভাবে চিরকাল পঙ্গু রাখা যে সম্ভব নয় বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের তা বোঝা উচিত ছিল। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জার্মান প্রতিনিধিদের সন্ধির সর্তগুলি আলোচনা করার কোন সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। জার্মানরা স্বভাবতই ভার্সাই সন্ধিকে তাদের উপর **জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শান্তি** (Dictated Peace) বলে মনে করত, এবং এই সন্ধি মেনে চলার নৈতিক দায়িত্ব কোনদিন তারা স্বীকার করেনি। হিটলার জার্মানীর এই জাতীয় অপমান মুছে ফেলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলেই জার্মান জাতি তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। ভার্সাই-এর কলঙ্ক দূর করাকেই হিটলার তাঁর জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন, তাঁর আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্যই ছিল জার্মানীকে আবার ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

ভার্সাই সন্ধিতে বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত

হিটলারের এই নীতির প্রাথমিক সাফল্যের জন্য আমরা আংশিকভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বিধাগ্রস্ত আচরণকে দায়ী করতে পারি। জাতিসঙ্ঘের সূচনার সময় এই দুটি রাষ্ট্রই তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল; আবার জাতিসঙ্ঘের শেষ পর্যায়েও এদের হাতেই তার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। কিন্তু জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতিকে বাধা দেবার জন্য এরা জাতিসঙ্ঘকে ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথম দিকে জার্মানীর প্রতি এ দুটি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক এক রকম ছিল না। ফ্রান্স বারংবার জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় (১৮৭০, ১৯১৪) তার অত্যধিক জার্মান-ভীতি দেখা গিয়েছিল, এবং ভার্সাই সন্ধির প্রতিশোধ-

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বিধাগ্রস্ত আচরণ

মূলক সর্তগুলিকে সে অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত করার পক্ষপাতী ছিল। ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি দেবার জন্য জার্মানী দুবৎসর সময় চাওয়ায় ফ্রান্স জার্মানীর সর্বাপেক্ষা শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চল রূঢ় (Ruhr) দখল করে নেয়। কিন্তু ইংলণ্ড চতুর্দিকে সমুদ্র-বেষ্টিত ও নৌবলে বলীয়ান হওয়ায় তার জার্মান আক্রমণের ভয় বিশেষ ছিল না। যুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করাই ইংলণ্ডের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এবং ক্ষতিপূরণ দেবার বিষয়ে জার্মানীর উপর বেশি চাপ দিলে তার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনও সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে, এই ভয় ব্রিটিশ শাসককুলের ছিল। তাই ব্রিটেন আন্তরিকভাবে চাইত জার্মান জাতির অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, যেখানে ফরাসীরা চাইত জার্মানীকে চিরকাল অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখতে।

জার্মানীর প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি

এ ছাড়া ভার্সাই সন্ধির পরবর্তী দশকে জার্মানীর প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়। ভার্সাই সন্ধিতে যে জার্মানীর প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়েছে, এ রকম একটা ধারণা ব্রিটেনেও দৃঢ়মূল হয়। তাই হিটলার যখন ভার্সাই সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করে রাইন নদীর পশ্চিম তীরে সৈন্য সমাবেশ করলেন এবং জার্মান সৈন্যবাহিনীকে আরো শক্তিশালী ও আধুনিক যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত করে তোলবার চেষ্টা করলেন তখন ইংলণ্ডের দিক থেকে কোন প্রবল আপত্তি উঠল না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলডুইনের (Baldwin) সমালোচনা এজন্য অনেকে করে থাকেন; কিন্তু বলডুইন তখন জার্মানীকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে ঐক্যবদ্ধ ইংরাজ জাতির সমর্থন পেতেন কি না, খুবই সন্দেহ।

চেম্বারলেনের তোষণ নীতি

কোন কোন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক আবার মনে করতেন যে হিটলারের কিছু কিছু দাবী মেনে নিলে ইউরোপে বড় যুদ্ধ এড়ানো যাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা জার্মানীর প্রতি **তোষণ নীতি** (policy of appeasement) অবলম্বন করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনকে এই তোষণ নীতির সব চেয়ে বড় প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসেও হিটলারকে সুডেটেনল্যাণ্ড উপহার দিয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করেন, এবং তিনবার জার্মানীতে গিয়ে 'ফ্যুয়েরারে'র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত **মিউনিক চুক্তি সম্পাদন** করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন-প্রত্যাগত ডিসরেলির মতো ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক-প্রত্যাগত চেম্বারলেনেরও ধারণা হয়েছিল যে ইউরোপের শান্তি সম্মানজনক সর্তে রক্ষা করা গেছে। চেম্বারলেনের সমমনোভাবাপন্ন লোকের অভাব ইংলণ্ডে সে দিন ছিল না। কিন্তু **দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল** (Winston Churchill) তখনই **মিউনিক চুক্তিকে ব্রিটেনের পক্ষে 'সম্পূর্ণ এবং**

অসহনীয় পরাজয়' ('total unmitigated defeat') বলে বর্ণনা করেন, এবং কার্যতঃ ঐ চুক্তির এক বৎসরের মধ্যেই **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু** হয়। ইংলণ্ডের এই তোষণনীতি, বলা বাহুল্য, হিটলারকে উৎসাহিত করেছিল। জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময়েই প্রথম এই তোষণ নীতির ব্যত্যয় ঘটল।

অবশ্য শুধু জার্মানীর ক্ষেত্রে নয়, ইটালী ও জাপানের ক্ষেত্রেও পশ্চিমী শক্তিরা, অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, ঐ ধরনের তোষণ নীতি এর আগেও অনুসরণ করেছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে **জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ** করে সেখানে **মাঞ্চুকুও** (Manchukuo) নামে **তাঁবেদার রাষ্ট্র** প্রতিষ্ঠা করলে চীন জাতিসজ্ঘের কাছে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন জাতিসজ্ঘ জাপানের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলেও ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানায়নি বা ইটালীর বিরুদ্ধে জাতিসজ্ঘের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলিও যথাযথভাবে রূপায়িত করেনি। বরং ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রী লাভাল ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রসচিব স্যামুয়েল হোর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বিনা যুদ্ধে আবিসিনিয়ার একটি বড় অংশ ইটালীকে উপহার দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন, যদিও ব্রিটিশ জনমতের চাপে ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায়নি। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করতে উদ্যত হলে ফ্রান্সও ইংলণ্ডের মতো তোষণ নীতি অবলম্বন করে। মিউনিক চুক্তির জন্য ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরও কিছুটা দায়ী ছিলেন।

জাপান ও ইটালীর তোষণ

ব্রিটেনের তোষণ নীতির জন্য শুধু কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ককে দায়ী করাটাও অসঙ্গত হবে। এর পশ্চাতে আরো গভীর কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ব্রিটেনের ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিশেষ স্বার্থ ছিল না, তার স্বার্থ জড়িত ছিল প্রধানতঃ তার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে। জার্মানী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের ব্যাপারে ব্রিটেনের বড় প্রতিযোগী ছিল না। ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে এশিয়ার উপনিবেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে ইটালীকে সন্তুষ্ট রাখাও প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রুশ-ভীতি বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে ভয়ও তাদের মুসোলিনী ও হিটলারের অনুরাগী করে তুলেছিল। তারা ভেবেছিল যে, নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইটালীই ইউরোপে সাম্যবাদের প্রসার রোধ করতে পারবে। এইজন্যই রাশিয়া বারবার পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে একজোটে জার্মানীকে প্রতিরোধ করবার প্রস্তাব করলেও ইংলণ্ড বা ফ্রান্স সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি। মিউনিক চুক্তির সময়েও পশ্চিমী শক্তিরা রাশিয়ার মতামত গ্রহণ করা আদৌ

তোষণ নীতির অন্তর্নিহিত কারণ

প্রয়োজন মনে করেনি। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে দুর্বল দেখে নিরুপায় রাশিয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই হিটলারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে (আগস্ট, ১৯৩৯), ও পরোক্ষে জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতিকেই জয়ী হতে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনী হ্রাস ও সামরিক ব্যয়সঙ্কোচের নীতিও তার তোষণ নীতি অনুসরণের জন্য অনেকটা দায়ী। জার্মানী ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই সামরিক বাহিনীতে তার নাগরিকদের যোগদান বাধ্যতামূলক করে, কিন্তু ব্রিটেন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তার নৌ-বাহিনী ও বিমান-বহর সামান্য বৃদ্ধি করা ছাড়া যুদ্ধের জন্য আর কোন প্রস্তুতি করেনি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তির পর ব্রিটেন এ ব্যাপারে প্রকৃত সচেতন হয়, এবং পরের বৎসর এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডেও সামরিক বাহিনীতে যোগদান নাগরিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ব্রিটেনের এই প্রস্তুতির অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই সামরিক দুর্বলতাও ব্রিটেনের জার্মানীর সাম্রাজ্য প্রসারের চেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ না করার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময়ে ইটালী বা জাপান এর সঙ্গে জড়িত ছিল না। ইটালী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ও জাপান ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজ্য-বিস্তারের লোভে এই যুদ্ধে যোগ দেয়। **কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই এ দুটি রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করে বলপ্রয়োগে রাজ্যবিস্তারের** পথ দেখিয়েছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। **জার্মানীর সঙ্গে সাম্যবাদ-বিরোধী চুক্তিতে (Anti-Comintern Pact)** স্বাক্ষর করেও (১৯৩৬-৩৭) এ দুটি দেশ তার আক্রমণাত্মক নীতিতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে দূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইটালী ও জাপান, এ দুটি দেশেরও যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল।

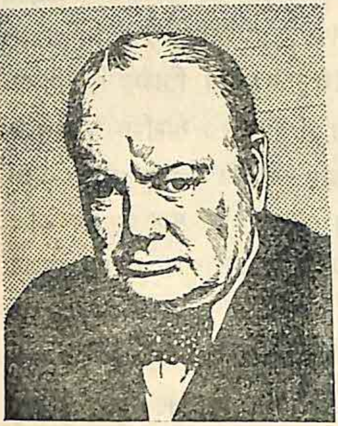
ইটালী ও জাপানের দায়িত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী ঃ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত **প্রায় ছয় বৎসর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল।** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও জার্মানী বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। যুদ্ধারম্ভের কয়েক মাসের মধ্যেই **জার্মান সৈন্যবাহিনী পূর্বে পোল্যাণ্ড, এবং উত্তরে ও পশ্চিমে ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম অধিকার করে নেয়** (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯—মে, ১৯৪০)। এই সময়ে **রুশ সৈন্যবাহিনীও পোল্যাণ্ডের**

জার্মান ও রুশ বাহিনীর সাফল্য

কিছু অংশ জয় করে নেয় এবং ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করে (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী তিনটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়াও অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

নরওয়েতে ব্রিটিশ বাহিনীর বিপর্যয়ের পরই প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন এবং **উইনস্টন চার্চিল** তাঁর পদাভিষিক্ত হন। এই যুদ্ধ পরিচালনায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে চার্চিল ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনিই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ও তাঁর নেতৃত্বে ইংলণ্ড এক চরম সঙ্কট থেকে রক্ষা পায়।



উইনষ্টন চার্চিল

বেলজিয়াম অধিকার করার পর জার্মান সৈন্যবাহিনী ঐ দেশ থেকে ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করে। ফরাসী-জার্মান সীমান্তে ফ্রান্সের দুর্ভেদ্য ব্যূহ 'ম্যাজিনো লাইন' (Maginot Line) অতিক্রম করা জার্মান সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের বেলজিয়াম সীমান্ত অত সুরক্ষিত ছিল না। সুতরাং ঐ দিক থেকে ফ্রান্স আক্রমণ করে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জার্মান সৈন্যেরা ফ্রান্স অধিকার করে নিল, এবং বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে স্থিত কয়েক লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য কোন রকমে **ডানকার্ক** (Dunkirk) বন্দর পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করে সেখান থেকে জলপথে স্বদেশে পাড়ি দিল (জুন, ১৯৪০)। ফ্রান্স অধিকার করার পর জার্মানী তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকবলকে পূর্ণমাত্রায় নিজের কাজে লাগিয়েছিল।

ফ্রান্সের পতন

ফ্রান্সকে পতনোন্মুখ দেখে ইটালী ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে কিছুটা রাজ্য গ্রাস করবার অভিপ্রায়ে জার্মানীর মিত্ররূপে যুদ্ধে যোগ দিল। কিন্তু জার্মানী তাকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ করল। ইটালীকে অনর্থক উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হল।

ইটালীর যুদ্ধে যোগদান

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস থেকে প্রায় এক বৎসর ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণ মিত্রহীন অবস্থায় জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী থাকায় জার্মানীর পক্ষে ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করে ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু

জার্মান বিমান বহরের প্রচণ্ড আক্রমণে ব্রিটেন কয়েক মাস সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ বিমান-বহর তার সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে জার্মান বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৯৪০-৪১ সালে জার্মান বোমারু বিমানের নৈশ আক্রমণে লণ্ডন ও অন্যান্য কয়েকটি বৃহৎ শহরের প্রচুর লোকক্ষয় ও সম্পত্তি নাশ হয়। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির মনোবল এতে নষ্ট হয়নি। চার্চিলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমস্ত ইংরাজ জাতি ঐক্যবদ্ধ-ভাবে শত্রু আক্রমণের মোকাবিলা করে। লক্ষাধিক প্রাক্তন সৈনিক দেশরক্ষী বাহিনীতে (Home Guard) যোগ দেয় ও যুদ্ধাস্ত্রনির্মাণের কারখানাগুলি দিবারাত্র কাজ করে। জার্মান ডুবোজাহাজের উৎপাতেও এই সময় ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়, কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী সমুদ্রে তার আধিপত্য বজায় রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে না নেমেও ব্রিটেনকে অস্ত্র ও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করে।

ব্রিটেনের একক প্রতিরোধ

ফ্রান্সের পতনের এক বৎসর পরে **জার্মানী হঠাৎ তার অনাক্রমণ চুক্তি অগ্রাহ্য করে রাশিয়া আক্রমণ করে বসে** (জুন, ১৯৪১)। এইটি যে হিটলারের একটি মারাত্মক ভুল হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রুশ সৈন্যেরা জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে প্রথম দিকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তাদের অসামান্য প্রতিরোধের জন্য জার্মানরা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারেনি, এবং তাদের বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যালিনগ্রাড (Stalingrad) অবরোধে জার্মান সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। রাশিয়ার এই বিপদের সময় ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই তার সাহায্যার্থে কামান, সাঁজোয়া গাড়ী (tank), বিমান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র পাঠায়। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে এইভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত হয়, এবং এরই পরিণামে হিটলারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ

ইউরোপে ফ্রান্স জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে জাপান ফরাসী ইন্দোচীনে তার প্রভুত্ব স্থাপন করে (১৯৪০-৪১)। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার অধিকৃত দ্বীপগুলির উপর জাপানের বহুদিন লোলুপ দৃষ্টি ছিল। জার্মানী ও ইটালী জাপানের এই সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টাকে সমর্থন করে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের (Hawaii) অন্তর্গত পার্ল হার্বার (Pearl Harbour) বন্দরটি বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। জার্মানী ও ইটালী জাপানের মিত্ররাষ্ট্র রূপে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; অন্যদিকে ইংলণ্ড, রাশিয়া

জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা

ও চীন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রসারিত হয়।

জাপান যুদ্ধের জন্য যে বহু পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়েছিল তার প্রমাণ অল্প দিনের মধ্যেই মেলে। কয়েক মাসের মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, জাভা ও ব্রহ্মদেশ জাপানের অধিকারভুক্ত হয়। জাপানী সৈন্যবাহিনী ভারত সীমান্তও অতিক্রম করে (১৯৪২), তবে তার পক্ষে ভারতের ভিতরে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এই সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ব্রিটিশ ও মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থার (Mac Arthur) ও ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি **লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের** (Louis Mountbatten) চেষ্টায় ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরধিকৃত হয়, কিন্তু জার্মানীর পতনের আগে জাপানকে বশে আনা সম্ভব হয়নি।

জাপানের বিরাট সাফল্য

ইতিমধ্যে উত্তর আফ্রিকাতেও উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে (১৯৪১-৪৩)। ব্রিটিশ সৈন্যেরা ইটালীর কাছ থেকে আবিসিনিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড কেড়ে নেয়। লিবিয়াতে জার্মান ও ইটালীয় সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশ-অধিকৃত মিশর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ব্রিটিশ সৈন্যেরা দুবার লিবিয়া আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সেনাপতি মণ্টগোমেরির (Montgomery) প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জার্মান ও ইটালীয় সৈন্যেরা লিবিয়া থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। মণ্টগোমেরি ইটালীর উপনিবেশ ট্রিপলি অধিকার করে ফরাসী উপনিবেশ টিউনিস পর্যন্ত অগ্রসর হন। প্রায় একই সময় আর একটি বিরাট ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ আলজিরিয়া অধিকার করে মণ্টগোমেরির বাহিনীর সঙ্গে টিউনিসে মিলিত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে জার্মান ও ইটালীয় সৈন্যবাহিনী উত্তর আফ্রিকা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়। ইটালীয়রা ভূমধ্যসাগরস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশ মাল্টা অধিকারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে একটি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সিসিলী দ্বীপ অধিকার করে ইটালীর মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করে। ইটালীতে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইটালীর রাজা মুসোলিনীকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু তিনি পলায়ন করে জার্মানদের কাছে আশ্রয় নেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইটালী নিঃসর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার

ইটালীর পতন

দিকে মুসোলিনী মিলানের কাছে এক গ্রামে ধৃত ও উত্তেজিত জনতার হাতে নিহত হন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বাহিনী রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়। ঐ বৎসর জুন মাসে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী সম্মিলিত ভাবে সেনাপতি আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করে ফ্রান্সের নর্ম্যাণ্ডি (Normandy) আক্রমণ করে, এবং প্রচণ্ড জার্মান প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে দেশের ভিতরে অগ্রসর হয়। ক্রমে ফ্রান্সের পতন হয়, এবং সেনাপতি আইসেনহাওয়ার রাইন নদী অতিক্রম করে পশ্চিম দিক থেকে জার্মানী আক্রমণ করেন। পূর্ব দিক থেকে রুশবাহিনীও জার্মানীর মধ্যে প্রবেশ করে রাজধানী বার্লিনের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বার্লিনের পতন হয় ও হিটলার তার কিছু পূর্বে আত্মহত্যা করেন। নাৎসী সরকারের বহু নেতা পলায়ন করে আত্মগোপন করেন, অন্যেরা মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সব শেষে জাপানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য আমেরিকা তার বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জাপানের দুটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকি দুটি পরমাণু বোমার (Atom Bomb) আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। এর পর জাপানও নিঃসর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

জার্মানীর পরাজয়

জাপানের আত্মসমর্পণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের কারণঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের **প্রধান কারণ পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শক্তি ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সহযোগিতা।** বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এই তিনটি দেশ যে ভাবে জার্মানী, জাপান ও ইটালীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। মিত্রশক্তিগুলির তিন প্রধান নেতা, ইংলণ্ডের চার্চিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও সোভিয়েট রাশিয়ার স্ট্যালিন যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন, এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভাবও দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার জনসাধারণও এই যুদ্ধে অসাধারণ মনোবলের পরিচয় দেয়। হিটলারের বর্বর ধ্বংসনীতি এবং যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান সৈন্যবাহিনীর অসাধারণ সাফল্যও তাদের মনোবল নষ্ট করতে পারেনি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে পূর্ণ এক বৎসর ইংলণ্ডকে একক ভাবে প্রবল শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু তার কার্যকলাপে কখনো হতাশা বা পরাজিতের মনোভাব দেখা যায়নি। তৃতীয়তঃ, হিটলারের কয়েকটি ভুল পদক্ষেপও এই বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর

ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ সহযোগিতা

জনসাধারণের মনোবল

পরাজয়ের জন্য দায়ী। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের পতনের পরই হিটলার তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ব্রিটেনকে আক্রমণ করেননি। এই সময় ব্রিটেন তার যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য কয়েক মাস অমূল্য সময় পেয়ে যায়, যার ফলে তাকে পরে পরাজিত করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এরপর ১৯৪১ সালের জুনে রাশিয়া আক্রমণ করেও হিটলার আর একটি মারাত্মক ভুল করেন। এরই ফলে সমাজতন্ত্রী রুশ সরকারের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারের সহযোগিতা ও সম্প্রীতির ভাব স্থাপিত হয়। পরস্পরবিরোধী এই দুই শক্তির ঐক্য জার্মানীর পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে। তাছাড়া হিটলার ইউরোপে যে সব দেশ জয় করেছিলেন সে সব দেশের জনসাধারণের হৃদয় জয় করার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি। বিজয়ী জার্মান সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ফলে পরাজিত দেশগুলির সাধারণ লোকেদের মধ্যে জার্মান-বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠে ও বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি অধিকৃত দেশেই স্থানীয় লোকেদের দমন করবার জন্য হিটলারকে বিরাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখতে হয়। চতুর্থতঃ, মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের মারণাস্ত্র আবিষ্কারে সাফল্যও এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের জন্য দায়ী। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগই জাপানকে অবিলম্বে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করে, এবং তার ফলেই বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

হিটলারের ভ্রান্ত নীতি

পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলঃ ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথমটিকে বহুদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের বহু প্রধান শহর সম্পূর্ণ ভাবে বা অংশতঃ এই যুদ্ধের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইউরোপের বাইরেও জাপান, চীন ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যুদ্ধের ফলে ভয়াবহ ক্ষতি হয়। তা ছাড়া পৃথিবীর এক বিরাট অংশে খাদ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। মূল্যস্ফীতি এবং কালোবাজারের সৃষ্টি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কম-বেশি দেখা গিয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধের অবসানের ফলে বহু লোক বেকার ও গৃহহীন হয়। বিজিত দেশগুলির অবস্থা বিজয়ী দেশগুলির তুলনায় অনেক খারাপ হলেও, শেষোক্ত দেশগুলিও প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড

রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে প্রথমেই জার্মানীর কথা স্মরণীয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর জার্মানীকে পৃথক চারটি অঞ্চলে ভাগ করে এক একটি অঞ্চল আলাদাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সামরিক

কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। একই ভাবে সোভিয়েট অঞ্চলস্থিত বার্লিন শহরটিকে চার ভাগে ভাগ করে উপরে উল্লিখিত চারটি মিত্রশক্তির পৃথক অধিকারে রাখা হয়। **১৯৪৯ সালে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী অঞ্চল একত্র করে বন্‌-এ (Bonn) জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়,** এবং পাঁচ মাস পরে সোভিয়েট অঞ্চলটিতে **জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (German Democratic Republic)** স্থাপিত হয়। চারটি মিত্রশক্তির দ্বারা অধিকৃত **অস্ট্রিয়া** ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পটসড্যাম সম্মেলনে (**Potsdam Conference**) একটি পররাষ্ট্র-মন্ত্রি-পরিষদের উপর জার্মানীর **পাঁচটি** আশ্রিত মিত্ররাষ্ট্রের (ইটালী, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও ফিনল্যাণ্ড) সঙ্গে শান্তিচুক্তির খসড়া রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যুদ্ধবিরতির ১৮ মাস পরে এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭)। এই চুক্তিগুলির ফলে **ইটালী তার উপনিবেশগুলি হারায়, আবিসিনিয়া ও আলবানিয়া স্বাধীনতা ফিরে পায়,** এবং **হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ডের বর্তমান রাজ্যসীমানা নির্ধারিত হয়। জার্মানী এবং প্রতিটি মিত্ররাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বহু পরিমাণে হ্রাস করা হয়** এবং প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। দূর প্রাচ্যে জাপানের কবল হতে এশিয়ার রাজ্যগুলি মুক্তি পায়, এবং **জাপানকে বেশ কয়েক বৎসর মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।** কিন্তু মুক্ত এশিয়াকে বেশি দিন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অধিকারেও রাখা সম্ভব হয়নি। এশিয়ার প্রাক্তন ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি ধীরে ধীরে স্বাধীনতা লাভ করে।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

যুদ্ধকালীন নৃশংসতা ও বর্বরতার অপরাধে **জার্মান ও জাপানী সমরনায়কদের বিচারের আয়োজনও** করা হয়েছিল। ন্যুরেমবার্গ (**Nuremberg**) বিচারের পর ১১ জন নাৎসী নেতার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জাপানেও মার্কিন সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুরূপ বিচারের আয়োজন ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিদান করা হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের পূর্ব ক্ষমতা ও গুরুত্ব অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম শক্তি হিসাবে স্থান গ্রহণ করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (The United Nations Organization)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়েই, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **উইনষ্টন চার্চিল** ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি **ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট** (Franklin Delano Roosevelt) অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে একটি ব্রিটিশ রণতরীতে বসে **'অ্যাণ্টলাণ্টিক চার্টার'** (Atlantic Charter) নামে একটি সনদ রচনা করেন। এই ঐতিহাসিক সনদে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্যগুলি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, এবং তাতে বলা হয় যে অত্যাচারী নাৎসী শক্তির ধ্বংসের পর পৃথিবীতে সব জাতি নির্ভয়ে, নিরাপদে নিজ নিজ দেশে বাস করতে পারবে। এই ঘোষণাটিকে ভিত্তি করে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ২৬টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা প্রচারিত হয়।



রুজভেল্ট

জাতিপুঞ্জ গঠনের ইতিহাস

এরপর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও চীন এই চারটি শক্তির **মস্কো ঘোষণায়** যে একটি নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হয়। সব শেষে **১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে,** জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের কিছু আগে, **মিত্রশক্তিবর্গ এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতিনিধিরা** আমেরিকার **সানফ্রান্সিস্কো শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে** আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘের স্থলে **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ** (The United Nations) **নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।** ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

একটি সনদে (Charter of the United Nations) এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও গঠন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়। পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া **এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য** হয়—বিশ্বের শান্তিরক্ষা, মানুষের অধিকার এবং ছোট-বড় সব রাষ্ট্রের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মানুষের জীবনযাত্রার তথা সামাজিক ন্যায় ও নীতিবোধের মান উন্নয়ন। **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ছয়টি প্রধান অঙ্গ ছিল ঃ** (১) সাধারণ

পরিষৎ (General Assembly), (২) নিরাপত্তা পরিষৎ (Security Council), (৩) অর্থনৈতিক এবং সমাজ সম্পর্কিত সংস্থা (Economic and Social Council), (৪) অছি পরিষৎ (Trusteeship Council), (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) এবং (৬) প্রধান কর্ম-সচিবের (Secretary-General) দপ্তরখানা (Secretariat)। এই অঙ্গগুলির মধ্যে **সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিরাপত্তা পরিষৎ।** আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার স্বার্থে এই পরিষৎ যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারত। **পাঁচটি বৃহৎ শক্তি,—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন, - এই পরিষদের স্থায়ী সদস্য ছিল,** এবং **পরিষদে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেবার অধিকারও** (Veto Power) **এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিরই ছিল।** ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্বোধন করা হয়েছিল, বর্তমানে এর সদস্য-সংখ্যা ১৩২। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রও এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক (New York) শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তর অবস্থিত, এবং জাতিপুঞ্জের সদস্যদের প্রদত্ত অর্থেই তার ব্যয়-নির্বাহ হয়।

উদ্দেশ্য ও অঙ্গ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রথম দিকে কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি সামান্য আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করেছিল। কঙ্গো, কোরিয়া ও সাইপ্রাসে যুদ্ধ বন্ধ করার কাজে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। কিন্তু পরে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অনেক দুর্বল করে দেয়। বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি বারবার বিশেষ ক্ষমতার (Veto) প্রয়োগে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি নাকচ করে দেয়। বিশ্বের দুই বৃহত্তম শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব স্থাপিত না হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদর্শের যথাযথ রূপায়ণ কখনোই সম্ভব হবে না।

উপসংহার

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

এই বইটি লিখতে নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :—

C. D. M. Ketelbey, **A History of Modern Times.**

G. W. Southgate, **A Text Book of Modern European History, 1789-1960.**

H. A. L. Fisher, **A History of Europe (BK III).**

C. J. H. Hayes and C. W. Cole, **History of Europe Since 1500.**

D. Thomson, **Europe Since Napoleon.**

Leo Gershoy, **The French Revolution And Napoleon.**

C. D. Hazen, **Europe Since 1815.**

W. C. Langsam, **The World Since 1919.**

E. H. Carr, **International Relations Between The Two World Wars.**

সুশোভন চন্দ্র সরকার, **'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ'**

প্রশ্নমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইউরোপে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র (১৭৬৩-৮৯)

(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(২) ইউরোপের ইতিহাসে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক কাদের বলা হয় ? জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের স্থান নির্ণয় কর।

(৩) অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের আভ্যন্তরীণ সংস্কার-প্রচেষ্টার বিবরণ দাও এবং তাঁর ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

(৪) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর :—(ক) ইংলণ্ডে কৃষি-বিপ্লব, (খ) স্যার আইজ্যাক নিউটন, (গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক জড়বাদ, (ঘ) সামাজিক চুক্তির মতবাদ, (ঙ) সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আভ্যন্তরীণ সংস্কার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাস

(১) শিল্প-বিপ্লবের মূল কারণ কি ? এই বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে ঘটেছিল কেন ?

(২) পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

(৩) ইউরোপের ইতিহাস কিভাবে শিল্প-বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম

(১) আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের কারণ বিশ্লেষণ কর। এই সংগ্রামে ব্রিটেনের পরাজয় হল কেন ?

(২) আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি ?

(৩) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর : (ক) গ্রেন্‌ভিলের 'স্ট্যাম্প' আইন, (খ) বোস্টন টি-পার্টি, (গ) আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র, (ঘ) প্যারিস ও ভার্সাই-এর চুক্তি (১৭৮৩)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন

(১) ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(২) ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা কতদূর কাজ করেছিল ?

(৩) ফরাসী বিপ্লবের কোন্ কারণটি তুমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে কর,—তৎকালীন ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, না, ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা ?

(৪) বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষৎ-এর কার্যকলাপের মূল্যায়ন কর।

(৫) ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব কেন ঘটেছিল ? এই শাসনব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই আলোচনা কর।

(৬) ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের প্রভাব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর।

(৭) নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর ও তাঁর প্রবর্তিত সংবিধানের পরিচয় দাও।

(৮) নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্বন্ধে কি জান? তাঁকে কোন্ অর্থে 'ফরাসী বিপ্লবের সন্তান' বলা চলে?

(৯) নেপোলিয়নের পতন ঘটানোর ব্যাপারে ইংলণ্ড, স্পেন ও রাশিয়ার ভূমিকা আলোচনা কর।

(১০) নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। তোমার মতে কোন্ কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?

(১১) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) ব্যাস্টিলের পতন, (খ) মানুষের অধিকারের ঘোষণাপত্র, (গ) জিরণ্ডিন দল, (ঘ) ডিরেক্টরীর শাসনব্যবস্থা, (ঙ) ট্র্যাফাল-গারের যুদ্ধ, (চ) টিলসিটের সন্ধি, (ছ) মহাদেশীয় ব্যবস্থা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইউরোপের পুনর্গঠন (১৮১৫-৩০)

(১) ভিয়েনা চুক্তির (১৮১৫) পশ্চাতে তিনটি প্রধান নীতি কি ছিল? এই চুক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(২) ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের উৎপত্তি, কার্যকলাপ ও পতনের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। এই শক্তিসঙ্ঘের ব্যর্থতার মূল কারণ কি?

(৩) মেটারনিকের কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল? তিনি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে কিভাবে সেই উদ্দেশ্যগুলিকে সিদ্ধ করার চেষ্টা করেন? তাঁর সাময়িক সাফল্য ও অন্তিম ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ কর।

(৪) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) পবিত্র মৈত্রী চুক্তি (১৮১৫), (খ) কার্লসবাডের নির্দেশাবলী (২৮১৯), (গ) ট্রপোর প্রস্তাব(১৮২০), (ঘ) মনরো নীতি(১৮২৩)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: বিপ্লব ও তার প্রতিক্রিয়া

(১) ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব কেন দেখা দিয়েছিল? এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

(২) ইউরোপে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

(৩) ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটল কিভাবে? এই রাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ কি?

(৪) গ্রীস কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছিল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৫) জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের আভ্যন্তরীণ নীতির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৬) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা আন্দোলন, (খ) গিজো, (গ) নাভারিনোর নৌ-যুদ্ধ, (ঘ) জার প্রথম নিকোলাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ মধ্য-শতাব্দীর অভ্যুত্থান (১৮৪৮-৫০)

(১) জার্মানীতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বর্ণনা কর।

(২) অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্য ও পরবর্তী ব্যর্থতার কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। এই বিপ্লবের কোন স্থায়ী সুফল হয়েছিল কি?

(৩) জোসেফ ম্যাৎসিনির লক্ষ্য ও আদর্শ কি ছিল? ইটালীতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে তাঁর উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হয়েছিল?

(৪) টীকা রচনা কর ঃ (ক) ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় মহাসভা, (খ) মেটারনিকের পতন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক (১৮৫০-৭১)

(১) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কেন ঘটেছিল? এই যুদ্ধকে নিষ্ফল সংগ্রাম বলে বর্ণনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত?

(২) ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন কিভাবে দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন সংক্ষেপে বিবৃত কর।

(৩) সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। তাঁর শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা চলে কি?

(৪) তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল? এই নীতির সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই আলোচনা কর।

(৫) ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্যবিধানের ইতিহাসে ম্যাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডির অবদান বিশদভাবে আলোচনা কর।

(৬) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিসমার্কের রাজনৈতিক আদর্শ কি ছিল? তিনি কিভাবে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জার্মানীর ঐক্যবিধান করেছিলেন?

(৭) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর ঃ (ক) মেহমেত আলি, (খ) প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬), (গ) প্লমবিয়ার্সের চুক্তি, (ঘ) স্যাডোয়ার যুদ্ধ, (ঙ) ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস (১৮৭১-১৯১৪)

(১) ইউরোপের ইতিহাসে ১৮৭১ সালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

(২) ১৮৭১ হতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালে বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই নীতি কতদূর সফল হয়েছিল?

(৩) ক্যাথলিক চার্চ ও সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে বিসমার্কের সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত কর। এই সংঘর্ষে কে জয়ী হয়েছিল?

(৪) ১৮৭৯ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ফরাসী সাধারণতন্ত্রী সরকার কোন কোন ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়?

(৫) রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কার-পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে কতদূর রূপায়িত হয়েছিল?

(৬) জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। নিকোলাসের আমলে রাশিয়ায় জার-শাসনের অবসান হয় কিভাবে?

(৭) জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য কি ছিল? তিনি কিভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করেন? তাঁর প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়েছিল?

(৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রিশক্তি মৈত্রী কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

(৯) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) সভ্যতার স্বার্থে সংগ্রাম, (Kulturkampf), (খ) বিসমার্কের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদ, (গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর উপনিবেশ বিস্তার, (ঘ) অ্যাডলফ থিয়ার্সের পুনর্গঠন প্রচেষ্টা, (ঙ) প্যারিস কমিউন (১৮৭১), (চ) বুলাঙ্গারের আন্দোলন, (ছ) রাশিয়ায় ভূমিদাসদের মুক্তি, (জ) নিহিলিস্ট আন্দোলন, (ঝ) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব।

দশম পরিচ্ছেদ: সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

(২) কার্ল মার্ক্সের জীবন ও চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(৩) ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কিভাবে আফ্রিকা মহাদেশকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়েছিল, অল্প কথায় বর্ণনা কর।

(৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভাব বিস্তারের কাহিনী আলোচনা কর। চীনে এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

(৫) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের অভ্যুদয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

(৬) ১৮৬৫ হতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হয়েছিল?

(৭) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) 'ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম', (খ) অর্থনৈতিক (বা ধনতান্ত্রিক) সাম্রাজ্যবাদ, (গ) চীন-জাপানের যুদ্ধ, (ঘ) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের চীন বিপ্লব, (ঙ) রুশ-জাপানের যুদ্ধ, (চ) মার্কিন 'খোলা দরজার' নীতি।

একাদশ পরিচ্ছেদ: তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ

(১) ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন চুক্তির প্রধান সর্তগুলি আলোচনা কর। এই চুক্তির দ্বারা পূর্ব ইউরোপীয় সমস্যার সমাধান কতদূর হয়েছিল?

(২) বার্লিন চুক্তি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কালে পূর্ব ইউরোপীয় সমস্যার বিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা কর। দুটি বলকান যুদ্ধের দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র কতদূর প্রস্তুত করা হয়েছিল?

(৩) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) সান স্টিফানোর সন্ধি, (খ) আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ড, (গ) নব্য তুরস্ক আন্দোলন, (ঘ) প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরিণাম

(১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

(২) ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি আলোচনা কর। এই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল কেন বলা হয়?

(৩) জাতিসঙ্ঘের উৎপত্তি হল কিভাবে? এই সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল?
(৪) মুস্তাফা কামাল পাশার জীবনকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর। তিনি কিভাবে তুরস্কের নব রূপায়ণ করেন?
(৫) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) সারাজেভো হত্যাকাণ্ড, (খ) সেণ্ট জার্মান ও ট্রিয়াননের সন্ধি, (গ) চৌদ্দ দফা প্রস্তাব, (ঘ) লসানের সন্ধি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: রুশ বিপ্লব—নতুন দিগন্ত

(১) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিপ্লব সংঘটনে বলশেভিক দলের অবদান কি ছিল?
(২) সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার গঠনে (১৯১৭-২৪) লেনিনের ভূমিকা আলোচনা কর।
(৩) ১৯১৮ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(৪) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও নভেম্বর বিপ্লব, ১৯১৭, (খ) ব্রেস্ট-লিটভস্কের চুক্তি, (গ) নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, (ঘ) সোভিয়েট সংবিধান, (ঙ) রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, (চ) স্ট্যালিন-ট্রটস্কি সংঘর্ষ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: একনায়কত্বের অভ্যুদয় ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা

(১) লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫) এবং প্যারিস চুক্তির (১৯২৮) মূল সর্তগুলি আলোচনা কর ও তাদের দুর্বলতা দেখাও।
(২) দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাদের পরিণাম কি হল?
(৩) জাতিসঙ্ঘের কার্যকলাপের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্দেশ কর। এই সঙ্ঘ শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হল কেন?
(৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতন ও হিটলারের অভ্যুদয় ঘটল কেন ও কিভাবে?
(৫) নাৎসী দলের শাসনে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(৬) ইটালীতে মুসোলিনীর অভ্যুদয় ঘটল কিভাবে? মুসোলিনীর আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বৈদেশিক নীতির মূল্যায়ন কর।
(৭) ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা কিভাবে রচিত হয়েছিল?
(৮) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২), (খ) জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন, (গ) ওয়াইমার সাধারণতন্ত্র, (ঘ) মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযান, (ঙ) মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮), (চ) হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস, (ছ) স্পেনের গৃহযুদ্ধ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। এই যুদ্ধের জন্য ব্রিটেনের দায়িত্ব কতটুকু ছিল?

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের সাফল্যের কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর। এই বিশ্বযুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

(৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা কর। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও সংগঠন কিরূপ ছিল?

(৪) সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) চেম্বারলেনের আপোষ নীতি, (খ) হোর-লাভাল চুক্তি, (গ) দূর প্রাচ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, (ঘ) হিরোশিমা ও নাগাসাকি।

Mukherjee : History—Modern Europe and the World
for Classes XI and XII, Bengali.

Rs. 10·50